সংরক্ষণ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০

২১-২৭ জুলাই

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০

২১-২৭ জুলাই

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সংকলন ২০১০

২১ - ২৭ জুলাই

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আবদুল খালেক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	সভাপতি
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন	সদস্য
সৈয়দ আরিফ আজাদ	সদস্য
মোঃ মঞ্জুর কাদির	সদস্য
মোঃ মোখলেছুর রহমান	সদস্য
মোঃ: আবুল হাশেম	সদস্য
মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার	সদস্য
মোঃ মহসিন উজ জামান	সদস্য
ড. মোহাঃ সাইনার আলম	সদস্য
মোঃ আবু সাঈদ	সদস্য
মোহাঃ তরিকুল আলম	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান	সদস্য
এম. এম. মাহবুব আলম	সদস্য
ড. এস এম শামছুর রহমান	সদস্য
এ বি এম জাহিদ হাবিব	সদস্যসচিব

প্রকাশনায়

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১০

Finaced by

- National Agricultural Technology Project-NATP (DoF Part)
- Jatka Conservation, Alternate Income Generation for the Jatka Fishers and Research Project
- Regional Fisheries and Livestock Development-Noakhali Component TSU-Noakhali; ASPS II
- Regional Fisheries and Livestock Development-Barisal Component TSU-Barisal; ASPS II

প্রচ্ছদ

সৈয়দ রাকীবুল মইন রুমী

প্রচার সংখ্যা

১০,০০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ

স্বপ্নিল কমিউনিকেশন
৫৩ পুরানা পল্টন (বায়তুল আবেদ টাওয়ার), ঢাকা-১০০০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান অপরিসীম। আবহমান কাল থেকে আমাদের জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে প্রাকৃতিক জলাশয়ের সংরক্ষণ, মাছের বংশবিস্তার এবং পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্য চাষ অপরিহার্য। খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে এ বছরের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য "মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমি মৎস্য খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে আমি মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে মৎস্যসম্পদ আবহমানকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনেও মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

রোগ-ব্যাধিমুক্ত জীবনের জন্য আমাদের খাদ্যে যে পুষ্টি উপাদানগুলো অপরিহার্য তার বেশির ভাগই মাছে বিদ্যমান। মাছের আমিষ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও মেধা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে যা সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথা বিজ্ঞানমনস্ক নিষ্ঠাবান মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

ভিশন ২০২১ এর আলোকে লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলস্তরের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তায় আমিষের যোগান বৃদ্ধিতে মৎস্য খাত টেকসই ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, আমিষের যোগান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য আদিকাল হতে প্রাকৃতিক জলাভূমিতে উৎপাদিত দেশীয় প্রজাতির মাছের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে মাছের আবাসস্থলের অবক্ষয় ও পরিবেশগত পরিবর্তনে তাদের বংশবিস্তার ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করতে হলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

দেশের মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর ২১-২৭ জুলাই ২০১০ সপ্তাহব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবারের প্রতিপাদ্য "মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর-খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর" কে সামনে রেখে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত দিন বদলের স্বপ্ন'কে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সকলকে একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত প্রতিটি কর্মসূচির সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি

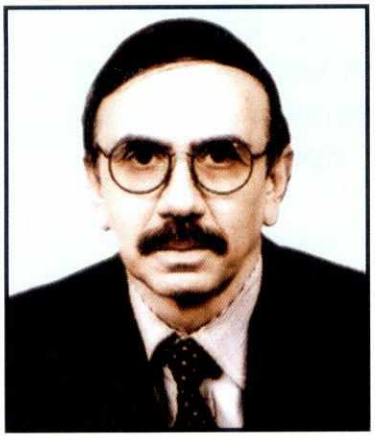

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

বাণী

মাছ আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অংশ। এক সময় পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালায় ছিল মাছের প্রাচুর্য। তখন মাছ চাষের বিষয়টি ছিল একবারেই গৌণ কিন্তু কালের বিবর্তনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একদিকে যেমন বেড়েছে মাছের ব্যাপক চাহিদা, তেমনি প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে জলজ পরিবেশের ঘটেছে ব্যাপক বিপর্যয়। ফলে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাছের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দিনে দিনে মাছচাষ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। মৎস্য সাব-সেক্টর কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। অনেকাংশেই সুদৃঢ় হয়েছে দেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি, যা প্রকারান্তরে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বলয়কে সম্প্রসারিত করেছে।

সম্ভাবনাময় এ খাতের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার এ খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ খাতের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করতে হলে এ খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী ২১ থেকে ২৭ জুলাই ২০১০ দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ পালিত হতে যাচ্ছে। এবারের মৎস্য সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য "মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ তথা মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ শরফুল আলম

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

মুখবন্ধ

জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের নদীমাতৃক এ দেশ। প্রকৃতি ও অনুকূল পরিবেশের কারণে মৎস্য খাত এ দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দীঘি, প্লাবনভূমি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ জলাশয়সহ আমাদের রয়েছে বিশাল সামুদ্রিক সম্পদ। উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এ সেক্টরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। সে কারণে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ সেক্টরের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জনগণকে আরো সচেতন ও মৎস্য কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদযাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এদেশের মানুষকে মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আরও সচেতন ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমাদের দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ যোগান আসে মাছ থেকে। বর্তমানে দেশে বছরে মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ১৭.৫২ কেজি, যা আমদের পুষ্টির সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী প্রায় ৪১ শতাংশ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। মৎস্য সাব-সেক্টর তথা কৃষি সেক্টরের টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জিত না হলে সহস্রাব্দের এ লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রে মৎস্য সাব-সেক্টরের জন্য প্রণীত রোডম্যাপের স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্যমাত্রায় আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের বর্তমান মোট মৎস্য উৎপাদনকে বাড়িয়ে ৩৫.৪ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সব ধরনের জলাশয় ব্যবহার ও উন্নততর চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং এজন্য মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও নিবিড় করতে হবে। এ বছরের মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কর - খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মৎস্য সেক্টরের অব্যাহত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাকে একটি আন্দোলনে রূপ দেয়া অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে ২১-২৭ জুলাই ২০১০ দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী এ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করবেন।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে প্রকাশিত এ সংকলনে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সব তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়েছে তা গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, সমাজকর্মী, শিক্ষক ও এ পেশায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনে আসবে বলে আমি মনে করি। এ সংকলন প্রণয়নে সার্বিক দিকনির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়সহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ মজিবুর রহমান

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ শ্রাবণ ১৪১৭
২১ জুলাই ২০১০

সম্পাদকীয়

মাছ চাষে গণসচেতনতা এবং সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর বর্ণাঢ্য আয়োজনে উৎসবের আমেজে দেশ জুড়ে পালিত হয় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। এ বছরও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। নানা কর্মসূচির মধ্যে প্রকাশিত সংকলন আপন মহিমায় উজ্জ্বল। প্রচুর বিদগ্ধ গুণগ্রাহী পাঠক অধীর আগ্রহ নিয়ে 'সংকলন' হাতে পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকেন। এবার সৃজনশীল নান্দনিক প্রকাশনা সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সবাই আমার সাথে একমত পোষণ করবেন যে, প্রকাশনা একটি সংবেদনশীল এবং Thankless কাজ। তবে প্রকাশনার কাজে যেমনি আছে আনন্দ, তেমনি রয়েছে বেদনা। সামান্য ভুল-ত্রুটি চোখে ধরা পড়লে সম্পাদককে পাহাড়সম অপরাধের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। কোন যৌক্তিক কারণে লেখা প্রকাশ করতে না পারলে জবাবদিহি করতে হয়, সম্পাদকের সাথে ঘটে সুসম্পর্কের অবনতি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। যাঁরা অমূল্য বাণী দিয়ে সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনে মাঠ পর্যায়ে সংকলন সরবরাহের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা প্রকাশনার কাজে হাত দেই। সম্পাদনা পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যের অকুণ্ঠ সমর্থন আর নিবিড় সহযোগিতা প্রকাশনা পথের সকল বাধা সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে সর্বজনাব এ বি এম জাহিদ হাবিবের নির্ভুল ব্যবস্থাপনা এবং মোঃ মুখলেসুর রহমানের প্রকাশনার দক্ষতার কারণে আমরা সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে পেরেছি। প্রবন্ধ দেখার মত দুরূহ কাজে মোঃ মঞ্জুর কাদির, ড. মোহাঃ সাইনার আলম এবং এম এম মাহবুব আলম এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও দক্ষতাকে জানাই সাধুবাদ। তাছাড়া যাঁরা শ্রম, মেধা এবং সময় দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য যে, এবারই প্রথম মৎস্য সপ্তাহের পূর্বে সংকলন প্রকাশ করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সীমিত পরিসরের কারণে অনেকের লেখা প্রকাশ করতে না পারার জন্য এবং প্রকাশিত সংকলনে ভুল-ত্রুটির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থণা করি। সংকলন যখন পাঠকের হাতে পৌঁছবে, তখন আমি থাকব অবসর পূর্ব ছুটিতে। মৎস্য অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জানাই অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা। আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনারা সবাই নিরলশ পরিশ্রম করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন- এ হোক আমার নিরন্তর প্রত্যাশা।

মোঃ আবদুল খালেক

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সংকলন ২০১০

সূচিপত্র

খাদ্য নিরাপত্তায় মৎস্য সেক্টরে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ১৩
মোঃ মজিবুর রহমান

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট, জাটকা রক্ষার গুরুত্ব, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয় ১৯
মোঃ নজরুল ইসলাম, এ বি এম জাহিদ হাবিব ও ড. নির্মল চন্দ্র রায়

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্টের চাষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রের (ফিয়াক) অনন্য ভূমিকা ২৩
মোঃ গোলজার হোসেন, খঃ মাহ্‌বুবুল হক ও এ কে এম আমিনুলাহ ভূঞা

খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম ২৫
সৈয়দ আলী আজহার

প্লাবনভূমিতে মাছচাষ ঃ উন্নয়নের নতুন দিগন্ত ২৯
ফরিদা বেগম ও মোঃ মিজানুর রহমান

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুকুরে শিং মাছের চাষ ৩২
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও সৈয়দ আরিফ আজাদ

খাদ্য নিরাপত্তা ও ধানক্ষেতে সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি ৩৪
নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

চিংড়ি খামার পরিচালনায় অনুসরণীয় শর্তাবলী ঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ৩৬
ম. কবির আহমেদ

বিপন্ন প্রজাতির মাছের কৌলিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ৩৮
ড. মোঃ সামছুল আলম

থাই পাঙ্গাস চাষে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও পানির গুণাগুণের জৈবিক ব্যবস্থাপনা ৪২
ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার ও ড. সালেহা খান

জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও আমাদের করণীয় ৪৪
মোঃ আবুল হাশেম

জাটকা (পোনা ইলিশ) সংরক্ষণ কার্যক্রম ও জনসচেতনতা ৪৬
ড. মোঃ মফিজুর রহমান

হাওর অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ৪৯
তপন কুমার পাল ও এম এম মাহবুব আলম

কাপ্তাই হ্রদ - অপার মৎস্য সম্পদের আধার ৫৩
কমান্ডার জাহিরুল আলিম ও এ কে এম আজাদ রহমান

স্বাদুপানির দেশীয় ছোট মাছ ঃ বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা ৫৫
মোহাঃ তরিকুল আলম

ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ভূমিকা ৫৯
মোঃ মিজানুর রহমান ও এস এম আশিকুর রহমান

পুরুষ গলদা চিংড়ির বৈচিত্র্যময় অসম বৃদ্ধি ঃ প্রাসঙ্গিক গবেষণার ফলাফল ৬১
প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল ওহাব ও ড. এস এম শামছুর রহমান

নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন ও মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ৬৩
ছালেহ আহমদ ও মোঃ বেলাল হোসেন

উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পুরণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় ছোট মাছ ৬৬
ড. মোঃ ইনামুল হক

ভাইরাসমুক্ত জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা ৬৮
ড. নিত্যানন্দ দাস, সরোজ কুমার মিস্ত্রী ও আ ক ম শফিক-উজ-জামান

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প ৭২
জোয়ারদার মোঃ আনোয়রুল হক ও মোঃ আব্দুস সালাম

উপকূলীয় চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধিতে চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র ৭৩
মোঃ সিরাজুল করিম

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ৭৬
এবিএম আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মোঃ আতিয়ার রহমান

বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও গুণগতমান সম্পন্ন শুটকি মাছ উৎপাদন ৭৯
ড. এম জলিলুর রহমান ও ড. এম শাহাব উদ্দিন

মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স ঃ কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা ৮১
মোঃ মঞ্জুর কাদির, মোঃ মনিরুজ্জামান ও মোঃ মুখলেসুর রহমান

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল ৮৫
ড. মোহাঃ সাইনার আলম

সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)-এর মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান কৌশল ৮৯
মোঃ আবদুল কাইয়ুম

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম ৯২
মোঃ ইউসুফ খান ও বিশ্বজিৎ কুমার দেব

মৎস্য সম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৯৫
ড. আনোয়ারা বেগম শেলী

কম দামে মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য তৈরি কৌশল ঃ উৎপাদন খরচ কমানোর প্রধানক্ষেত্র ৯৯
ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক

জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন ১০০
আনোয়ার হোসেন সিকদার

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১০ ১০১

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০০৮-২০০৯ সালের তথ্যানুযায়ী) ১০২

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১০৯

খাদ্য নিরাপত্তায় মৎস্য সেক্টরে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

মোঃ মজিবুর রহমান

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য উপখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৭৪ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২২.২৩ শতাংশ মৎস্য উপখাত থেকে আসে। গত ২০০৮-০৯ সালে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৫.৪০ শতাংশ, তবে বিগত ১০ বছরের প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় এ উপখাতের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত থেকে। মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদানের চেয়েও জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ এবং দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮-এর আলোকে নিয়মিত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-য় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য নির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টিচাহিদা পূরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন অন্যতম। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে মৎস্য উপখাতকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য উপখাতের, বিশেষ করে মাছ চাষ সম্প্রসারণ ও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া মৎস্য উপখাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে উল্লিখিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ, যেমন- অভ্যন্তরীণ মাছ চাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি, ধানক্ষেতে মাছ চাষ অধিকতর সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, মৎস্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি অর্জনের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য সাব-সেক্টর রোড ম্যাপ প্রণয়ন করে।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য সম্পদের উৎস ও মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ জলসম্পদ ও প্রাণিবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, ডোবা-নালা, হাওর-বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর (৮৮%) এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৫.২৮ লক্ষ হেক্টর (১২%)।

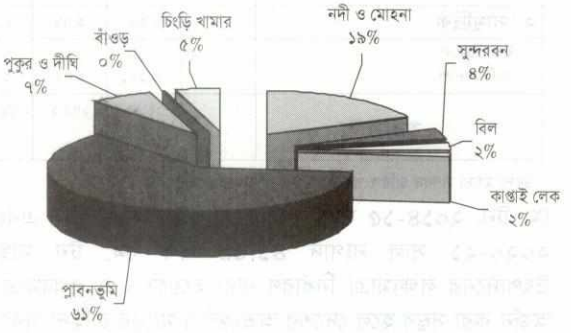

চিত্র ১ ঃ মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন উৎস

বিগত দশ বছরের উৎপাদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৯৯-২০০০ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ১৬.৬১ লক্ষ মে টন। ২০০৮-০৯ বছরে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.০১ লক্ষ মে. টন, যা ভিত্তি বছরের উৎপাদনের চেয়ে প্রায় ৬৩ শতাংশ বেশি। বিগত বছরগুলোতে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদনও সন্তোষজনক ছিল বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের ফলে একই সময়ের ব্যবধানে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৮ শতাংশ। তবে বিগত বছরগুলোতে নদী ও গভীর সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। অন্যদিকে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের চাহিদামাফিক ও সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি ১)।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎপাদন প্রপেক্ষণ ও মাছের চাহিদা

২০০৮-০৯ সালে দেশে মোট ২৭.০১ মে. টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বাড়াতে হলে অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে ২০১০-১১ সালে ৩০.৮৩ লক্ষ

সারণি ১ ঃ মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

উৎপাদন খাতসমূহ	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)								
		১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
১. অভ্যন্তরীণ	৪৪.৩৬	১৩.২৮	১৪.০২	১৪.৭৫	১৫.৬৬	১৬.৪৭	১৭.৪১	১৮.৪৯	১৯.৫২	২০.৬৬	২১.৮৭
মুক্ত জলাশয়	৪০.৪৭	৬.৭০	৬.৮৯	৬.৮৯	৭.০৯	৭.৩২	৮.৫৯	৯.৫৭	১০.০৬	১০.৬০	১১.২৪
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৫৪	১.৫০	১.৪৪	১.৩৮	১.৩৭	১.৪০	১.৩৮	১.৩৭	১.৩৭	১.৩৮
সুন্দরবন	১.৭৭	০.১১	০.১২	০.১২	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.১৮	০.১৮	০.১৯
বিল	১.১৪	০.৭৩	০.৭৫	০.৭৬	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৮	০.৭৫	০.৭৮	০.৭৯
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৯
প্লাবনভূমি	২৮.৩৩	৪.২৫	৪.৪৫	৪.৫০	৪.৭৫	৪.৯৮	৬.২১	৭.১৮	৭.৬৮	৮.১৯	৮.৭৯
বদ্ধ জলাশয়	৫.২৮	৬.৫৭	৭.১৩	৭.৮৭	৮.৫৭	৯.১৫	৮.৮২	৮.৯২	৯.৪৬	১০.০৬	১০.৬৩
পুকুর	৩.০৫	৫.৬১	৬.১৬	৬.৮৫	৭.৫২	৭.৯৬	৭.৫৭	৭.৬০	৮.১২	৮.৬৬	৯.১২
বাঁওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৫
চিংড়ি খামার	২.১৮	০.৯২	০.৯৩	১.০০	১.০১	১.১৫	১.২১	১.২৮	১.২৯	১.৩৫	১.৪৬
২. সামুদ্রিক	-	৩.৩৪	৩.৭৯	৪.২০	৪.৩২	৪.৫৫	৪.৭৫	৪.৮০	৪.৮৭	৪.৯৭	৫.১৪
ইন্ডাস্ট্রিয়াল	-	০.১৬	০.২৪	০.৩০	০.২৮	০.৩২	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৪	০.৩৫
আর্টিসেনাল	-	৩.১৮	৩.৫৫	৩.৯০	৪.০৪	৪.২৩	৪.৪১	৪.৪৬	৪.৫২	৪.৬৩	৪.৭৯
সর্বমোট		১৬.৬১	১৭.৮১	১৮.৯০	১৯.৯৮	২১.০২	২২.১৬	২৩.২৯	২৪.৪০	২৫.৬৩	২৭.০১

উৎসঃ মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মে. টন, ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৬ লক্ষ মে. টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে. টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরীণ মাছের চাহিদা পূরণ করেও ২০১৪-১৫ ও ২০২০-২১ সাল নাগাদ যথাক্রমে ১.২৬ লক্ষ মে. টন ও ২.২৯ লক্ষ মে. টন উদ্বৃত্ত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে একজন মানুষের দৈনিক খাদ্যে আমিষ চাহিদা কম-বেশি ৪৫ গ্রাম। এর মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৫ গ্রাম প্রাণিজ আমিষ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। এ আমিষ পেতে হলে আমাদের প্রতিদিন ৫৬ গ্রাম মাছ আবশ্যক। এ হিসেবে চলমান ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি আয় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে উন্নীত করতে মোট ৩৩.২৪ লক্ষ মে টন মাছের প্রয়োজন হবে। এ প্রেক্ষিতে আগামী ২০১৫ এবং ২০২১ সালে দেশে মোট মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ৩৫.৪০ ও ৩৯.১০ লক্ষ মে টন (সারণি ২)।

সারণি ২ ঃ ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২০২১ মেয়াদে উৎসভিত্তিক উৎপাদন প্রক্ষেপণ ও মাছের চাহিদা

(উৎপাদন লক্ষ মেট্রিক টনে)

মৎস্য সম্পদের উৎস/উৎপাদন ক্ষেত্র	বর্তমান উৎপাদন	উৎপাদন প্রক্ষেপণ					
	২০০৮-০৯	২০১০-১১	২০১২-১৩	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	২০২০-২১
অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়	১১.২৪	১৩.৯৩.	১৬.৫৯	১৬.৯০	১৭.১০	১৭.৩৪	১৭.৬৪
নদী ও মোহনা	১.৩৮	১.৪৯	১.৫৯	১.৬৮	১.৭৬	১.৮৩	১.৯২
সুন্দরবন	০.১৯	০.১৯	০.২০	০.২০	০.২১	০.২২	০.২২
বিল	০.৭৯	০.৮৬	০.৯৩	১.০২	১.১২	১.২৪	১.৩৬
কাপ্তাই লেক	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.১০	০.১০	০.১০	০.১১
প্লাবনভূমি/হাওর	৮.৭৯	১১.৩০	১৩.৭৮	১৩.৯০	১৩.৯১	১৩.৯৫	১৪.০৩
অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়	১০.৬৩	১১.৬৩	১২.৮১	১৪.১০	১৫.৪০	১৬.৫৬	১৭.৬১
পুকুর/দিঘি	৯.১২	১০.০৪	১১.১০	১২.২৭	১৩.৪৬	১৪.৪৯	১৫.৪০
বাঁওড়	০.০৫	০.০৯	০.০৯	০.১০	০.১০	০.১০	০.১১
চিংড়ি খামার	১.৪৬	১.৫০	১.৬২	১.৭৩	১.৮৪	১.৯৭	২.১০
সামুদ্রিক	৫.১৪	৫.২৭	৫.৪৭	৫.৬৬	৫.৮২	৫.৯৮	৬.১৪
ট্রল ফিসিং	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৬	০.৩৭	০.৩৭	০.৩৮	০.৩৯
আর্টিসেনাল	৪.৭৯	৪.৯২	৫.১১	৫.২৯	৫.৪৫	৫.৬০	৫.৭৫
মোট মৎস্য উৎপাদন	২৭.০১	৩০.৮৩	৩৪.৮৭	৩৬.৬৬	৩৮.৩২	৩৯.৮৮	৪১.৩৯
রোড ম্যাপ অনুযায়ী মাছের চাহিদা	৩২.২০	৩৩.২৪	৩৪.৭৮	৩৫.৪০	৩৬.৬১	৩৭.৮৭	৩৯.১০

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানো, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্রমধারায় চিহ্নিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ঃ সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালার অভাব, বেসরকারি পুকুর-দীঘির যৌথ মালিকানা, জলাশয়ের পানির প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃখাত ব্যবহার, দরিদ্র পুকুর মালিকদের পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব, উৎপাদন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অপর্যাপ্ততা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অপ্রতুলতা, চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্যাসমূহ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ঃ মৎস্য মজুদ ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ কৌশল নিরূপণ করাসহ মুক্ত জলাশয়ের যথাযথ উৎপাদন প্রক্ষেপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সৃষ্ট সমস্যাদি, যেমন- কৃষি জমিতে অতিরিক্ত সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, শিল্পায়নের বর্জ্য দ্বারা জলাশয়ের পানি দূষণ, নদী বা সংযোগ খাল পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিকভাবে মাছের মজুদ ও বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি, মৎস্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রগুলো বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি সমস্যা মুক্ত জলাশয়ের সহনশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গ. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনাঃ উপকূলীয় চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ির পোনা ও উৎপাদন সামগ্রীর অপ্রতুলতা, উপযুক্ত মৌলিক অবকাঠামোর অভাবে নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সমস্যা, উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত অবক্ষয়, চিংড়ি পোনা আহরণের সময় অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির পোনার ব্যাপক মৃত্যু, চিংড়ির রোগবালাই, চিংড়ি চাষে উচ্চ বিনিয়োগ খরচ, ভূমি ব্যবহারে আন্তঃখাত প্রতিযোগিতা, নিরাপত্তার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রযুক্তি প্রয়োগ সম্পর্কীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সমন্বিত নীতিমালার অভাব, খাদ্য নিরাপদ বিষয়ে চিংড়িচাষি ও ব্যবসায়ীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব ইত্যাদি সমস্যা উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ঃ বাংলাদেশে বিশাল সামুদ্রিক জলজসম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের মাত্র ২২ শতাংশ (২০০৮-০৯) আসে এ ক্ষেত্র থেকে। এজন্য যে সব বিষয়কে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো মাছের মজুদ সম্পর্কে সীমিত তথ্য ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব, উপকূলবর্তী এলাকায় অতিমাত্রায় মাছ ও চিংড়ি আহরণের ফলে মজুদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন, অবৈধ জালের ব্যবহার, অপরিকল্পিতভাবে ডিমার্সেল ও পেলাজিক মাছের আহরণ, পেলাজিক মাছ আহরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব, যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা নীতির অভাব, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পরিবহনের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব চিহ্নিত সমস্যাদি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশল

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং রপ্তানির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন;
- মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনমানের উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধি, এবং প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ঈপ্সিত সুফল বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র, ভূমিহীন, মহিলা ও সুবিধাবঞ্চিতদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
- জলজ পরিবেশের উন্নয়ন এবং উন্মুক্ত জলাশয় তথা নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের দক্ষতা উন্নয়ন;
- মৎস্য আহরণোত্তর ক্ষতি কমানোর নিমিত্ত মৎস্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- রপ্তানি বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ ও বিপণনের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা মানের উন্নয়ন;
- মৎস্য গবেষণা, সম্প্রসারণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদারকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতি মোকাবেলার লক্ষ্যে অভিযোজন।

উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচি

ক. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ঃ দেশের বদ্ধ জলাশয়গুলো মাছ উৎপাদনের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার পুকুর-দীঘি, বাঁওড় ও চিংড়ি খামার। আরও রয়েছে অসংখ্য চাষোপযোগী মৌসুমি জলাশয়। ২০০৮-২০০৯ সালের হিসাব মতে দেশের মোট ৫.২৮ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় থেকে ১০.৬৩ লক্ষ মে.টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে। যদিও অভ্যন্তরীণ মোট জলজসম্পদের মাত্র ১২ শতাংশ বদ্ধ জলাশয় তথাপি এর থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন মোট উৎপাদনের প্রায় ৪৯ শতাংশ। বিগত ১০ বছরের উৎপাদন ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, উক্ত সময়ের ব্যবধানে বদ্ধ জলাশয়ের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৬২ শতাংশ। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজপ্রাপ্যতা। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় মাছ চাষে বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১১৫টি সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৮৮০টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০০৯ সালের তথ্য অনুযায়ী এসকল সরকারি-বেসরকারি হ্যাচারি থেকে বার্ষিক রেণু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪৬২ মে টন এবং নার্সারি থেকে চাষোপযোগী উৎপাদিত পোনার সংখ্যা প্রায় ৯৬১ কোটি। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে (পুকুর-দীঘি ও বাঁওড়) উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ৯.১৭ লক্ষ মে.টন থেকে ২০১৫ সালে ১২.৩৭ লক্ষ মে.টন এবং ২০২১ সালে ১৫.৫১ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি ১)। এ বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

১. স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা ইউনিট ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতকরণ;
২. মৎস্য/চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নততর চাষ পদ্ধতির প্রচলন;
৩. সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহারের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন;
৪. ব্রুড মাছের জাত উন্নয়ন, জিনপুল প্রতিষ্ঠা ও গুণগতমানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
৫. মঙ্গাকবলিত এলাকায় মৎস্যবিষয়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আপদকালীন জীবিকায়নের লক্ষ্যে খাদ্য সহায়তাসহ পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ;
৬. মৎস্য খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের মান নিশ্চিতকরণ;
৭. মাছ ও চিংড়ি রোগ নিরাময় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৮. মৎস্যচাষিদের জন্য সহজশর্তে ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
৯. গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
১০. উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
১১. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
১২. ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
১৩. মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম জোরদারকরণ।

খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ঃ বাংলাদেশে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টরের বেশি অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় রয়েছে, যা মৎস্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। ষাটের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ আসতো উন্মুক্ত জলাশয় হতে, বর্তমানে যা ৩৫ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। মৎস্য অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সমাজভিত্তিক জলাশয় ব্যবস্থাপনা, মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ, মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জলমহালের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী/সুফলভোগীগণের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বেড়েছে। পোনা অবমুক্ত কার্যক্রমকে আরও অধিক স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত জলাশয়ে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীগণের মাধ্যমে বিল নার্সারি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের সকল উৎস থেকে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ২০১৫ সালে মাছের উৎপাদন ১৬.৯০ লক্ষ মে. টন এবং এবং ২০২১ সালে ১৭.৬৪ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি ২)।

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন এবং বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। এ দশকের প্রথম দিকে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৩৭৭টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। অভয়াশ্রম পরিচালনার এক-দুই বছরের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখা যাওয়ায় দেশব্যাপী বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৬৬টি-তে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ঐসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি, যথা- চিতল, ফলি, কালিবাউশ, আইর, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, কাজলি, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। এতে মৎস্য তথা জলজ জীববৈচিত্র্যে ভারসাম্য ফিরে আসতে শুরু করেছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের পাশাপশি মাছের

স্বাভাবিক চলাচল, বিশেষ করে প্রজনন মৌসুমে মাছের অবাধ অভিপ্রয়াণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নদীর সংযোগ খাল, মরা নদী ও বিল খনন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় কার্প ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন ও বর্ধন নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষিদের ক্ষতি সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার সাথে সাথে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ যোগান দেয় ইলিশ। এ মূল্যবান সম্পদ উন্নয়নে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি একটি অন্যতম চলমান কার্যক্রম। সরকার এই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, স্থানীয় প্রসাশন, পুলিশ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও নদী তীরবর্তী সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া ইলিশ সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৪টি পয়েন্টকে ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকা হিসেবে ঘোষণাসহ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ সকল উৎপাদনমুখী ও সময়োপযোগী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০০৮-০৯ সালে ইলিশের উৎপাদন ২.৯৯ লক্ষ মে. টন-এ উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৩-২০০৪ সালে উৎপাদিত ১.৯৯ লক্ষ মে. টন হতে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

১. মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
২. বর্তমানে চালু জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিবর্তন/পরিমার্জন করে অভ্যন্তরীণ জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
৩. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ;
৪. মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে দাদনদারদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক/উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং সংগঠিত করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৫. খাস জলাশয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ। প্রবাহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র/লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ;
৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করার সাথে সাথে জলজ পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;
৭. বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
৮. মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন ও বাস্তবায়ন অধিকতর জোরদারকরণ;
৯. উপযুক্ততা নিরূপণ সাপেক্ষে ঘের, পেন ও খাঁচায় মাছচাষ সম্প্রসারণ;
১০. প্লাবনভূমিতে মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্জিত উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্প্রসারণ এবং সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা;
১১. মৎস্যজীবীদের জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণ;
১২. ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ ও মজুদ নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা। তাছাড়া উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ ও মজুদ সংক্রান্ত ডেটাবেইজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জরিপ কাজ পরিচালনা;
১৩. মৎস্য খাদ্য, মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য কোয়ারেন্টাইন এবং মৎস্য অভয়াশ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
১৪. আধা-লবণাক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ সম্প্রসারণ।

গ. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনাঃ চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্যখাত ইতোমধ্যেই ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে চিংড়ি খামারের আয়তন ০.৬৪ লক্ষ হেক্টর হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১.৩৫ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। এ সমস্ত চিংড়ি খামারের উৎপাদন প্রায় ০.৯২ লক্ষ মে টন (১৯৯৯-০০) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ সালে ১.৪৯ লক্ষ মে টনে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ হতে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশনও কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ সালে প্রায় ০.৭৩ লক্ষ মে টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে প্রায় ৩২৭৪ কোটি টাকা। উপকূলীয় এলাকায় উন্নত চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বর্তমানের ১.৪৯ লক্ষ মে টন থেকে ১.৭২ লক্ষ মে টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি ১)। বর্ধিত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কৌশলসমূহ হলো ঃ

১. চিংড়িচাষ এলাকা ঘোষণা ও চিংড়িচাষ এলাকার মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন;
২. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও চাষ নিবিড়করণ;
৩. চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে উত্তম চাষ পদ্ধতি এবং উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন;
৪. খাদ্য নিরাপদ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি;
৫. সমুদ্র থেকে মা চিংড়ি সংগ্রহ কার্যক্রম উন্নয়ন;
৬. মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় কিশোর চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধকরণ;
৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘন ঘন দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
৮. সুন্দরবন এলাকার মৎস্য নার্সারি ও প্রজননক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ;
৯. গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
১০. উপকূলীয় এলাকার জনগণকে চিংড়ি চাষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত করাসহ সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদঃ বাংলাদেশে রয়েছে বিশাল সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ। এ অফুরন্ত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকার ইতোমধ্যে ট্রাস ফিস সমুদ্রে নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে প্রতিটি মাছ ধরার ট্রলার হতে প্রায় ৩০ শতাংশ সাদা মাছ বেশি আহরিত হচ্ছে। সরকার এর পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য সুষম রাখার উদ্দেশ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণে ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের অধিকতর উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকার সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। একই সাথে সরকার সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস-এর নিকটবর্তী ৬৯৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ৫.১৪ লক্ষ মে. টন থেকে ২০১৫ সালে ৫.৬৬ লক্ষ মে. টন এবং ২০২১ সালে ৬.১৪ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি ২)। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ থেকে বর্ধিত মাছ/চিংড়ি আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

১. জরিপের মাধ্যমে পেলাজিক ও ডিমার্সেল মাছের মজুদ নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন;
২. যান্ত্রিক নৌযানে কর্মরত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি;
৩. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স বা এমসিএস কৌশল প্রবর্তন;
৪. উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
৫. আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন এবং নিরাপদ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৬. জলযান নিবন্ধন ও মাছ ধরার অনুমতি প্রদানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ;
৭. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা নীতির প্রবর্তন।

উপসংহার

বিগত দিনগুলোতে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ সার্থকতা এবং উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গতিধারার আলোকে এ সেক্টরের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অধিক অংশগ্রহণ এখন সময়ের দাবি। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ও উপকূলীয় এলাকার আধা-লবণাক্ত জলাশয়ের বিস্তৃতি, উৎপাদনশীলতা ও প্রযুক্তি প্রয়োগের পর্যায় বিবেচনা করে মাছ ও চিংড়ি চাষ উন্নয়নের জন্য লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। জলমহাল নীতিমালা পরিবর্তনপূর্বক মুক্ত জলাশয়ে রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করাও এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তবে উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ বাজার ও রপ্তানি বাণিজ্যে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় এমসিএস ও ভিটিএমএস পদ্ধতি প্রচলনসহ জলযান নিবন্ধন ও মাছ ধরার অনুমতি প্রদানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট, জাটকা রক্ষার গুরুত্ব, বিদ্যমান সমস্যা ও করণীয়

মোঃ নজরুল ইসলাম[১]
এ বি এম জাহিদ হাবিব[২]
ড. নির্মল চন্দ্র রায়[৩]

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয় এ মাছ অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে এবং জিডিপি-তে এর অবদান শতকরা ১ ভাগ। বর্তমানে ইলিশের উৎপাদন প্রায় ৩.০ লক্ষ মে.টন, যার বাজার মূল্য প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা (প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসেবে)। উৎপাদিত ইলিশের কিছু পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি করে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বর্তমানে সারাবিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৫০-৬০ শতাংশ আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী থেকে। কাজেই দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

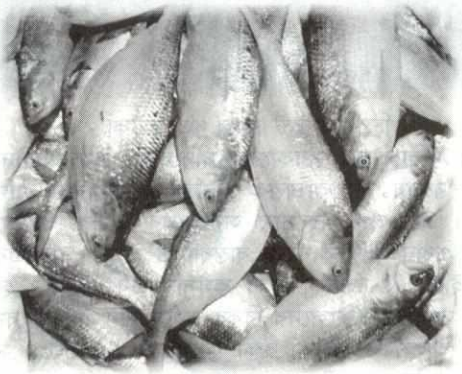

চিত্রঃ জাতীয় মাছ ইলিশ

ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৫.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক পরিবহন, বিক্রয়, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। খাদ্য সরবরাহের দিক থেকে বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু মাছ হচ্ছে ইলিশ। এ মাছে উচ্চমাত্রায় আমিষ, চর্বি ও খনিজ পদার্থ রয়েছে। ইলিশ মাছের চর্বিতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এ মাছের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে জলজ পরিবেশ, প্রজনন সফলতা, জাটকা রা তথা বাঁচার হার বৃদ্ধির সুযোগ এবং আহরণমাত্রা বা মাছ ধরার পরিমাণের ওপর।

জাটকা রক্ষা, কেন?

আজকের জাটকাই আগামী দিনের ইলিশ। 'Jatka is caught - Hilsa is lost' অর্থাৎ সহনশীল পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণে জাটকা ধরা হলে ইলিশ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের দেশে প্রচলিতভাবে ৯ ইঞ্চি (২৩ সেমি) আকার পর্যন্ত ছোট ইলিশ মাছকে জাটকা বলা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে যে পরিমাণ জাটকা উৎপাদিত হয় তার ১০% বড় হওয়ার সুযোগ পেলে ইলিশের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। গত ২০০৩-০৪ সাল হতে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এর সুফল পাওয়া গেছে। ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩.১২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। কাজেই জাটকা রক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- জাটকা রক্ষা করে ইলিশের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে বৃদ্ধিকরণ;
- টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ইলিশ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে জেলে/মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস;
- উৎপাদিত ইলিশের এক বিরাট অংশ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধিকরণ।

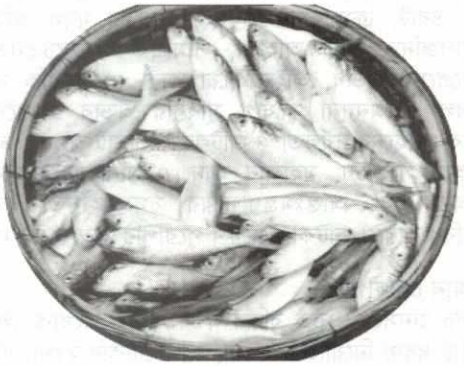

চিত্রঃ জাটকা

১ কর্মসূচি সমন্বয়কারী, জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি, মৎস্য অধিদপ্তর
২ প্রকল্প পরিচালক, জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প
৩ সহকারী পরিচালক, জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প

জাটকা সংরক্ষণে বিদ্যমান সমস্যা

ইলিশ সাগরের মাছ হলেও প্রজনন মৌসুমে (আগস্ট-অক্টোবর) ডিম ছাড়ার জন্য উপকূলীয় মোহনা ও নদীর উজানে চলে আসে এবং ডিম ছাড়ার পর আবার সাগরে ফিরে যায়। এ সময় নদীর মোহনায় উৎপাদিত হয় ইলিশের লক্ষ লক্ষ রেণু পোনা ও বাচ্চা ইলিশ, যা নদ-নদীতে বিচরণ করে জাটকায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে নভেম্বর-মে মাস পর্যন্ত ইলিশ জাটকা অবস্থায় ৯ ইঞ্চির নিচে থাকে। এসময় জাটকা ধরা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও নির্বিচারে প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ (সংশোধিত ২০০৩) এর বিধান অনুযায়ী নভেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত জাটকা ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, হেফাজতে রাখা এবং পরিবহন আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ প্রায়শ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা ধরা হচ্ছে এবং হাটে-বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, ইলিশ অভয়াশ্রম হিসেবে চিহ্নিত, ৪টি জেলার (ভোলা, পটুয়াখালী, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর) নদ-নদীতে ৬০% জাটকা বিচরণ করে থাকে এবং বছরে প্রায় ৪৬৩ মিলিয়ন জাটকা ধরা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মৎস্যজীবী/জেলে সম্প্রদায় নিম্ন আয়ের মানুষ। বিশেষত জাটকা আহরণে নিয়োজিত জেলে সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা প্রধানত জাটকা আহরণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জাটকা আহরণকারী জেলেরা বলেন, 'ইলিশ পাই না; তাই পেটের দায়ে জাটকা ধরি'। আবার ভোক্তাগণ বলেন, 'ইলিশ পাই না; তাই ইলিশের স্বাদ মেটানোর জন্য বাধ্য হয়ে জাটকা কিনি'। অন্যদিকে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বলেন, আমরা ইচ্ছা করে জাটকা কিনতে চাই না, কিন্তু জেলেরা এনে দেয় তাই বাধ্য হয়ে জাটকা কিনি। প্রকৃতপক্ষে আমরা কেউ ত্যাগ স্বীকারে রাজি নই। তাই বলা যায়, জাটকা সংরক্ষণে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে আর্থসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের অভাব। এ ছাড়াও নদ-নদী সঙ্কোচন, ব্যাপকভিত্তিক কারেন্ট জাল উৎপাদন ও ব্যবহার, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজানে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, পানিদূষণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন, কর্মসংস্থানের অভাব, জেলেদের দৈন্যতা, জাটকা আহরণকারী জেলেদের সরকারি অপর্যাপ্ত ভর্তুকি, জলাশয়ে পলি ভরাট, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত চাহিদাজনিত অতি আহরণ, সামগ্রিক জনসচেতনতা ও দেশপ্রেমের অভাব, আইন প্রয়োগকারী ও তদারকি সংস্থার জনবল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব, আইনের দুর্বলতা ও জটিলতা, বাজেট স্বল্পতা, দারিদ্র্য ও আয় সঙ্কোচন, মহাজনি ফাঁদ ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে জাটকা সংরক্ষণ পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক লোকের এ মাছ ধরায় নিয়োজিত হওয়া, জাল নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও যান্ত্রিকায়ন, অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এ মাছের আহরণমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধিসহ অবাধে জাটকা ধরার কারণে এ শতকের শুরুতে ইলিশের উৎপাদন নিম্নমুখী হতে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, গতিপথ পরিবর্তন, পলি ভরাট, ইত্যাদি কারণে প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র ধ্বংস এবং জলজ পরিবেশ দূষণের ফলে এ মাছের বিস্তৃতি ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাই ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে জাটকা সংরক্ষণ, ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা, অবাধ প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কাজে জেলেদের নিবৃত্ত করার জন্য আপদকালীন পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি জেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যাতে তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি আসে যে, জাটকা রক্ষার ফলে তারাই বেশি লাভবান হবেন।

চিত্রঃ কারেন্ট জালে ধৃত জাটকা

বর্তমান দরিদ্রবান্ধব সরকারের সদিচ্ছায় মৎস্য অধিদপ্তর জাটকা রক্ষায় ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে সরকারের রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রধান দু'টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর একটি হলো ইলিশ ও জাটকা রক্ষা কর্মসূচি এবং অন্যটি হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প। ইলিশ ও জাটকা রক্ষা কর্মসূচিটি ২০০৩-০৪ সাল থেকে শুরু হলেও জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের কার্যক্রম ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী কর্মপন্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত বর্ধনশীল জাটকা নিধন বন্ধ করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ইলিশ মাছ রক্ষা করে সফল প্রজননে সহায়তা করা ও জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি;
- অভয়াশ্রম এলাকায় সকল প্রকার মাছ রক্ষা করা এবং নদ-নদীর মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি;
- ইলিশ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস।

জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

- জাটকা রক্ষার গুরুত্ব ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সমাবেশ আয়োজন;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। জাটকা নিধন রোধে প্রতি বছর নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত নদ-নদী, হাট-বাজারে বিশেষ অভিযান/ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা;
- ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রমসমূহে মাছ ধরা নিষিদ্ধ আইন কাঠোরভাবে বাস্তবায়ন তথা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকরণ; ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১,৬৪,৭৪০টি জেলে পরিবারকে ৪ মাসব্যাপী (ফেব্রুয়ারি-মে পর্যন্ত) পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হারে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং সর্বমোট ১৯,৭৬৮ মে.টন চাল বিতরণ;

চিত্র ঃ জেলেদের মাঝে ভিজিএফ বিতরণ

- জাটকা মৌসুমে জাটকা ধরা থেকে বিরত রাখার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে/পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এবছর জাটকা কর্মসূচির আওতায় ২.০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০,৩৫৮ জন এবং জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ৩.০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৩৭৫ জন পরিবারের মাঝে বিভিন্ন ট্রেডে উপকরণ/অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান। বিকল্প কর্মসূচির আওতায় উপকরণসমূহ হলো গরু মোটাতাজাকরণ, রিক্সা/ভ্যান, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই মেশিন, সবজি বাগান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, জাল তৈরি ইত্যাদি;
- মনোনীত সুফলভোগী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ইলিশের ভরা প্রজনন মৌসুমে উপকূলীয় ৭০০০ বর্গ কিমি বেষ্টিত এলাকায় প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন বাস্তবায়ন। যাতে মা ইলিশ প্রজনন মৌসুমে নির্বিঘ্নে ডিম দিতে পারে। সরকার এ

চিত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন

আইনকে আরো বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য আশ্বিনের (অক্টোবর) বড় পূর্ণিমার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতি বছর পূর্ণিমার আগে ৫ দিন ও পরে ৫ দিন করে মোট ১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে;

- জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে গণমানুষ বিশেষ করে জেলে/মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়তদার ও সংশ্লিষ্টদের সচেতন করে তোলা এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন;
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাটকা ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে নিয়মিত গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ এবং জাটকা রক্ষা কর্মসূচির ফলাফল নিরূপণ।

উল্লিখিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ রক্ষা হবে এবং জাটকা রক্ষার সুফল সংশ্লিষ্ট জেলে/মৎস্যজীবী জানতে পারবে, এতে দেশের মূল্যবান ইলিশের বর্তমান উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ সালে ৪.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

ইলিশের সামগ্রিক উৎপাদন

- বঙ্গোপসাগরের উপকূল তথা বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়ে। মায়ানমার ও ভারতের বার্ষিক ইলিশের গড় উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় ১.০-১.২৫ লক্ষ মে.টন ও ০.৫০-০.৬০ লক্ষ মে.টন। সার্বিকভাবে সারাবিশ্বে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৫.০-৬.০ লক্ষ টন। এর মধ্যে বাংলাদেশে ৫০-৬০%, মায়ানমারে ২০-২৫%, ভারতে ১৫-২০% এবং অবশিষ্ট ৫-১০% অন্যান্য দেশে ধরা পড়ে।
- ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিগত ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০০২-০৩ সালে দেশে ইলিশ

- ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিগত ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০০২-০৩ সালে দেশে ইলিশ উৎপাদন প্রায় ১০% হ্রাস পেয়েছিল। ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখাসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০০৩ সাল হতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, ফলে ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০০৬-০৭ সালে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৮১,০০০ মে.টন অর্থাৎ ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসূচি পূর্ববর্তী বছরে (২০০২-০৩) ইলিশের উৎপাদন ছিল ১.৯৯ লক্ষ মে.টন, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩.১২ লক্ষ মে. টন। বিগত ৭ বছরে ৫.৯৬ লক্ষ মে.টন বর্ধিত ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ১৪,৯০০ কোটি টাকা (প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসাবে)।

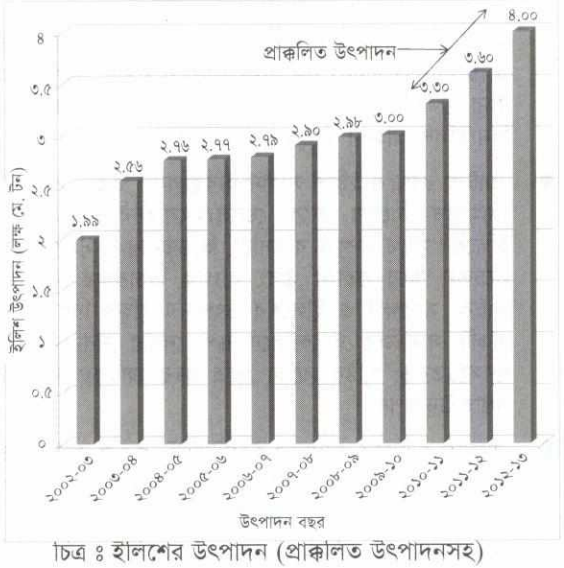

চিত্র ঃ ইলিশের উৎপাদন (প্রাক্কলিত উৎপাদনসহ)

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন কৌশল ও করণীয়

ইলিশ ও জাটকা আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীগণ এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী। এ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তাঁদেরকে নিবিড়ভাবে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে হবে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সম্পদ চিহ্নিত করা এবং দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে দীর্ঘমেয়াদে বিকল্প কর্মসংস্থন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইলিশের উৎপাদন জলজ পরিবেশ ও নদ-নদীতে পানি প্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের জলজ পরিবেশের ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রসারিত শিল্পায়ন ও কলকারখানার বর্জ্য যথাযথভাবে দূষণমুক্তকরণের ব্যবস্থা না করে নদীতে ফেলার কারণে দেশের জলজ পরিবেশ ক্রমাগতভাবে দূষিত হচ্ছে। ফলে ইলিশসহ দেশের অন্যান্য মৎস্য সম্পদের জন্য হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের সকল স্তরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইলিশ মাছের অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে এ সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরো জোরদার করতে হবে। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার-

- জাটকা সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন;
- জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন;
- ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ/জাটকা প্রতিপালনের সুযোগ বৃদ্ধি;
- জরুরি ভিত্তিতে সরকারের উচ্চমহলের সহযোগিতায় কারেন্ট জাল উৎপাদন কারখানা বন্ধকরণ; প্রয়োজনে কৃষি বিভাগের মত কারেন্ট জাল উৎপাদনকারী কারখানা মালিকদের ভর্তূকি প্রদান করে কারখানা বন্ধ করতে হবে।
- ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ;
- ডিমওয়ালা ইলিশ ও ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ;
- ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন; পরিবেশ উন্নয়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে নদী খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন;
- ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;
- ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল তৈরি, জনবল ও অবকাঠামো জোরদারকরণ;
- জাটকা ও ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন দরিদ্র জেলেদের প্রয়োজন মাফিক খাদ্য সহায়ত প্রদান;
- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের পুনর্বাসন বা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ;
- ইলিশ জেলেদের জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রচলন ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান;
- ইলিশ মাছ পরিবহন, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন ও মাননিয়ন্ত্রণ; এবং
- ইলিশ মাছের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ।

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্টের চাষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রের (ফিয়াক) অনন্য ভূমিকা

মোঃ গোলজার হোসেন[১]
খঃ মাহ্‌বুবুল হক[২]
এ কে এম আমিনুলাহ ভূঞা[৩]

নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি চাষির দোরগোড়ায় তাদের উপযোগী করে পৌঁছে দেয়া সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি সম্প্রসারণের এই চ্যালেঞ্জটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (NATP) সম্প্রসারণের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিসমূহের 'ধারক ও বিতরণকেন্দ্র' হিসেবে চাষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র বা ফিয়াক (FIAC: Farmer's Information and Advice Center) গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাষি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিগণ, যেন এক জায়গা থেকেই তাদের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ পেতে পারেন। যেহেতু, ইউনিয়ন পরিষদ কৃষিসহ গ্রাম-জীবনের সার্বিক চালচিত্র তুলে ধরা ও তার সমর্থনে সরকারি-বেসরকারি পরিসেবা প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে ক্রমশ গণমানসে যথার্থ স্থান লাভ করছে সেহেতু, গ্রামবাসীদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ ভবনেই ফিয়াক স্থাপিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

সরকারি কৃষিসেবা জনগণের মাঝে দ্রুত ও সঠিক সময়ে পৌঁছে দেয়া এবং পাশাপাশি জনগণের চাহিদা নিরূপণ কেন্দ্র হিসেবে এই ফিয়াকসমূহ গড়ে তোলা। এখানে জন-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক চাহিদার রূপটি যেমন প্রকাশ পাবে, তেমনি সরকারি কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাবৃন্দের মাধ্যমে প্রযুক্তিসহ সম্প্রসারণ-উপযোগী বিভিন্ন সেবা সুশৃঙ্খল ও চাহিদামাফিক ইউনিয়ন-এর সকল চাষির মাঝে সহজেই বিতরণ করা হবে। ফলে, সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন চাষিদের চাহিদাভিত্তিক হবে, তেমনি এর জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সেবা কার্যকরভাবে তাদের কাছে দ্রুত পৌঁছাবে।

ফিয়াক (FIAC) প্রদেয় সেবা

শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য - এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার কৃষি ব্যবস্থা। দেশের আর্থসামাজিক পেক্ষাপটে এই তিনের গুরুত্ব ঐতিহ্যগতভাবে জাতীয় পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। প্রকল্পাধীন ফিয়াকসমূহ এই তিন বিষয়ে যেসব সেবা প্রদান করবে তা নিম্নরূপ:

- চাষিদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশে বরাদ্দকৃত কক্ষসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও প্রশিক্ষণ-সহায়ক সামগ্রী থাকবে;
- শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতমানের বীজ, মাছের রেণু ও পোনা, খাদ্য, সার ঔষধপত্র, ইত্যাদির প্রাপ্তি ও উৎস সম্পর্কে চাষিদেরকে অবহিত করার জন্য UEFT (Union Extension Facilitation Team) প্রতিনিধিগণ পূর্বনির্ধারিত দিন ও সময়সূচি মোতাবেক ফিয়াকে উপস্থিত থাকবেন। সাক্ষাৎকারী চাষিগণকে তারা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরামর্শও দেবেন।
- সময়ে সময়ে কৃত্রিম পরিনিষেক (Artificial Insemination) এবং গরু-মহিষ, ছাগল ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদানের জন্য ফিয়াক কাজ করবে।
- আগত চাষিদের জন্য UECC (Union Extension Coordination Committee) এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের পুস্তিকা ও লিফলেটসহ বিভিন্ন মুদ্রিত প্রকাশনা ফিয়াকে থাকবে।
- UECC'র সহযোগিতায় সিআইজি (CIG: Common Interest Group) চাষিদের জন্য গবেষণা কেন্দ্র, ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার, কৃষি ব্যবসা কেন্দ্র (শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য) ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ফিয়াক।

অর্থাৎ সমন্বিত কৃষি (শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য) বিষয়ক সেবার জন্য ফিয়াক হবে একক সেবাকেন্দ্র বা One Stop Service Centre। ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে বরাদ্দকৃত ২টি করে আসবাবপত্র, মেরামত ও নবায়ন, সাইনবোর্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহকারে পূর্ণাঙ্গরূপে সজ্জিত করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে চাষি তথা উৎপাদকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহজে পাওয়ার সুবিধার্থে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি ফিয়াককে Community Information Center হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

ফিয়াকে দায়িত্ববণ্টন ও সময়সূচি

সকল UEFT সদস্য (SAAO- Sub-Assistant Agriculture Officer, LEAF- Local Extension Agent for Fisheries, CEAL- Community Extension Agent for Livestock ও বৈজ্ঞানিক সহকারী) ফিয়াকে বসবেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ SAAO (UEFT চেয়ারম্যান) প্রত্যেকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য UEFT'র সকল সদস্যের ভূমিকা ও কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করবেন।

১ পরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)
২ সহকারী পরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)
৩ উপদেষ্টা, জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)

ছুটির দিন এবং উপজেলায় সভার দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে ১জন করে SAAO পর্যায়ক্রমে পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে ফিয়াকে উপস্থিত থাকবেন। এই পূর্ব-নির্ধারিত সময়টি সংশ্লিষ্ট সকল সিআইজি সদস্য এবং ইউনিয়নের সাধারণ চাষিকে জানিয়ে দেওয়া হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য কার্যালয় প্রধানগণের সাথে আলোচনাপূর্বক সিনিয়র উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সিল (CEAL) ও লিফ (LEAF) এর ফিয়াকে সেবাদান সময়সূচি নির্ধারণ করবেন। যখন যেমন প্রয়োজন - এই ভিত্তিতে ভেটেরিনারি সহকারী এবং মৎস্য বিভাগের ক্ষেত্র সহকারীও ফিয়াকে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। চাষিদের সমস্যাসমূহ তালিকাভুক্ত এবং প্রদত্ত সমাধানসমূহ লিখে রাখার জন্য তারা আলাদা আলাদা রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। এই রেজিস্টারে চাষিদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, আলোচিত সমস্যা, প্রদত্ত পরামর্শ, পরামর্শদাতা, পরামর্শদানের তারিখ ও সময়, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফিয়াক ও লিফ

মাছে-ভাতে বাঙ্গালী - এই পরিচয়ের মধ্যে কৃষির সাথে মাছের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ফিয়াকে তাই শস্য ও প্রাণিসম্পদের সুষ্ঠু বিকাশের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণার্থে চাষিদের চাহিদাভিত্তিক মৎস্য বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি বিতরণের বিষয়টিও সবিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষিদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লিফ তাই ফিয়াকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকবেন।

ফিয়াকে লিফের ভূমিকা

গুরুত্বপূর্ণ এই ফিয়াকে মৎস্য বিষয়ক কার্যাবলি অন্যতম। এই কার্যক্রম বস্তবায়নের ক্ষেত্রে লিফগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন এবং উপজেলা মৎস্য অফিস লিফগণের দায়িত্ব পালনে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করছে। মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণে লিফ পদ্ধতি ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অত্যন্ত কার্যকর বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। সংক্ষেপে লিফ পদ্ধতির ব্যবহারিক রূপ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. লিফগণ মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের মৎস্য-সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করবেন।

২. প্রকল্প লিফগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদান করবে। প্রশিক্ষণের বিষয়, মেয়াদ, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চাহিদার ওপর নির্ভর করবে।

৩. ইউনিয়নের সকল মাছ চাষির দোরগোড়ায় দ্রুত সেবা পৌঁছে দেওয়ার সুবিধার্থে তাদেরকে বাইসাইকেল দেয়া হয়েছে। মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রয়োজনে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে চাষিদেরকে সরাসরি পরামর্শ দানের জন্য লিফদেরকে উন্নতমানের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতিসহ বিশেষ 'কিট' (Water Analyzing Kit) দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে পানির গুণাগুণ কাঙ্ক্ষিত মানে বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি অপচয় রোধ করেও মাছচাষির মুনাফার পরিমাণ বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব হবে।

৪. লিফগণ নিজ উদ্যোগে তাদের নিজ নিজ এলাকায় মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সার্বক্ষণিকভাবে সম্প্রসারণ-সেবা দিয়ে যাবেন। বিনিময়ে সেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে লিফগণকে 'সেবা মূল্য' প্রদান করবেন।

৫. সিআইজি ইউনিয়ন পর্যায় গঠিত একই স্বার্থযুক্ত ১৫ জন চাষির একটি দল। সিআইজি সদস্যগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে লিফগণ সিআইজিভুক্ত চাষিগণের মাধ্যমে মৎস্য খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। ফিয়াকে উপস্থিত থেকে মৎস্য চাষিদেরকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও সম্প্রসারণ মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সিআইজি সদস্যগণকে সহায়তা প্রদান লিফগণের অন্যতম প্রধান কাজ।

কাজেই এনএটিপি'র মৎস্য বিষয়ক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দুতে ফিয়াকের অবস্থান। অপরদিকে গুরুত্বপূর্ণ এই ফিয়াক কার্যকর করার ক্ষেত্রে লিফের বিকল্প নেই। এই বিবেচনায় প্রকল্প থেকে সম্ভব সকল উপায়ে লিফদেরকে গড়ে তোলা এবং তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহার

ফিয়াক এবং লিফ - এই কার্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অপরিহার্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এখন এর সাথে প্রয়োজন ইউনিয়নবাসীদের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে গণমাধ্যমে তুলে ধরা এবং স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা। প্রকল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অংশের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এখন সেই কাজটি সম্পাদনে ব্রতী। ইতোমধ্যে ৬২০টি ফিয়াক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রকল্প মেয়াদে আগামী দু'বছরের মধ্যে অবশিষ্ট প্রায় ৭৫০টি ইউনিয়নে ফিয়াক স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে প্রকল্পভুক্ত সকল ইউনিয়নের চাষিগণ তথ্য প্রযুক্তিগত সকল সেবা প্রায় 'ঘরে' বসেই পাবেন। ফলে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে চাষি তাঁর কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা ও আমিষের উৎপাদন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক অবস্থা মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। দেশবাসীর নিকট তখন ফিয়াক স্থাপনের সুফল আরও সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম

সৈয়দ আলী আজহার

দিন দিন বাড়ছে মানুষ - বাড়ছে মুখ, বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা- কমছে ফসলি জমি ও জলাশয়। কিন্তু মানুষতো আর না খেয়ে বাঁচতে পারে না। তাই বাঁচার জন্য চাই খাদ্য এবং সুষম খাদ্য। আর এ জন্যই হয়তো কবি লিখেছেন 'ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাব'। সুষম খাদ্য যোগানে প্রাণিজ আমিষের আবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন না এ দেশের মানুষ এখনও প্রতি বছর গড়ে ১৭.২৩ কেজি (২০০৭-০৮) মাছ গ্রহণ করে থাকে। আমরা এখনও প্রাণিজ অমিষের প্রায় ৬০% মাছ থেকে পাই। দেশের জনসংখ্যার সাথে সম্পর্ক রেখে ২০২১ সাল নাগাদ দেশে প্রক্ষেপণকৃত মোট মৎস্য চাহিদার পরিমাণ ৩৯.১০ লক্ষ মে.টন। এ চাহিদা পূরণ করা কীভাবে সম্ভব? সম্ভব কেবল চাষ প্রযুক্তির প্রসার এবং মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তা সম্ভব। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ৮৮.৪৫% জলাশয়ই মুক্ত জলাশয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নদী,হ্রদ, সুন্দরবনের জলাভূমি, বিল, কাপ্তাই লেক ও প্লাবনভূমি। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয় মাত্র ১১.৫৫%, যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, ডোবা, বাঁওড় ও চিংড়ি খামার। মুক্ত জলাশয়ে বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় হয়তো মাছ চাষ করা যাবে না কিন্তু দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উক্ত মৎস্য সম্পদকে কাজে লাগানো গেলে দেশের মাছের অভাব থাকার কথা নয়।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সকল প্রকার জলাশয়কে উৎপাদনমুখী ও জৈবিক ব্যবস্থাপনার অওতায় আনতে হবে এবং এর কোন বিকল্প নেই। আর এটি করা গেলে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা-এ দুটোরই নিশ্চয়তা বিধান হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। জৈবিক ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে কার্যকর যে সকল টুলস রয়েছে তার মধ্যে 'মৎস্য অভয়াশ্রম' স্থাপন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর টুলস বা প্রযুক্তি।

মৎস্য অভয়াশ্রম

অভয়াশ্রম (Sanctuary) শব্দটি মূলত মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যা মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary) নামে পরিচিত। Fish Sanctuary শব্দটি Bird Sanctuary বা Wildlife Sanctuary টার্ম দুটোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা প্যাগোডা ধর্মীয় উপসনালয়। এগুলো হল শান্তির নীড়। যেখানে সংশ্লিষ্ট ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করে। মানুষের জন্য এগুলো সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ও শান্তির নীড়। অভয়াশ্রম হল এমনই একটি স্থান (চিত্রঃ ১, ২ ও ৩)। সাধারণ অর্থে অভয়াশ্রম বলতে নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে বুঝায়। গির্জা বা মন্দিরের ন্যায় সবচেয়ে নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানের মত অভয়াশ্রম হবে মা-বাবা মাছসহ সকল প্রকার পোনা মাছের নিরাপদ ও শান্তিময় নীড়। Jhingran (১৯৮৪) এর মতে, মৎস্য অভয়াশ্রম হলো When certain section of rivers, beels or any reservoir is closed for fishing for a certain period or all the year round where fish congregate for breeding or fry or fingerling are found in large number. মজিদ (২০০২) মনে করেন ঃ It is a particular area in the water body which is established to maintain as a permanent shelter for protection of fish for natural propagation. অন্যান্যদের মতে, It is an adaptive approach for fish conservation and it relates to 'temple'. Sanctuaries increase species diversity, improve habitat, improve attitude, develop group activities and uplift household income (Ahmed and Ahmed, 2002).

অভয়াশ্রমের প্রকারভেদ

স্থান, কাল ও প্রজাতিভেদে অভয়াশ্রমের প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন- নদী নিবাসী মাছের জন্য নদীতে, বিল নিবাসী মাছের জন্য বিলে, প্লাবনভূমির মাছের জন্য প্লাবনভূমির উপযুক্ত স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে। অভয়াশ্রম স্থায়ী বা মৌসুমি দুটোই হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ছোট বড় সকল প্রকার মাছই অভয়াশ্রমে এসে আশ্রয় নেয়। এদেরকে যদি কোন প্রকার বিরক্ত না করা হয় তবে পরবর্তী বর্ষা মৌসুম পর্যন্ত অভয়াশ্রমে আশ্রয়গ্রহণকারী মাছ ও অন্যান্য প্রাণীসমূহ একত্রে বসবাস করে। তবে এ ক্ষেত্রে রাক্ষুসে শ্রেণীর মাছসমূহ ছোট মাছ ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অতি সোচ্চারভাবে প্রচারিত হচ্ছে। কার্যকারিতার বিচারে অভয়াশ্রমের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন ও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে হতে পারে। এক কথায় অভয়াশ্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এর বিভিন্ন প্রকরণ হতে পারে। মাছের প্রজাতিভেদে অভয়াশ্রমের স্থান, গভীরতা, মৌসুম, ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- কৈ, শিং, মাগুর, ইত্যাদি মাছের অভয়াশ্রম প্লাবনভূমি বা বিলে, নদীতে নয়। আবার আইড়, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মাছের অভয়াশ্রম নদীতে হতে হবে। যা হোক সার্বিকভাবে এগুলো বিবেচনায় রেখে অভয়াশ্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

১. মৌসুমি অভয়াশ্রম

এ ধরনের অভয়াশ্রম প্রধানত বিল, প্লাবনভূমি ইত্যাদি স্থানে স্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাছ আহরণ বা শিকার বন্ধ থাকে। আবার গাছের ডালপালা, বাঁশ ও অন্যান্য অভয়াশ্রম সামগ্রিকভাবে বছরের কোন নিষিদ্ধ সময়ের জন্য এ ধরনের অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। কৈ, শিং, মাগুর, শোল, টাকি, গজার, ইত্যাদি মাছ যে স্থানে ডিম ছেড়ে বাচ্চা দেয় ঐ সকল স্থানে অস্থায়ী বা মৌসুমি অভয়াশ্রমের মাধ্যমে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মৌসুমি অভয়াশ্রম স্থাপন করা যায়।

চিত্র ১ ঃ বিল নিবাসী মাছের অভয়াশ্রম

২. বাৎসরিক অভয়াশ্রম

সাধারণত নদীতে এ ধরনের অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। তাছাড়া কোন বিশেষায়িত জলাশয়েও এ ধরনের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ধরনের অভয়াশ্রম জলাশয়ে যে অংশে মাছ তার জীবনচক্রের সঙ্কটময় সময় অতিবাহিত করে এমন সক্ষম জায়গায় হওয়া উচিত। কোন জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সারাবছরের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলেও তাকে বাৎসরিক বা বছরব্যাপী অভয়াশ্রম বলা হয়। বৃহত্তর সিলেটের অনেক হাওরের বিলে ২-৩ বছর পর পর মাছ আহরণ করা হয়। এগুলোকে পাইল ফিসারি বলা হয়। তাছাড়া বিল বা নদীর অনেক ভাজ থেকেও ২-৩ বছর পর পর মাছ আহরণ হয়। এ সকল পাইল ফিসারীগুলোকেও আমরা এক প্রকার সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম বলতে পারি।

চিত্র ২ ঃ প্লাবনভূমি নিবাসী মাছের অভয়াশ্রম

৩. স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী অভয়াশ্রম

কোন জলাশয় বা নদী বা বিলের সম্পূর্ণ অংশে বা কোন এলাকায় স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকে তখন তাহাকে স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী অভয়াশ্রম বলে। মৎস্য অধিদপ্তরের সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প, চলন বিল মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, আবাসস্থল পুনরুদ্ধার প্রকল্প, এলজিইডি'র সুনামগঞ্জ সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাচ (MACH) প্রকল্প, ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকগুলো স্থায়ী অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের কিছু বিলে স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মাছ সংরক্ষণের জন্য অভয়াশ্রম

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ছোট বড় সকল প্রকার মাছই অভয়াশ্রমে এসে আশ্রয় নেয়। এদেরকে যদি কোন প্রকার বিরক্ত না করা হয় তবে পরবর্তী বর্ষা মৌসুম পর্যন্ত অভয়াশ্রমে জমায়েতকৃত মাছ ও অন্যান্য প্রাণীসমূহ একত্রে বসবাস করে। তবে এ ক্ষেত্রে রাক্ষুসে শ্রেণীর মাছসমূহ ছোট মাছ ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অতি সোচ্চারভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পাখিদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পাখির অভয়ারণ্য, বন্য প্রাণীদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন্য প্রাণীদের অভয়ারণ্য, মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম, বন সংরক্ষণে সংরক্ষিত বন এলাকা, অন্যান্য উদ্ভিদ সংরক্ষণে বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি নামে জীবের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রায় প্রতিটি দেশেই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রায় ৩০০টির মত অভয়াশ্রম স্থাপিত হয়।

চিত্র ৩ ঃ নদী নিবাসী মাছের অভয়াশ্রম

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম

১. জলজ পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জলজ পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। এতে প্রধানত মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ ১০০% নিশ্চিত না হলেও অধিকাংশই স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকার সুযোগ পায়। বর্তমানে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবক্ষয়ের কারণে জলজ জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে মাছ বসবাসের নিমিত্ত জলাশয়ের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন না করে নিরাপদভাবেই আশ্রয় নিতে পারায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে।

২. প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে মাছের বংশবৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধিকরণ .

অভয়াশ্রমে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রজননক্ষম মাছ প্রজননের সময় তারা উপযুক্ত স্থানে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এ জন্য তারা উন্মুক্ত স্থানে বেড়িয়ে আসে এবং ডিম ছাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এর মাধ্যমে মাছের বংশবৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে মজুদ বৃদ্ধি হয়। কোন কোন মাছ যেমন ঃ আইড়, রিটা, চিতল, ফলি, ইত্যাদি মাছ অভয়াশ্রমের মাঝেই ডিম দেয় এবং বাচ্চা হয়।

৩. সংকটময় সময়ে মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে ভূমিকা

খরা, শত্রুর আক্রমণ এবং অন্যান্য প্রতিকূল পরিবেশে মাছ অভয়াশ্রমে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করে। নদী, বিল, প্লাবনভূমিতে যখন অনবরত বিভিন্ন প্রকার জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ হয় তখন অভয়াশ্রমই একমাত্র স্থান যেখানে মাছ নিরাপদে আশ্রয় নেয়।

৪. বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরণ

দেশের ৫৪টি (IUCN, ২০০৩) মৎস্য প্রজাতি বিলুপ্তপ্রায়। এছাড়াও এলাকা বা অঞ্চলভেদে কোন কোন প্রজাতি হুমকির মধ্যে রয়েছে। একমাত্র অভয়াশ্রমের মাধ্যমেই তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

৫. খাদ্যের উৎস্য হিসেবে অভয়াশ্রম

গবেষণায় দেখা গেছে অভয়াশ্রমের মধ্যে স্থাপিত অভয়াশ্রম সামগ্রিক যেমন ঃ ডাল-পাতা, বাঁশ, ইত্যাদি) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পেরিকাইন জন্ম নেয় এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার বেনথোস (Benthos) যেমনঃ শামুক, ঝিনুক, বিভিন্ন প্রকার এনিলিড, বিভিন্ন প্রকার আর্থপোডের লার্ভা যেমন - ড্রাগন ফ্লাই, লার্ভি ডেমমেল ফাই লার্ভি ইত্যাদি। এছাড়াও জলজ উদ্ভিদযুক্ত অভয়াশ্রমে প্রচুর গুল্ম জন্ম নেয়। এগুলো সবই মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে অভয়াশ্রমে মাছের প্রচুর্যতার কম বেশীর কারণে এগুলোর প্রাচুর্যতাও কম বেশী হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে ছোট ছোট মাছগুলো প্রাণিভোজী মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চিংড়ি, বোয়াল, আইড়, গজার, শোল, ইত্যাদি মাছ ভাল মানের খাদ্য হিসেবে এদের গ্রহণ করে থাকে।

৬. জলাশয় সমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

শুধু মাছ নয়, মাছ ছাড়াও বেনথোস, পেরিফাইটোন, প্রাণিকণা, এনিলিড, কাঁকড়া বিভিন্ন প্রকার জলজ আর্থপোড, জলজ উদ্ভিদ, ইত্যাদি জীবের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অভয়াশ্রমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফড়িং জাতীয় কিছু আর্থপোড যেমন ড্রাগনফ্লাই, ডেলসেল ফ্লাই, কেডিস ফ্লাই, ইত্যাদির লার্ভা অভয়শ্রমের মত স্থানেই প্রথমে অভয়াশ্রমের মধ্যে জীবনচক্র শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তারা পানি থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসে উড়ে চলে যায়।

৭. নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্যের নিরাপত্তা বিধানে অভয়াশ্রম

অভয়াশ্রমে আশ্রিত মাছ প্রজনন মৌসুমে অভয়াশ্রমের ভিতরে, পার্শ্ববর্তী স্থানে ও প্লাবনভূমিতে প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে এবং এগুলো বড় হয়ে এক বিরাট সম্পদে পরিণত হয়। এতে মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন বাড়ে, যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে সহায়তা করে। নদী ও বিলে গবেষণায় দেখা গেছে অভয়াশ্রমযুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন অভয়াশ্রমবিহীন জলাশয়ের চেয়ে হাজারোগুণও বেশি হতে পারে এবং জীববৈচিত্র্য অভয়াশ্রমযুক্ত জলাশয়ে অনেক বেশি।

অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা

কোন জলাশয়কে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা বা জলাশয়ের কোন অংশে অভয়াশ্রম স্থাপন করা যত সহজ তার চেয়েও বেশি কঠিন হলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর ব্যবস্থাপনা। কিন্তু অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জন করতে হলে এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। এ লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে। যথা ঃ

১. ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হল সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা। এ জন্য প্রথমেই কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি ৯-৩১ সদস্য বিশিষ্ট বা জলমহালের আকার ও সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কমিটির পরিধি ছোট বড় হতে পারে। এ কমিটিকে (নদীর নাব্যতা ব্যবস্থাপনা কমিটি (River Management Committee), বিলের ক্ষেত্রে বিলের নাম বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি (Beel Management Committee) বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি (Sanctuary Management Committee - SMC) গঠন করা যেতে পারে। মৎস্য অধিদপ্তরের সমাপ্ত সিবিএফএম প্রকল্পের জলমহাল ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য এ ধরনের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পে মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (Fisheries Magagement Committee - FMC) নামে উক্ত কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের সুনামগঞ্জ সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে উক্ত কমিটিকে Resource Management Committee (RMC) বলা হয়। যে সকল স্থানে একাধিক জলাশয় বা অভয়াশ্রম রয়েছে সে সকল স্থানে যেহেতু একধিক কমিটি থাকবে তাই এক্ষেত্রে একটি কমিটি শীর্ষ কমিটি (Apex Committee) থাকতে পারে। উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য উপজেলা সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা কমিটি বা সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ সকল কমিটিতে মৎস্যজীবী ছাড়াও প্রশাসন, এনজিও প্রতিনিধি, মৎস্য বিভাগীয় প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি. শিক্ষক, ইমাম, ব্যবসায়ী বা অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

অভয়াশ্রম ও কাঠা ব্যবস্থাপনা

অভয়াশ্রমের মূল একক হলো কাঠা বা বাঁশ, গাছের ডালপালা বা অভয়াশ্রম সামগ্রী। ব্যবস্থাপনা বলতে অভয়াশ্রমে স্থাপিত অভয়াশ্রম সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনাকেই বুঝায়। অভয়াশ্রমের কাঠা ব্যবস্থাপনার নিম্নে বর্ণিত কাজগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। যথাঃ

১. কাঠা প্রতিস্থাপন

প্রতি বছরই স্রোতের কারণে বা ঝড় বাদল ও ঢেউ এর কারণে কিছু কাঠা বিনষ্ট হবে বা অন্য স্থানে সরে যেতে পারে। পলি জমার কারণেও অনেক কাঠা মাটি চাপা পড়ে যেতে পারে। তাই কাঠার ক্ষতিগ্রস্ততার উপর নির্ভর করে বিল বা নদীর অভয়াশ্রমে স্থাপিত কাঠার নতুনভাবে কিছু ডালপালা ও বাঁশ প্রতিস্থাপন করতে হবে। অন্যদিকে কিছু অভয়াশ্রম সামগ্রী বা কাঠা নতুনভাবে স্থাপনও করতে হতে পারে।

২. কাঠায় প্রদত্ত পিপিডি ও অন্যান্য সামগ্রীর যত্ন

অনেক সময় অভয়াশ্রমের কাঠার মধ্যে টেট্রাপড বা হেক্সাপড স্থাপন করা হয়। এগুলো মাটিচাপা পড়ে গেলে পুনরায় তা উঠিয়ে এনে অভয়াশ্রম এলাকার সমতল স্থানে স্থাপন করতে হবে।এছাড়া পিপিডি (Predator Prevention Devices) হিসেবে বাঁশের চোঙা, আরসিসি পিলার, প্লাস্টিক পাইপের টুকরা, কলস, বাক্স, ইত্যাদিকে আল কাঁকড়া বাগাঠের রস দ্বারা টেকসই করা যেতে পারে।

৩. জলাশয়ে মাছের পোনা মজুদকরণ

অনেক সুফলভোগীরা জলাশয়ে বিভিন্ন দেশি বিদেশি মাছের পোনা মজুদকরণের পক্ষপাতি। সাধারণত দেশি পোনার সাথে কার্পিও মাছের পোনা বেশি পরিমাণ মজুদ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে কাপিও যেহেতু বেনথোস ও তলদেশী খাবার পছন্দ করে তাই বেশী কার্পিও মজুদে অন্যান্য তলদেশভোজী ও বেনথোসভোজী মাছের মধ্যে খাদ্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোন অবস্থাতেই আফ্রিকান মাগুর, পিরানহা, তেলাপিয়া, ইত্যাদি মাছ অভয়াশ্রম জলাশয়ে মজুদ না করা হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৪. পানি দুষণ থেকে অভয়াশ্রমকে রক্ষা করা

শিল্পের বর্জ্য বা ধানক্ষেতে ছিটানো কীটনাশক বা পেস্টিসাইড দ্বারা পানি দূষিত হলে সে পানি অভয়াশ্রমের মাছের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। এর ফলে সরাসরি মাছের মরক, প্রজাতির বিলোপ, নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছের হ্রাস, খাদ্য শিকল বিনষ্ট হওয়া, মাছের খাবার বিনষ্ট হওয়া, মাছের ডিম ধ্বংস হওয়া, মাছের প্রজনন ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং মাছের রেণু, ধানী বা জুভেনাইল মারা যেতে পারে।

৫. অভয়াশ্রম এলাকায় কারেন্ট জাল ও ফিস ট্রেপ দিয়ে বেআইনিভাবে মাছ আহরণ

অনেক সময় দিন বা রাতে জোরপূর্বক বা চুরি করে কারেন্ট জাল বা অন্যান্য মাছ ধরার ট্রেপ বা ফাঁদ পানিতে স্থাপন করে কিছু অসাধু ব্যক্তিরা মাছ আহরণ করতে চেষ্টা করে। তাই পাহারার মাধ্যমে এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এগুলো দমন করতে হবে।

৬. অভয়াশ্রমে আঘাত করে মাছ বেড় করে দিয়ে মাছ আহরণ

কিছু অসাধু ব্যক্তি অভয়াশ্রমের মধ্যে স্থাপিত বাঁশ বা ডালপালায় বাইরে থেকে আঘাত বা ডালপালাকে নড়াচড়ার করে মাছকে অভয়াশ্রম হতে বের করে দেয়। অতঃপর অভয়াশ্রমের বাইরে মাছ চলে আসলে সেখান থেকে জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করতে চেষ্টা করে। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ সজাগ থাকতে হবে।

৭. বড়শি দিয়ে মাছ আহরণ

অনেক অসাধু ব্যক্তি অনেক সময় লাড় বড়শি বা লম্বা সুতা যুক্ত বড়শি দিয়ে বোয়াল, আইড়, বাইম, শোল, গজার, চিতল ইত্যাদি সহ বৃহদাকৃতির মাছ আহরণ করতে চেষ্টা করে বিশেষ করে রাতের বেলায়। তাই এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

৮. মাছ রোগাক্রান্ত হওয়া

বিশেষ করে শীতকালে মাছে ক্ষতরোগ দেখা দেয়। তাই আগে থেকেই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৯. জৈবিক সংরক্ষণ

কাটাযুক্ত উদ্ভিদ যেমন শিংরা অভয়াশ্রমে স্থাপন করা হলে এবং কাটাযুক্ত ডালপালা যেমন মান্দার গাছ, খেজুর গাছের পাতা, বরই গাছের ডাল, ইত্যাদি কাঠায় আংশিক ব্যবহার করা হলে এমনিতেই চোরের অত্যাচার কিছুটা কম হয়। গভীর পানিতে হিজল ও কড়ই কম পানিতে রোপণ ও পিটালির চারা রোপণ করা হলে মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে। এ গাছগুলোর মূল এবং ডালপালায় অনেক মাছ ডিম দিয়ে থাকে।

উপসংহার

মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বাড়াতে হলে নদী নিবাসী মাছের জন্য নদীতে এবং বিল নিবাসী মাছের জন্য বিলে অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে এবং সকল প্রকার জলাশয়সমূহকে উৎপাদনমুখী ও জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে অতি দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। মৎস্য অভয়াশ্রম আইন, ২০০৯ (সংশোধিত খসড়া) বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে যেটি পাশ হওয়ার পর নতুন করে অভয়াশ্রম স্থাপিত হবে এবং পুরাতন অভয়াশ্রমসমূহ সংরক্ষিত থাকবে। এতে মাছের উৎপাদন বাড়বে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। সর্বোপরি খাদ্যের নিরাপত্তা বিধানে অভয়াশ্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

প্লাবনভূমিতে মাছচাষ ঃ উন্নয়নের নতুন দিগন্ত

ফরিদা বেগম[১]
মোঃ মিজানুর রহমান[২]

বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিদ্যমান সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। নানাবিধ কারণে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার অদ্যাবধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এমনি একটি সম্ভাবনাময় সম্পদ আমাদের বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি, যার অনেকাংশই সম্পূর্ণ অব্যবহৃত রয়ে গেছে। বর্ষাকালে দেশের প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি ৪-৬ মাস অব্যবহৃত অবস্থায় পানিতে নিমজ্জিত থাকে। সামান্য কিছু অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বর্ষার পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসব প্লাবনভূমিতে মাছচাষ করা সম্ভব। এতে করে ভূমির যেমন সদ্ব্যবহার হবে তেমনি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষকের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হবে। যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে বদ্ধ জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে বিশাল আয়তনের উন্মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ, কৃষি ফসল উৎপাদনে নির্বিচারে কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্প দূষণ, নদী-নালার নাব্যতা হ্রাস, খাল-বিল ভরাট হওয়া, মাছের প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়া, মাছের চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে প্লাবনভূমিসমূহের মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মাছের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিসমূহকে উৎপাদনমুখী করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

প্লাবনভূমিতে মাছচাষের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ মিঠাপানির উন্মুক্ত জলাশয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই প্লাবনভূমি যার আয়তন প্রায় ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর। এই প্লাবনভূমিসমূহকে চাষ প্রযুক্তির আওতায় আনা সম্ভব হলে এখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। বিল-ঝিল এবং নদীর পাশের নিচু এলাকায় বছরে সাধারণত ধানের একটি ফসল হয়। বোরো মৌসুমে ধান কাটার পরে এসব ধানের জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এসব জমিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষার পানি আসতে শুরু করে এবং কার্তিক মাস পর্যন্ত পানি থাকে। এসব অব্যবহৃত ধানের জমিতে বছরে ৪-৬ মাস ৩-৬ ফুট পর্যন্ত পানি থাকে, যা মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। সামান্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অনেক প্লাবনভূমিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব। বর্ষাপ্লাবিত এসব মৌসুমি জলাশয়ে মাছচাষ করে মানুষ তাঁদের জীবিকা নির্বাহসহ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। বর্তমানে প্রাকৃতিকভাবে প্লাবনভূমিতে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৫০ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়। অপরদিকে যদি এই প্লাবনভূমিসমূহকে মাছচাষের আওতায় আনা যায় তবে হেক্টরপ্রতি গড়ে ২০০০ কেজির অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব।

চিত্র ঃ সম্ভাবনাময় প্লাবনভূমি

প্লাবনভূমিতে মাছচাষ

প্লাবনভূমিতে নানাভাবে মাছ চাষ করা সম্ভব। যেমন সমাজভিত্তিক মাছ চাষ (বাঁধ দিয়ে), খাঁচায় মাছ চাষ, পেনে মাছ চাষ, ইত্যাদি। বড় আয়তনের প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয়। কারণ এসব প্লাবনভূমিতে অনেক লোকের জমি থাকে। তাই এখানে একক কোন কার্যক্রম বেশি ফলপ্রসূ হবে না, এখানে প্রয়োজন সম্মিলিত সামাজিক উদ্যোগ। অর্থাৎ প্লাবনভূমিগুলোকে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের আওতায় আনতে হবে। সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সমাজভিত্তিক সংগঠন। যেখানে সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। আনন্দের বিষয় ইতোমধ্যে দেশের বেশ কিছু এলাকায় প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি মডেল উল্লেখযোগ্য।

১ প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, কুমিল্লা জেলার প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ অবকাঠামো নির্মাণ (দাউদকান্দি মডেল) প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
২ মূল্যায়ন কর্মকর্তা, কুমিল্লা জেলার প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ অবকাঠামো নির্মাণ (দাউদকান্দি মডেল) প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় কিছু সংখ্যক স্থানীয় উদ্যোক্তা কতিপয় এনজিও-এর সহায়তায় বর্ষাপ্লাবিত প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করে। মৎস্য অধিদপ্তর এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। ব্যাপক সফলতার জন্য এটি ইতোমধ্যেই দাউদকান্দি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। দাউদকান্দি মডেলের এই কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত করার মাধ্যমে ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিগত ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে 'কুমিল্লা জেলার প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ অবকাঠামো নির্মাণ (দাউদকান্দি মডেল) প্রকল্প' নামক ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, মেঘনা, হোমনা, তিতাস ও মুরাদনগর উপজেলার ৬৩টি প্লাবনভূমিকে পরিবেশসম্মতভাবে মাছ চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে ১২৩ কিমি বাঁধ, ৫৮ কিমি খাল খনন ও ৭৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার ৯৯০০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯৬০ জন সুফলভোগীর অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পভুক্ত প্লাবনভূমির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১.৮ মে.টন/হে. ছাড়িয়ে ২০০৯-১০ উৎপাদন বর্ষে হেক্টরপ্রতি গড়ে প্রায় ২.০০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে।

দাউদকান্দি মডেলের সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম দ্রুত দেশের অন্যান্য এলাকা যেমন- মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা ও সিলেট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে প্লাবনভূমিতে মাছচাষ একটি সফল কার্যক্রম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

দাউদকান্দি মডেলে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম শুরুর প্রথম পর্যায়েই সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই, উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলা, সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সম্মত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি সাধারণ জনগণের মাঝে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হয়। সমাজের মধ্যে যাতে বৈষম্যের সৃষ্টি না হয় সে জন্য সমাজভুক্ত সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে শেয়ার প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের মালিকানায় সম্পৃক্ত করা হয়। সকলের সম্মতিতে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয় এবং শেয়ার বিতরণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। এরপর এলাকার বিদ্যমান সড়ক, মহাসড়ক, বাড়ি ও গ্রামগুলোর মাঝে সংযোগ বাঁধ এবং প্রাকৃতিক মাছের রেণু, পোনা ও বর্ষার পানি প্রকল্প এলাকায় প্রবেশে যাতে কোন সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় স্লুইসগেইট ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। পরিচালনা পর্ষদ বিভিন্ন উপ-কমিটির মাধ্যমে মাছ চাষের বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন- মাছের পোনা ক্রয় ও মজুদ করা, সার ও খাদ্য ক্রয় এবং প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা, চাষকালীন পরিচর্যা, মাছ ধরা, বিক্রয়, ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে থাকে। বিভিন্ন উপ-কমিটি মাসিক/ত্রৈমাসিক সভায় মূল কমিটির কাছে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করে ও অনুমোদন গ্রহণ করে। মাছ বিক্রয় শেষে উক্ত কমিটি একটি বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করে। সভায় কমিটি বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন ও অনুমোদন করে, লভ্যাংশ ঘোষণা ও বণ্টন করে এবং বিগত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও অনুমোদন গ্রহণ করে।

প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সুফল

স্থানীয় সম্পদ ও পুঁজির সমন্বয়ে অব্যবহৃত বর্ষাপ্লাবিত জমিকে কাজে লাগিয়ে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ একটি বিশাল লাভজনক আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড। যা মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। দাউদকান্দি মডেলের নিম্নোক্ত দৃশ্যমান সুফলগুলোই তা স্পষ্ট করে।

ক. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি

মাছ চাষ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্লাবনভূমি থেকে প্রাকৃতিকভাবে হেক্টর প্রতি মাত্র ১৫০ কেজি গড় উৎপাদন পাওয়া যেত। সেখানে চাষ কার্যক্রম শুরুর ফলে বর্তমানে হেক্টর প্রতি প্রায় ২.০০ মে.টন গড় উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। স্পষ্টতই এটি মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি নিরব বিপ্লব।

চিত্র ঃ প্লাবনভূমিতে উৎপাদিত মাছ আহরণ

খ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প ঘিরে শুরু হয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা, যেমন- মাছের পোনা উৎপাদন, মাছের খাদ্য বিক্রয়, বরফ বিক্রয়, মাছ বিক্রয়, মাছ ধরা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, ইত্যাদি। জাল বুনন, মাছ পরিবহনের জন্য খাঁচা তৈরি, শুটকি তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রমে

নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি প্রকল্পে ১০-১৫ জন স্থায়ী কর্মচারির ও প্রতিদিন কিছু সংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিকের কাজের সংস্থান হয়েছে। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা প্রকল্পে মাছের পোনা মজুদ, পরিচর্যা ও মাছ আহরণের কাজ করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় করছে। এসব মিলে এ প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত সকল জমির মালিক একটি নির্দিষ্ট হারে পত্তনি পাচ্ছে। উপরোক্ত প্রত্যেক শেয়ার গ্রহীতা প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য মুনাফা পাচ্ছে। ফলে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গত কারণে শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিক উন্নতি হওয়ায় বেকার ও সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসনের পথ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। দেখা যায়, এখানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং তৃণমূল কৃষকরা একসাথে বসে আলোচনা করেন এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করেন। প্রকল্প এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিশাল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে।

চিত্র ৩ঃ নারীর বিকল্প কর্মসংস্থান

গ. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির যোগান

একটি বড় সাফল্য হলো, প্লাবনভূমি প্রকল্পগুলো মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তার পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় বর্ধিত মাছ উৎপাদন একদিকে যেমন এলাকার জনগণের মাছ বা আমিষের চাহিদা পূরণ করছে, তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে তাদের ক্রয় এবং ধারণ ক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করছে। শুধু মাছ চাষ নয়, জমির আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অন্যভাবে জনগণের ক্রয় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলছে। জনগণের মধ্যে সুষম খাদ্যের নিশ্চয়তা সৃষ্টি হচ্ছে। আরো অনেকভাবে, যেমন- প্রকল্পের উৎপাদিত মলা, ঢেলা, গুড়ামাছ এবং জমিতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী এলাকার জনগণ এলাকা থেকেই তাজা অবস্থায় স্বল্পমূল্যে কিনতে পারছে। সব মিলিয়ে এই উন্নয়নযাত্রা এলাকাকে স্বনির্ভর করে তুলছে খাদ্যের নিরাপত্তায়।

ঘ. নারীর ক্ষমতায়ন

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ প্রকল্পগুলোতে উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

ঙ. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি

মাছ চাষে ব্যবহৃত মাছের খাদ্য, সার ও মাছের বিষ্ঠা জমিতে মিশে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে কৃষক তার ধানের উৎপাদন প্রায় ২০% বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস, আগাছা না থাকা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা চাষে/স্বল্পচাষে ধান রোপণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

চ. পরিবেশ উন্নয়ন

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কৃষি ফসল উৎপাদনে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া মাছ - কৃষি ফসল-মাছ চাক্রিক কার্যক্রমের ফলে রোগজীবাণুর বিস্তার হ্রাস পেয়েছে। মাছ চাষ প্রকল্পে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রাকৃতিক মাছ অবাধে বংশবিস্তার করার সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক মাছের রেণু ও পোনার অবাধ বিচরণ নিশ্চিত হয়েছে।

ছ. প্রাকৃতিক ও বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ

প্রকল্পগুলোতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক মাছের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি (চিতল, ফলি, আইড়, পাবদা, মাগুর, শিং, মেনি) বিনিময়, সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক প্রজননের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার ফলে এদের প্রাপ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। তন্মধ্যে প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর, যার মাত্র ১.০০ লক্ষ হেক্টরও এই পদ্ধতিতে আমরা যদি মাছ চাষের আওতায় আনতে পারি তাহলে বছরে ২.০০ লক্ষ মে.টন মাছ বেশি উৎপাদন করা সম্ভব। এতে করে দেশের মানুষের মাছের ঘাটতি দূর হবে এবং পাশাপাশি লক্ষাধিক লোকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থায়ী/খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যা দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে বিশাল অবদান রাখবে। তাছাড়া আমাদের বদ্ধজলাশয়ের উৎপাদন প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে, এ অবস্থায় বর্ধিত জনসংখ্যার মাছের চাহিদা পূরণে উন্মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুকুরে শিং মাছের চাষ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম[১]
সৈয়দ আরিফ আজাদ[২]

খাল-বিল-নদী-নালার দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমাদের দেশে ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির প্রায় ২৬৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। কালের বিবর্তনে এসব প্রজাতির বেশ কিছু মাছ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেক মাছ হয়ে যাচ্ছে দুষ্প্রাপ্য। এদের মধ্যে শিং মাছ অন্যতম। শিং মাছ চাষে মুনাফার পরিমাণ ১০০ থেকে ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত।

শিং মাছের পোনা মাত্র ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা যায়। একজন চাষি অল্প জায়গায় অধিক ঘনত্বে এবং খুব অল্প দিনে মাছ চাষ করতে পারে বিধায় এখন প্রায় সব চাষিই কম-বেশি শিং মাছ চাষে আগ্রহী হয়েছেন। শিং মাছ চাষ করলে গর্তে মাছ ঢুকে পড়ে ও পাড় বেয়ে বাইরে চলে যায়- এক সময় এমন শঙ্কা ছিল চাষিদের মধ্যে। ক্রমান্বয়ে এ শঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। তবে শিং মাছের পোনা উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কঠিন। তাছাড়া শিং মাছ চাষের জন্য রেণু উৎপাদন থেকে চাষ এবং বাজারজাত করা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

শিং মাছ চাষের সুবিধা

- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়;
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা হয় এবং বিক্রয় মূল্য তুলনামূলক অনেক বেশি;
- অগভীর জলাশয়ে চাষ করা যায়;
- সুস্বাদু এবং সকল বয়সী মানুষের পছন্দের খাবার;
- তুলনামূলকভাবে বেশি সহনশীল এবং বিরূপ পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে।

মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নে শিং মাছ চাষের বিভিন্ন ধাপ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

পুকুর সংস্কার ও প্রস্তুতি

পুকুর প্রস্তুতিকালীন সময়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

- পুকুর পাড় ও ঢাল মেরামত;
- পুকুর শুকানো এবং তলার অতিরিক্ত পচা কাদা অপসারণ
- তলদেশ সমানকরণ;
- চুন প্রয়োগ ঃ শতাংশে ০.৫ - ১ কেজি চুন সারা পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঝোপ জঙ্গল পরিপূর্ণ জায়গায় বা পুকুরের উপরে ডালপালা বিস্তার করা আছে এরূপ ছায়াযুক্ত পুকুরে চাষ না করা শ্রেয়। প্রাথমিক সংস্কার কাজ ও প্রস্তুতির পর চুন প্রয়োগ করে ৫-৭ দিন পর পুকুরে পানি প্রবেশ করাতে হবে। শিং মাছের চাষে পুকুরে কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যাবে না। যেহেতু সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম খাবারের উপর নির্ভর করে চাষ করা হয় সেজন্য জৈব সার প্রয়োগ করাও অনাবশ্যক। এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন পানি পুকুরে প্রবেশ করাতে হবে এবং পানির গভীরতা ২-২.৫ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

পোনা মজুদ

পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর পর প্রতি শতাংশে ১০০০-১২০০ শিং মাছের পোনা মজুদ করা যায়। তবে নতুন শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে আরো কম ঘনত্বে মজুদ করা উচিত। পোনার আকার হবে ১.৫-২ ইঞ্চি। কখনও ১.৫ ইঞ্চির কম আকারের পোনা মজুদ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে পোনার বাড়তি মৃত্যু ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, ১.৫-২ ইঞ্চি আকারের পোনা সঠিকভাবে ধরা এবং পরিবহন করা হলে ৯০% পর্যন্ত বেঁচে থাকে। পোনা ছাড়ার আদর্শ সময় হচ্ছে ঠাণ্ডা আবহাওয়া (সকাল বা বিকাল)। দুপুরের রোদ বা মেঘলা দিনে পোনা মজুদ করা যাবে না। পোনা মজুদের পূর্বে পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট পানিতে মিশিয়ে (১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ) পোনাকে গোসল করিয়ে তারপর পুকুরে ছাড়তে হবে।

পোনা ধরা ও পরিবহনের সর্তকতা

শিং মাছ চাষে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পোনা ধরা ও পরিবহনের সময় যথাযথভাবে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অন্যথায় পরিবহনকালে এবং পোনা মজুদের পর মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া অসর্তকতার কারণে স্পর্শকাতর ও নরম চামড়ার এই মাছের শরীরে সামান্যতম ক্ষত হলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তা থেকে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের সম্ভাবনা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে মজুদের পর পুকুরে ব্যাপক হারে রোগবালাই দেখা দিতে পারে। সে জন্য নার্সারি পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় যতদূর সম্ভব কম চাপে পোনা ধরতে হবে। বড় জাল থেকে পোনা সংগ্রহের জন্য স্টিলের গামলা ছিদ্র করে তা মসৃণ করতে হবে এবং এরূপ গামলা দিয়ে জাল হতে অল্প অল্প পোনা পাতিলে সংগ্রহ করে শাওয়ারের জন্য ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে। সেখানে ৫-৬ ঘণ্টা শাওয়ারে রাখার পর নাইলনের হাপা দিয়ে অল্প অল্প করে সর্তকতার সাথে পোনা ধরতে হবে।

১ পরিচালক, রূপালী হ্যাচারি এন্ড ফিসারিজ, ময়মনসিংহ
২ উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সর্তকতাঃ একজন মৎস্যচাষি হ্যাচারি হতে যখন পোনা সংগ্রহ করবেন তখন খেয়াল রাখবেন যে ট্যাঙ্কে পোনা খাড়া হয়ে ভাসছে কি-না। যদি খাড়া হয়ে শিং এর পোনা ভাসতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই পোনা দুর্বল বা রোগাক্রান্ত। সেক্ষেত্রে এরূপ হ্যাচারি হতে পোনা সংগ্রহ না করাই সমীচীন। এছাড়া পোনার মুখে বা কাঁটায় সাদা দাগ কিংবা শরীরে আঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে এরূপ পোনা সংগ্রহ কিংবা মজুদ করা যাবে না।

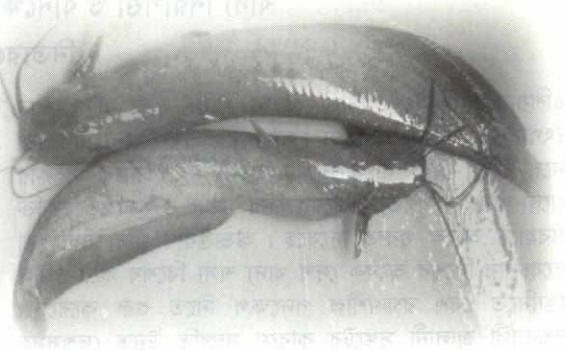

মজুদের পর খাদ্য প্রয়োগ

পোনা মজুদের পর হতে নিয়মিতভাবে কৃত্রিম খাবার সরবরাহ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত টেবিলে তা উল্লেখ করা হলো-

পোনার বয়স	খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা	মন্তব্য	খাবারের প্রকার
১ম-১০ম দিন	শরীরের ওজনের ১০০%-৮০%	১- ১০ দিন ১০০% হতে কমিয়ে ৮০% পর্যন্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	নার্সারি
১১ - ২০ দিন	শরীরের ওজনের ৮০%-৬০% পর্যন্ত	১১- ২০ দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৮০% হতে কমিয়ে ৬০% পর্যন্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	নার্সারি ক্রাম্বল
২১-৩০ দিন	শরীরের ওজনের ৬০%-৪০% পর্যন্ত	২১- ৩০ দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৬০% হতে কমিয়ে ৪০% পর্যন্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	ঐ
৩১-৪০ দিন	শরীরের ওজনের ৪০%-৩০% পর্যন্ত	৩১- ৪০ দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৪০% হতে কমিয়ে ৩০% পর্যন্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	ঐ
৪১-৫০ দিন	শরীরের ওজনের ৩০%-২০% পর্যন্ত	৪১- ৫০ দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৩০% হতে কমিয়ে ২০% পর্যন্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	ঐ
৫১-৬০ দিন	শরীরের ওজনের ২০%-১০% পর্যন্ত	৫১- ৬০ দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ২০% হতে কমিয়ে ১০% পর্যন্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	ঐ
৬১- ১০০ দিন	শরীরের ওজনের ১০%-৪% পর্যন্ত	৬১- ১০০ দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ১০% হতে কমিয়ে ৪% পর্যন্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।	স্টার্টার-১

বিশেষ পরামর্শঃ সপ্তাহে ১ দিন খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। এই সময়ে পুকুরের আগাছা পরিস্কার ও অন্যান্য পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, পুকুরের আয়তন অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক কলমিলতা বা হেলঞ্চা বেস্টনী দিয়ে রাখা যেতে পারে। এর ফলে শিং মাছের শরীরের রং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সুন্দর থাকবে।

নিম্নে ৩৩ শতাংশের একটি পুকুরের আয় ব্যয়ের হিসেব উল্লেখ করা হলোঃ

কার্যক্রম	ব্যয় (টাকা)
পুকুরের লীজ বাবদ (৬ মাস)	৫০০০.০০
পোনা ৪০,০০০টি@ ১.৫০/-	৬০০০০.০০
খাদ্য ২,৫০০ কেজি @ ৩০/-	৭৫০০০.০০
দেশি মাছ ৩০০ টি @ ৩/-	৯০০.০০
ঔষধ, চুন, লবণ ইত্যাদি	৩০০০.০০
পানি ও বিদ্যুৎ বিল	৫০০০.০০
কর্মচারী/ শ্রমিকের বেতন	৬০০০.০০
মাছ বিক্রি ও পোনা পরিবহনে শ্রম মজুরি	১০০০০.০০
মোট ব্যয় =	১,৬৪,৯০০.০০
মোট আয় ঃ ৭৫% জীবিত মাছ হিসেবে বিক্রয়যোগ্য মাছ (১ কেজি = ২৫টি) মোট ৩০,০০০টি অর্থাৎ ১,২০০ কেজি @ ৩৫০/- কেজি	৪,২০,০০০.০০
নীট লাভ =	২,৫৫,১০০.০০

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

- শিং মাছকে উচ্চ প্রোটিন যুক্ত (৩৫% প্রোটিন) সুষম খাবার খাওয়াতে হবে;
- শিং মাছের পুকুরে কোনরূপ সার প্রয়োগ করা অনাবশ্যক
- প্রতি ২০ দিন পর পর শিং মাছের পুকুরে প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম লবণ এবং ১০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে;
- নিয়মিতভাবে পানির পিএইচ পরীক্ষা করতে হবে। পিএইচ যেন একই রেঞ্জে (৭-৭.৫) থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। পিএইচ কমে বা বেড়ে গেলে মাছ রোগা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে;
- বর্ষায় যাতে মাছ বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য প্রয়োজন বোধে পাড় উঁচু বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাল বেস্টনী করা যেতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও ধানক্ষেতে সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি

নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

এশিয়ার অধিকাংশ দেশে প্রধান খাদ্য ভাত এবং ধান উৎপাদনেও এশিয়া অগ্রগণ্য। সারা বিশ্ব এখন খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য নতুন ও সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা বিবেচনায় বিশ্বের অনেক দেশ খাদ্য শস্য বিশেষ করে চাউল রপ্তানিতে বেশ রক্ষণশীল পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানী সঙ্কটের কারণে সম্প্রতি উন্নত দেশসমূহ খাদ্য শস্য থেকে জৈব জ্বালানী (Bio-fuel) উৎপাদন করার ফলে অনুন্নত ও জন বহুল এবং ভাতের উপর অধিকতর নির্ভরশীল দেশে খাদ্য নিরাপত্তায় সঙ্কটের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে বার্ষিক খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমবেশি ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৭-০৮ বছরে বোরো ধান, গম, আলু ও ভুট্টা আশাব্যঞ্জক ফলন হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অসহনশীল পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং আমদানি নির্ভরতার কারণে খাদ্য পণ্যের মূল্যের উর্ধ্বগামীতা খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। বহির্বিশ্ব থেকে আমদানীকৃত খাদ্যের মূল্য অভ্যন্তরীণ বাজারে সহনশীল পর্যায় রাখতে সরকারকে বাজেটে বিশালাকারের ভর্তুকির বোঝা বহন করতে হয়। দেশের বর্তমান কৃষিবান্ধব গণতান্ত্রিক সরকার কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস, বিতরণ ব্যবস্থা সহজিকরণ ও সেচের জ্বালানী বাবদ নগদ ভর্তুকি প্রদান করায় শস্য জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। এই অবস্থা স্থায়িত্বশীল করার জন্য দেশের সীমিত মাটি ও পানির বহুমাত্রিক ও সমন্বিত ব্যবহারের অনুশীলন এখনই শুরু করা দরকার।

খাদ্য নিরাপত্তায় ভাতের গুরুত্ব

বিশ্বের প্রায় ৩.০ বিলিয়ন লোকের প্রধান খাদ্য ভাত (Frei & Becker, 2005)। সাম্প্রতিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, বাংলাদেশে জনপ্রতি চাউল ভোগের পরিমাণ ১৮৪ কেজি- যা পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় বেশি। এ বছর বোরো মৌসুমে দেশে ধানের আশাব্যঞ্জক ফলন হওয়ায় চালের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে আছে। কিন্তু কোন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদন ব্যাহত হলে আমদানি নির্ভরতা বেড়ে যায়। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ছাড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী ৩-৪ দশক পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৩০ কোটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং বাংলাদেশের আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ হবে। রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে আগামী ৪ দশক পরে বর্তমানের দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনা খুবই জরুরি। উন্নত ও স্থায়িত্বশীল প্রযুক্তি এবং সীমিত সম্পদের বহুমাত্রিক ও সমন্বিত ব্যবহার সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে। ধানক্ষেতে মাছ ও সবজির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি এরূপ একটি সহায়ক প্রযুক্তি।

ধানক্ষেতে মাছ ও সবজি সমন্বিত চাষ

বাংলাদেশের ৯.০৮ মিলিয়ন হেক্টর ধানী জমির (বিবিএস, ২০০৬) মধ্যে ২.৮৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ধান ও মাছ সমন্বিতভাবে চাষ করা সম্ভব (দেওয়ান, ১৯৯২)। আবহমানকাল ধরে ধানক্ষেত থেকে আমরা মাছ আহরণ করি। আশির দশক পর্যন্ত ধানক্ষেত দেশীয় প্রজাতির মাছের বিশাল ভাণ্ডার ছিল। নিম্ন অঞ্চলের ধানক্ষেতে ১০৪ প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণীর সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে (FAO, 2004)। সম্প্রতি এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হলেও পরিকল্পিতভাবে ধানক্ষেতে মাছ ও চিংড়ি চাষের সুফলের কারণে আহরণের পরিবর্তে চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ধানক্ষেতের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে দেশে ধানক্ষেতে মাছ চাষের জনপ্রিয় পদ্ধতিগুলো হচ্ছে- (১) ধানের সাথে মাছ চাষ (Concurrent method) ও (২) ধানের পরে মাছ চাষ পদ্ধতি (Alternative method)। প্রথমোক্ত পদ্ধতি সাধারণত বন্যামুক্ত, অপেক্ষাকৃত নিচু ভূমি ও পর্যাপ্ত সেচ সুবিধাযুক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। বর্ষাকালে প্লাবিত হয়ে যায় এরূপ এলাকায় আবদ্ধ পানিতে দ্বিতীয় পদ্ধতির ধানক্ষেতে মাছ চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় উল্লিখিত দুই পদ্ধতিতে চিংড়ি ও সাদা মাছের সাথে ধান এবং আইলে সবজি চাষ হচ্ছে। আলোচ্য নিবন্ধে প্রথমোক্ত পদ্ধতির জন্য উপযোগী ধানী জমিতে দুই পদ্ধতির প্রয়োগসহ জমির আইল ব্যবহারের সমন্বিত পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হলো।

জমির ধরন ও উপযুক্ততা

কুমিল্লা, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, রংপুর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, যশোরসহ অন্যান্য জেলার পলি ও এঁটেল মাটি সমৃদ্ধ অথচ বন্যামুক্ত অংশের জমিতে এমনকি বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় এই পদ্ধতিতে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করা সম্ভব। এরূপ সমন্বিত পদ্ধতির জন্য ধানক্ষেতের মাটি ও ভৌত বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. বন্যামুক্ত স্থানে জমির অবস্থান হতে হবে এবং অধিক পানি ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট এঁটেল বা এঁটেল দোআঁশ মাটি হওয়াই উত্তম।
২. জমির আইল ৩ ফুট উঁচু ও আইলের উপরিভাগ কমপক্ষে ২ ফুট চওড়া করতে হবে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা

৩. জমির অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত নিচু অংশে ৩ ফুট গভীর গর্ত করতে হবে। জমির ১০% অংশে এই গর্ত বিস্তৃত হলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।
৪. পানির সহজ উৎস ও সহজলভ্য সেচ সুবিধা।
৫. নিরাপত্তা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে জমি নির্বাচনে বসতবাড়ীর নিকটস্থ জমিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ফসল বিন্যাস ও চাষ পদ্ধতি

ফেব্রুয়ারি হতে মে	ঃ বোরো ধান + মাছ
জুন হতে মধ্য আগষ্ট	ঃ শুধু মাছ
মধ্য আগষ্ট হতে নভেম্বর	ঃ আমন ধান + মাছ
সারা বছর- আইল ফসল	ঃ সবজি, ফল ও মশলা

জানুয়ারি মাসে জমি প্রস্তুতির সময় মাছের জন্য খননকৃত গর্তের (পুকুর) খোলা অংশে কাদা দিয়ে এক ফুট উঁচু আইল বেঁধে তার মধ্যে পোনা মাছ (জমির জন্য ১২-১৫টি হিসাবে) আগাম মজুদ করে রাখা হয়। এরপর জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ করা হয়। ধানের চারার বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে জমিতে ৪-৬ ইঞ্চি পানি জমিয়ে গর্তের আইল ভেঙ্গে দিয়ে মাছের জন্য ধানক্ষেত অবারিত করা হয়। ধান কাটার পূর্বে জমির পানি কমিয়ে মাছগুলোকে আটক করা হয় এবং আহরণযোগ্য মাছগুলো বাজারজাত করা হয়। মে মাসে বোরো ধান কাটার পর জমিতে চাষ দিয়ে ধানের গোড়া আলগা করে জমিতে শতকপ্রতি ৫০০ গ্রাম হিসেবে চুন প্রয়োগ করা হয়। চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর জমিতে পানি পূর্ণ করে গ্রাস কার্প, সরপুটি, কমনকার্প, রুই, সিলভার কার্প, কাতলা, গিফট তেলাপিয়া শতকে ৩০-৪০টি মজুদ করতে হবে (প্রথম পর্যায়ে মজুদকৃত সম্পূর্ণ আহরণ না করা হলে সংখ্যা সমন্বয় করে দিতে হবে)। ধানের জমিকে পুকুর হিসেবে সাধারণত ২ মাস ব্যবহার করা যায়। তবে আমন ধান রোপণে দোগুছি (বীজতলা থেকে চারা উঠিয়ে জমিতে ঘন করে রোপণ করে এক মাস পর যে বড় আকারের চারা পাওয়া যায় তাকে দোগুছি চারা বলে) চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আমন রোপণ আরো ২/৩ সপ্তাহ পিছিয়ে নেওয়া সম্ভব। এতে করে একক মাছ চাষ কার্যক্রম দীর্ঘায়িত করে অধিক ফলন নিশ্চিত করা যায়। মধ্য আগস্টে পুকুরের পানি কমিয়ে সব মাছ আহরণ করা হয় অথবা বড় মাছসহ গ্রাস কার্প উঠিয়ে নিয়ে আমন ধানের (সুগন্ধি ধান) চারা রোপণ করা হয় এবং চল্লিশ দিন পার হলে পুনরায় খালের মাছ জমিতে উন্মুক্ত করা হয়। প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন মাস সময় ধানক্ষেতে মাছ চাষ করে নভেম্বর মাসে জমির মাছ পূর্ণ আহরণ করা হয়।

অপরদিকে জমির উঁচু আইলে নিম্নবর্ণিত তিন স্তরের ফসল আবাদ করা হচ্ছে-

(১) বেগুন, মরিচ, টমেটোর মত স্বল্প উচ্চতার ওষধি জাতীয় সবজি
(২) জমির আইলসহ জমির ভিতরের দিকে সম্প্রসারিত মাচানে (জাংলি) সিম, কুমড়া, লাউ, করলা, ঝিঙা, বরবটি জাতীয় সবজি এবং
(৩) দুই প্রকারের ফসলের ফাঁকে ফাঁকে সাজনা গাছ, পেঁপে, কলা বা স্বল্প উচ্চতায় ফল হিসেবে আম্রপালি আম/ লিচুর চাষ করা যেতে পারে।

সুবিধা

ধানক্ষেতে মাছ চাষের উপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে-

১. আইল সম্প্রসারণ ও গর্ত করে জমির আয়তন সঙ্কোচন করার পরও ধানের উৎপাদন ১০-২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এই পদ্ধতিতে হেক্টরপ্রতি বোরো মৌসুমে ৫.১-৬.০ মে. টন ও আমন মৌসুমে ২-৩.৫ মে. টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে।
২. তিন দফায় মাছ চাষ করার ফলে হেক্টরপ্রতি ২.০ মে. টন পর্যন্ত মাছ ফলন হয়েছে।
৩. ধানক্ষেতে মাছ চাষের জমিতে কোন প্রকার কীটনাশক প্রয়োজন হয় না। কীটনাশক কম ব্যবহারের ফলে মাঠে উপকারী (বন্ধু) পোকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাবে ধানক্ষেতে মাছ চাষের জমির পার্শ্ববর্তী জমিতে ধানের পোকার আক্রমণ কমে যায় বলে কীটনাশকের ব্যবহার শতকরা ২০-১০০ ভাগ কমানো সম্ভব হয়।
৪. ধানক্ষেতে মাছ চাষ জমিতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার শতকরা ২৫-৫০ ভাগ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে।
৫. জমিতে ঘাস নিড়ানোর প্রয়োজন হয় না।
৬. সার/কীটনাশক ও নিড়ানীর খরচ হ্রাস হওয়ার ফলে ধান উৎপাদনের খরচ শতকরা ১৫-৩০ ভাগ কমে যায়।
৭. একক ধান চাষের আয়ের চেয়ে ধান, মাছ ও সবজির সমন্বিত চাষের আয় ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পায়।
৮. জমির ফসলের নিবিড়তা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়।
৯. দূষণমুক্ত খাদ্য উৎপাদনসহ পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদন হচ্ছে।
১০. ধানক্ষেতে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।
১১. আইলে বিভিন্ন প্রকারের সবজি ফল উৎপাদনের পাশাপাশি সবজির অপ্রয়োজনীয় লতাপাতা মাছ চাষে খাদ্য ও সবুজ সার তৈরিতে সহায়তা করে।
১২. ধানের নাড়া ও ঘাসের জৈববশেষ এবং মাছের বিষ্ঠা মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে।
১৩. যুগের চাহিদা অনুযায়ী Organic food উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ধানক্ষেতে মাছ চাষের মত একটি অধিক লাভজনক, পরিবেশবান্ধব ও জৈব উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ সমন্বিত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সাথে খাদ্য ঘাটতি পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তায় যে ফাটল ধরেছে - তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সীমিত সম্পদের বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করে এক খণ্ড জমি হতে জীবনে বেঁচে থাকার উৎপাদনযোগ্য সকল খাদ্য উপাদান তৈরির এই সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্মিলিত প্রয়াস চালানোর এখনই সময়।

চিংড়ি খামার পরিচালনায় অনুসরণীয় শর্তাবলী ঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

ম. কবির আহমেদ

চিংড়ি খামার পরিচালনার সময় আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান পালন করতে হলে এবং চাষ থেকে ভাল ফলাফল পেতে হলে উন্নত ব্যবস্থাপনার শর্তাবলী অনুসরণ করে খামার পরিচালনা করতে হবে। তাছাড়া খামার পরিচালনা করতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে সার্টিফিকেট বা সনদপত্র প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবেও উন্নত ব্যবস্থাপনার সকল শর্তাবলী পালন করতে হয়। এ সকল শর্তাবলীর এক বা একাধিক শর্ত পালনে ব্যর্থ খামারসমূহ খামার পরিচালনার সনদপত্র প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেন না এবং সনদপত্র প্রাপ্তির পর কোন শর্ত বা শর্তাবলী লঙ্ঘন করলে সনদপত্র বাতিল করা হয়।

গ্লোবাল এ্যাকুয়াকালচার এলায়েন্স কর্তৃক চিংড়ি খামার পরিচালনার প্রেক্ষিতে প্রণীত ও অবশ্যই অনুসরণীয় শর্তাবলী নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

শর্ত–১ঃ সম্পদের অধিকার ও প্রবিধান মানা

একটি চিংড়ি খামার স্থাপন ও পরিচালনা করতে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাধারণ ও পরিবেশগত সকল আইনকানুন পালন করতে হবে। এ সকল আইনকানুন ও বিধি-বিধানের আওতায় নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং চাহিবামাত্র প্রদর্শন করতে হবে-

- ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্স
- মৎস্যচাষের লাইসেন্স
- জমির মালিকানা/ইজারা গ্রহণের দলিল
- জমিতে নির্মাণ কাজের অনুমোদনপত্র
- খামারে লবণাক্ত পানি উত্তোলনের অনুমতিপত্র
- প্যারাবন সংরক্ষণের প্রমাণাদি
- বর্জ্য নিষ্কাশনের অনুমোদন
- জমি ভরাট করার অনুমতিপত্র
- রাক্ষুসে মাছ/প্রাণী নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতিপত্র।

শর্ত-২ ঃ সামাজিক সম্পর্ক

খামার স্থাপনের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের নিকটস্থ জলাশয়ে মাছ ধরা, চলাচল, নিজস্ব জমিতে কৃষিকাজ করা ইত্যাদিতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারবে না।

শর্ত–৩ ঃ কর্মীদের নিরাপত্তা ও মালিক-কর্মচারী সম্পর্ক

খামার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে কর্মচারীদের–

- স্থানীয় ও দেশীয় শ্রম আইনের আওতায় বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার সার্বিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্মচারীদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের কোন শারীরিক ক্ষতি হলে ক্ষতিপুরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- কর্মচারীদের নিয়োগপত্রে প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধার বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মচারীর ব্যক্তিগত ফাইল সংরক্ষণ করতে হবে।

শর্ত–৪ঃ প্যারাবন সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা

- নিয়মিত জোয়ার-ভাটা প্রবাহিত এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করে মাসিক ২/৪ বার জোয়ার-ভাটা প্রবাহিত এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য ও প্যারাবন রক্ষা করতে হবে।
- খামার স্থাপনের মাধ্যমে প্যারাবন ধ্বংস করা যাবে না।
- যে সকল স্থানে সর্বসময় পানি থাকে বা স্থান ভেজা থাকে সে সকল স্থানে খামার স্থাপন করা যাবে না।
- খামার স্থাপনের ফলে প্যারাবন সৃষ্টি বিঘ্নিত হলে এর পরিবর্তে কমপক্ষে ৩ গুণ বেশি স্থানে প্যারাবন সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

শর্ত–৫ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি খামারের বর্জ্য শোধন করে বর্জ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পৌছার পূর্বে তা প্রাকৃতিক উৎসে নিক্ষিপ্ত বা নিষ্কাশন করা যাবে না। বর্জ্য কিভাবে শোধন করা হবে তা নিজস্ব পরিকল্পনায় সম্পাদন করতে হবে। খামারের বর্জ্য প্রাকৃতিক উৎসে নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে নিষ্কাশিতব্য পানির বিভিন্ন গুণাগুণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ও তা হ্যাচারি কর্মী কর্তৃক পর্যবেক্ষণের একটি সূচি সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১ ঃ খামার থেকে প্রাকৃতিক উৎসে নিষ্কাশিতব্য বর্জ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদির গ্রহণযোগ্য মাত্রা

বৈশিষ্ট্যাদি	নিষ্কাশনের পূর্বের মাত্রা	নিষ্কাশনের মুহূর্তে মাত্রা	পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের সময়
পিএইচ	৬.০-৯.৫	৬.০-৯.০	মাসিক
সমস্ত ভাসমান কঠিন বস্তুসমূহ	১০০ মিগ্রা/লি	৫০ মিগ্রা/লি	ত্রৈমাসিক
দ্রবণীয় ফসফরাস	০.৫ মিগ্রা/লি	০.৩ মিগ্রা/লি	মাসিক
সমস্ত এ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেন	৫ মিগ্রা/লি	৩ মিগ্রা/লি	মাসিক
৫ দিনের জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা	৫০ মিগ্রা/লি	৩০ মিগ্রা/লি	ত্রৈমাসিক
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৪ মিগ্রা/লি	৫ মিগ্রা/লি	মাসিক
ক্লোরাইড	৮০০ মিগ্রা/লি	৫৫০ মিগ্রা/লি	মাসিক

উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, চট্টগ্রাম

শর্ত–৬ঃ তলানী বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

খামারের পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন নালা ও পানি থিতানোর জলাধারের তলদেশে জমা হওয়া তলানী প্রয়োজনীয় সময়ে অপসারণ করে তলদেশে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তলদেশ থেকে উত্তোলিত তলানী যত্রতত্র না ফেলে খামারের এক পার্শ্বে উঁচু স্থানে জমা করে রাখতে হবে এবং এ তলানী সূর্যালোক থেকে ও বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে এর গুণাগুণ ভাল হয়ে গেলে তা ভূমি ভরাট, বাঁধ মেরামত ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাবে।

শর্ত–৭ঃ স্থানীয় মাটি ও পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ

- খামার নির্মাণ ও পরিচালনার কালে নিকটস্থ জমিতে লবণাক্ত পানি নিষ্কাশন করা যাবে না এবং খামারের পানি চুইয়ে অন্যের জমি ও জমির ফসল নষ্ট করতে দেয়া যাবে না। খামার থেকে পানি চুইয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য খামারের তলদেশ ও বাঁধে পলিথিনের লাইনিং দেয়া যেতে পারে বা তলদেশ ও বাঁধের মাটি দৃঢ়ভাবে চেপে দিতে হবে।
- খামারের লবণাক্ত পানি নিকটস্থ স্বাদুপানিতে নিষ্কাশন করা যাবে না।
- খামারের পানির লবণাক্ততা কমাতে নলকূপের স্বাদুপানি ব্যবহার পরিহার করতে হবে। কেননা, এমনি ধরনের অবস্থায় ভূগর্ভস্থ স্বাদুপানির প্রাচুর্যতা কমে গেলে এতে লবণাক্ত পানি অণুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়।
- খামারের লবণাক্ত পানি চুইয়ে পার্শ্ববর্তী জমিতে অণুপ্রবেশ রোধে খামারের চারিদিকে নালা নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ফলে খামার থেকে চুইয়ে বের হওয়া লবণাক্ত পানি নালায় জমা হবে।

শর্ত–৮ঃ পোনা বা পিএল-এর উৎস

খামারের উৎপাদন কাজে –

- পি.সি.আর. এর মাধ্যমে পরীক্ষিত ভাইরাসমুক্ত পোনা মজুদ করতে হবে।
- সরকারের অনুমোদন ব্যতীত ভিন-দেশি প্রজাতির পোনা আমদানি ও চাষ করা যাবে না।
- ভিন-দেশি প্রজাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পোনা সঠিকভাবে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে।

শর্ত–৯ঃ অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও অপসারণ

খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধপত্রের খালি কৌটা, জ্বালানীর খালি পাত্র, খাদ্যদ্রব্যের খালি ব্যাগ, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির খালি পাত্র ইত্যাদি যত্রতত্র না ফেলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সুবিধামত সময়ে তা নিরাপদ স্থানে অপসারণ করতে হবে। এ সকল জিনিসপত্র যত্রতত্র ফেলার ফলে পরিবেশের মারাত্মক তি হতে পারে।

শর্ত–১০ঃ নিরাপদ খাদ্য বা পণ্য উৎপাদন

- চিংড়ি চাষে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ঔষধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।
- ব্যবহার অনুমোদিত ঔষধপত্র অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে ঔষধপত্র ব্যবহার না করে একমাত্র প্রতিকারের ক্ষেত্রেই ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
- রোগের কারণ নির্ণয় করে নির্দিষ্ট রোগের প্রতিকারে সুনির্দিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। রোগের প্রকৃত কারণ শনাক্ত না করে অনুমাননির্ভর ঔষধ প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অনুচিত।
- রোগ নির্ণয়, ঔষধপত্র প্রয়োগ, চিংড়ির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির রেকর্ডপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রোবায়োটিক ও পেরিবায়োটিক ব্যবহারের উপর প্রাধান্য প্রদান করতে হবে।
- নিজস্ব খামার পরিচালনার আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) ও হ্যাসাপ পরিকল্পনানুসারে খামার পরিচালনা করতে হবে।

শর্ত–১১ঃ মল-মূত্র ও অন্যান্য আবর্জনা দূরীকরণ ব্যবস্থা

চিংড়ি খামারে কর্মরত কর্মচারীদের মলমূত্র, রান্নাঘর, গোসলখানা ও অন্যান্য আবর্জনা ক্লোরিন দ্রবণে শোধন করে নিরাপদ স্থানে নিক্ষিপ্ত বা মজুদ করতে হবে।

শর্ত–১২ ঃ চিংড়ি আহরণ ও পরিবহন

- চিংড়ি আহরণের পরপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করে তা ৪ ডিগ্রি সে. ঠাণ্ডা পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।
- জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার ঝুড়িতে এক স্তর বরফ ও এক স্তর চিংড়ি এভাবে প্যাকিং করে পরিবহন করতে হবে।

শর্ত–১৩ ঃ ট্রেসিবিলিটি বা উৎস শনাক্তকরণ

চিংড়ি চাষের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কীয় যে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংরক্ষিত তথ্যাদি তা নিরসনে বিশেষ সহায়ক হবে।

রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের বিষয়সমূহ হচ্ছে–

- পুকুর চিহ্নিত করার সংখ্যা
- পুকুরের আয়তন
- পোনা মজুদের তারিখ ও সংখ্যা
- ঔষধপত্র ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য
- হার্বিসাইড, পেস্টিসাইড ও আল্‌জিসাইড ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য
- খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও খাদ্যের লট নং
- চিংড়ি আহরণের তারিখ ও পরিমাণ
- চিংড়ি সংরক্ষণ ও পরিবহন পদ্ধতি এবং
- চিংড়ি বিপণনকৃত প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীর নাম-ঠিকানা।

বিপন্ন প্রজাতির মাছের কৌলিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা

ড. মোঃ সামছুল আলম

মানব কর্মকাণ্ড মৎস্য প্রজাতির বিপন্নতা বাড়াতে বা কমাতে পারে। যেমন মানবসৃষ্ট (শিল্প কারখানা) পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত আহরণ বা নিধন কোন প্রজাতির বিপন্নতা বাড়িয়ে দিবে। অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিমিত আহরণ, অভয়াশ্রম সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বিপন্নতার মাত্রাকে কমিয়ে দিবে। একটি প্রজাতি বিপন্ন হবার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে প্রজনন হার কমে যাওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে আবদ্ধ পরিবেশে বা হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করে মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করার মাধ্যমে ঐ প্রজাতির বিপন্নতার মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে করে বিপন্ন প্রজাতির জিনভাণ্ডার আর কোনভাবে সঙ্কুচিত না হয়। কিংবা অন্তঃপ্রজননের কোন ঋণাত্মক প্রভাব না পড়ে। সেজন্যই বিপন্ন প্রজাতির কৌলিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুস্বীকার্য।

বিপন্ন প্রজাতি

বিপন্নতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাছকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

মারাত্মক বিপন্ন প্রজাতি ঃ যে প্রজাতি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে অচিরেই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে।

বিপন্ন প্রজাতি ঃ যে প্রজাতি মারাত্মক বিপন্ন নয় কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে ।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি ঃ বর্তমানে বিপন্ন না হলেও যে প্রজাতি মধ্যময়াদী ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে।

একটি প্রজাতি দেশের কতটুকু অঞ্চলে বিস্তৃত তার উপর ভিত্তি করেই বিপন্নতার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে মিঠাপানির মোট ২৬৫ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৫৪টি প্রজাতিকে বিপন্ন হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১২টি মারাত্মক বিপন্ন, ২৮টি মোটামুটি বিপন্ন ও ১৪টি ঝঁকিপূর্ণ প্রজাতি রয়েছে।

বিপন্ন প্রজাতির মাছের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য

বিপন্ন প্রজাতির মাছের ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের কমপক্ষে দুটি লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবেঃ

(১) স্বল্পমেয়াদে টেকসই পপুলেশন সংরক্ষণ (অর্থাৎ বিলুপ্তি রোধ)

(২) পরিবর্তনশীল পরিবেশে মাছের খাপ-খাওয়ার বা অভিযোজনের সামর্থ্য সংরক্ষণ।

বিলুপ্তি রোধই কোন প্রজাতির সংরক্ষণ কর্মসূচির প্রথম লক্ষ্য। তবে ব্যবস্থাপনাকে শুধু এই লক্ষ্য পূরণের উপর সন্তুষ্ট থাকলে চলবেনা। যেহেতু সব পরিবেশই পরিবর্তনশীল এবং বর্তমানে মানুষের কার্যকলাপের প্রভাবে পরিবেশ পরিবর্তনের মাত্রা প্রগাঢ় হচ্ছে। সুতরাং প্রজাতি সংরক্ষণ কর্মসূচির এমন হতে হবে যাতে মাছের কৌলিতাত্ত্বিকভাবে খাপ খাওয়ার ক্ষমতাও সংরক্ষিত হয়।

বিপন্ন প্রজাতির কৌলিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যা

সংরক্ষণ কৌলিতত্ত্বের প্রধান সমস্যা হল জেনেটিক ভেরিয়েশন হারানো। এতে পরিবেশের সঙ্গে মাছের খাপ খাওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কোন এককালীন বৃহৎ এবং বহুমুখী জিন ভাণ্ডারের খুব সামান্য অংশ বিপন্ন মাছের ব্যবস্থাপনার জন্য অবশিষ্ট থাকে এবং সেটাকেই অবিরাম ক্ষয়প্রাপ্ত পরিবেশে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। আমাদের প্রধান ভাবনা হওয়া উচিত বর্তমান জেনেটিক ভেরিয়েশনকে ধরে রাখা। কারণ পরিবেশের সঙ্গে মাছের খাপ খাওয়ার ক্ষমতা জেনেটিক ভেরিয়েশনের উপর নির্ভরশীল। কোন প্রজাতির মোট জেনেটিক ভেরিয়েশনকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ

(১) **কোন একটি পপুলেশনের অভ্যন্তরে ভেরিয়েশন (অন্তঃপপুলেশন ভেরিয়েশন) ঃ** অন্তঃপপুলেশন ভেরিয়েশন-এর উপর প্রাকৃতিক সিলেকশন কাজ করে থাকে। এ ভেরিয়েশন কমে গেলে ঐ পপুলেশনের আভ্যন্তরীণ সিলেকটিভ পরিবর্তনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়।

(২) **বিভিন্ন পপুলেশনের মধ্যে ভেরিয়েশন (আন্তঃপপুলেশন ভেরিয়েশন) ঃ** এই ক্ষেত্রে ভেরিয়েশন কমে গেলে দুটো পপুলেশন একত্রে মিলিত হয়ে একটি পপুলেশনে রূপ নিতে পারে।

অন্তঃপপুলেশন ভেরিয়েশন

অন্তঃপপুলেশন জেনেটিক ভেরিয়েন্স উচ্চমাত্রায় ধরে রাখার জন্য পপুলেশনের আকার হচ্ছে একক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। কিন্তু একটি পপুলেশনের সাধারণ শুমারি/সংখ্যা (N) ঐ পপুলেশনের জেনেটিকভাবে কার্যকরী পপুলেশন আকার (N_e) নির্দেশ করে না। কারণ পপুলেশনে প্রাক-প্রজনন ও প্রজননোত্তর অবস্থার অনেক মাছ থাকে। আবার অনেক প্রজননক্ষম সদস্যও অনানুপাতিক হারে পরবর্তী জেনারেশনে অবদান রেখে থাকে। কোন পপুলেশনের জেনেটিক বিশ্লেষণের জন্য N_e কেও ব্যবহার করা হয়। তিনটি কারণে N_e প্রায় সব সময়ই পপুলেশনের মাছের মোট সংখ্যার চেয়ে কম হয়ে থাকেঃ

(১) **লিঙ্গ-অনুপাতঃ** প্রজননকারী প্রাপ্তবয়স্ক মাছের লিঙ্গের অনুপাত যদি ১ ঃ ১ থেকে ভিন্ন হয় তাহলে N_e এবং জেনেটিক ভেরিয়েশন কমে যাবে। কোন পপুলেশনের N_e নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা হয় ঃ

প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

$$N_e = \frac{৪\,(N_m N_f)}{(N_m) + (N_f)}$$

যেখানে, N_m এবং N_f যথাক্রমে প্রজননে অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও স্ত্রী মাছের সংখ্যা। উদাহরণস্বরূপ, ১০০টি মাছবিশিষ্ট কোন পপুলেশনে ৫০টি পুরুষ ও ৫০টি স্ত্রী মাছ এবং ১০টি পুরুষ ও ৯০টি স্ত্রী মাছ আছে। এই দুই অবস্থার N_e তুলনা করা যেতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে, $N_e = \frac{৪(৫০)(৫০)}{১০০} = ১০০$।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, $N_e = \frac{৪(১০)(৯০)}{১০০} = ৩৬$।

অর্থাৎ ৫০টি পুরুষ এবং ৫০টি স্ত্রী মাছের সমন্বয়ে একটি পপুলেশনের N_e, কৌলিতাত্ত্বিক বিবেচনায়, ১০টি পুরুষ ও ৯০টি স্ত্রী মাছের সমন্বয়ে গঠিত পপুলেশনের N_e-এর ২.৮ গুণ।

(২) প্রজেনি বণ্টনঃ একটি আদর্শ পপুলেশনে পরিবার প্রতি প্রজেনি সংখ্যা Poisson ফ্যাশনে বণ্টিত হয়ে থাকে। কোন মিলন জোড়া অনানুপাতিকভাবে বেশি প্রজেনি সৃষ্টি করে এ বণ্টনে বিচ্যুতি ঘটালে পরবর্তী জেনারেশনে জননকোষের প্রতিনিধিত্বে পক্ষপাতিত্ব ঘটার কারণে N_e কমে যাবে। পক্ষপাতিত্বমূলক প্রজেনি বণ্টন N_e -কে প্রভাবিত করে থাকে। যেহেতু $N_e \approx ৪N/(২+\sigma^২)$, যেখানে $\sigma^২$ প্রজেনি বণ্টনের ভেরিয়েন্স। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০০ প্রজননকারী স্ত্রী মাছ Poisson ফ্যাশনে প্রজনন করে যার গড় ২টি সন্তান এবং ভেরিয়েন্স ২ (Poisson distribution -এ গড় = ভেরিয়েন্স)

$$N_e = \frac{৪(২০০০)}{২+২} = ২০০০$$

কিন্তু যদি একটি স্ত্রী মাছ ১০০১টি প্রজেনি তৈরি করে এবং বাকী ৯৯৯টি আসে ১টি করে প্রতিটি মাছ থেকে গড় ২-ই থাকবে কিন্তু ভৈরিয়েন্স হবে ৩১.৬ তখন N_e হবে-

$$N_e = \frac{৪(২০০০)}{২+৩১.৬} = ২৩৮$$

তার মানে পরবর্তী জেনারেশনে N_e মারাত্মকভাবে কমে যাবে।

(৩) পপুলেশনের আকারের উঠানামা ঃ যখন কোন পপুলেশনের আকার ছোট হয়ে যায় তখন পরবর্তী সব জেনারেশনের জেনেটিক ভেরিয়েন্স টিকে থাকা মাত্র কয়েকটি মাছের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পরে। ঐ কয়টি সদস্য যেহেতু পূর্বের পপুলেশনের মাত্র আংশিক ভেরিয়েন্স বহন করে থাকে। সুতরাং এই উঠানামার জন্য N_e কমে যাবে। N_e পরবর্তী প্রতি জেনারেশনের পপুলেশন আকারের বিপরীত গড়ের (harmonic mean) মাত্রায় প্রভাবিত হবে। অর্থাৎ

$$\frac{১}{N_e} = \frac{১}{t}\left(\frac{১}{N_১} + \frac{১}{N_২} + \ldots\ldots \frac{১}{N_t}\right)$$

যেখানে ঃ = জেনারেশন কাল। নিচের দুটো উদাহরণ তুলনা করলেই N_e এর উপর পপুলেশন আকারের উঠানামার গুরুত্ব বুঝা যাবে।

প্রথম ক্ষেত্রে, পরপর ৫টি জেনারেশনে প্রতিটিতে ১০০টি করে মাছ আছে, যার গাণিতিক গড় = ১০০।

$$\frac{১}{N_e} = \frac{১}{৫}\left(\frac{১}{১০০} + \frac{১}{১০০} + \frac{১}{১০০} + \frac{১}{১০০} + \frac{১}{১০০}\right) = \frac{০.০৫}{৫} = ০.০১$$

অর্থাৎ $N_e = ১০০$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, গাণিতিক গড় আবারও ১০০ কিন্তু পপুলেশনের আকার প্রতি জেনারেশনে উঠানামা করেছে ঃ ১০০, ১০, ৩০০, ১০, ৮০।

$$\frac{১}{N_e} = \frac{১}{৫}\left(\frac{১}{১০০} + \frac{১}{১০} + \frac{১}{৩০০} + \frac{১}{১০} + \frac{১}{৮০}\right) = ০.০৪৫$$ এবং N_e = ২২। এই ক্ষেত্রে পপুলেশন সঙ্কোচনের কারণে পাঁচ জেনারেশনে Ne ৭৮% কমে গেছে। ক্ষুদ্র পপুলেশনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচনা করলেই কোন পপুলেশনের জেনেটিক গঠনে Ne-এর গুরুত্ব বোধগম্য হবে।

(১) আকস্মিক জেনেটিক সংকোচন (Genetic bottlenecks) ঃ কোন পপুলেশনের সংখ্যা হঠাৎ এবং মারাত্মকভাবে কমে যাওয়াকে জেনেটিক সংকোচন (genetic bottleneck) বলা হয়। বোটলনেক কোন ব"হৎ পপুলেশন থেকে মাত্র কিছুসংখ্যক মাছ নমুনা হিসাবে পেয়ে থাকে। ফলে নতুন সৃষ্ট পপুলেশনে পূর্বের পপুলেশনের সার্বিক ভেরিয়েন্সের খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। যে মাত্রায় নতুন পপুলেশন জেনেটিকভাবে ক্ষতিগস্ত হলো তা নির্ভর করে মূল পপুলেশনের জেনেটিক ভেরিয়েশন, বোটলনেকের আকার এবং সদস্য সিলেকশনের অবাধতার মাত্রার উপর।

বোটলনেক পর্যায়ে ভেরিয়েশন হারানোর দুটো অংশ রয়েছেঃ (১) পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের ভেরিয়েন্স কমে যাওয়া। প্রথম সংকোচনের পর অবশিষ্ট পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের অনুপাত হচ্ছে $১ - \frac{১}{N_e}$, যেখানে N_e = বেঁচে থাকা মাছের সংখ্যা।

খুব কমসংখ্যক সদস্য মুল পপুলেশনের অধিকাংশ ভেরিয়েন্স বহন করে থাকেঃ ২টি সদস্য বহন করে ৭৫% এবং ১০টি সদস্য বহন করে ৯৫%। সুতরাং যদি কোন সংকোচন খুবই মারাত্মক না হয় কিংবা কয়েক জেনারেশনব্যাপী প্রলম্বিত না হয় তাহলে ইহা পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের ভেরিয়েশনে মারাত্মক কোন প্রভাব ফেলে না।

কোন নির্দিষ্ট এবং বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য এলিল (rare allele) হারানো। এটা খুবই মারাত্মক। শতকরা ৫ ভাগ বা

তার চেয়ে কম ফ্রিকোয়েন্সীর এলিল কোন পপুলেশনের সার্বিক জেনেটিক ভেরিয়েশনে খুব সামান্যই অবদান রেখে থাকে কিন্তু কালক্রমে ঐ এলিল পপুলেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে।

(২) জেনেটিক ড্রিফ্ট ঃ জেনেটিক ড্রিফ্ট হচ্ছে নমুনায়ন ত্রুটির কারণে সংঘটিত কোন ক্ষুদ্র পপুলেশনের জিন ফ্রিকোয়েন্সীতে অবাধ পরিবর্তন। এটা কার্যত একটি প্রলম্বিত সংকোচন যা সকল প্রকার জেনেটিক ভেরিয়েন্স হারিয়ে সবগুলো লোকাস স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকে। জেনেটিক ড্রিফ্ট এর মাধ্যমে জেনেটিক ভেরিয়েশন হারানো নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করা হয় ঃ

জেনেটিক ড্রিফ্ট = $\left[১-\left(\frac{১}{২N_e}\right)^t\right]$, যেখানে t হচ্ছে জেনারেশন সংখ্যা যখন N_e= পপুলেশনের আকার।

এই সূত্র এবং জেনেটিক ড্রিফ্ট এর ধারণা সাধারণভাবে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকোচন নির্দেশ করে থাকে। যদি ড্রিফ্টকাল দীর্ঘ হয় এবং পপুলেশন আকার ক্ষুদ্র হয় তাহলে বেশী পরিমান ভেরিয়েন্স খোয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন পপুলেশনের আকার ১০ হয়, তাহলে ১০ জেনারেশন পর মূল পপুলেশনের মাত্র ৬০% ভেরিয়েন্স অবশিষ্ট থাকবে। পপুলেশনের আকার যদি ১০০ হয় তাহলে একই সময় পরে ৯৫% ভেরিয়েন্স অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু ইহাকে যদি ১০০ জেনারেশন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয় তাহলে মাত্র ৬০.৬% অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ক্ষুদ্র পপুলেশনের দীর্ঘ-মেয়াদী জেনেটিক স্বাস্থ্যের (মবহবঃরপ যবধষঃয) জন্য জেনেটিক ড্রিফ্ট মারাত্মক হুমকি হতে পারে। এমনকি স্বল্পকালীন সময়েও জেনেটিক ড্রিফ্ট তাৎপর্যপূর্ণভাবে বহুগাঠনিক লোকাসের অনুপাত, লোকাস প্রতি এলিলের গড় সংখ্যা এবং মাছ প্রতি গড় হেটেরোজাইগোসিটি কমিয়ে দিতে পারে।

(৩) অন্তঃপ্রজনন মন্দা ঃ অন্তঃপ্রজননজনিত মন্দা সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা যা বিপন্ন মাছের ব্যবস্থাপনাকে মোকাবেলা করতে হয়। অন্তঃপ্রজনন হল বংশানুক্রমে সম্পর্কিত সদস্যের মধ্যে মিলন। অর্থাৎ যে সমস্ত সদস্য পপুলেশনের অন্য সদস্যের তুলনায় বংশানুক্রমে অধিক পরিমাণে সমরূপী জিন পেয়েছে উহাদের মধ্যে মিলন। ইহা অবশ্যই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার কারণ অন্তঃপ্রজননের মাত্রা মূল পপুলেশনের সাথে তুলনা করে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং অন্তঃপ্রজননের কোন পরম পরিমাপ নেই। অন্তঃপ্রজননের সবচেয়ে উপযোগী পরিমাপ হচ্ছে প্রতি জেনারেশনে অন্তঃপ্রজননের বৃদ্ধির পরিমাণ যা নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ $\Delta F = \frac{১}{২N_e}$, এই সূত্র থেকে বুঝা যায় যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘব সম্পন্ন পপুলেশন অন্তঃপ্রজননের প্রতি বেশী সংবেদনশীল।

জেনেটিক ড্রিফ্ট এবং সংকোচনের মত অন্তঃপ্রজনন কোন পপুলেশনের সার্বিক জেনেটিক ভেরিয়েন্সকে প্রভাবিত করে না। বরং অন্তঃপ্রজনন হোমোজাইগাস জেনোটাইপের পরিমাপযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রজননের সাথে জড়িত এবং যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারীতা কম অন্তঃপ্রজননের দ্বারা সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অধিক প্রভাবিত হয় বলে জানা যায়। এছাড়াও ডিমের সংখ্যা, সাবালক হওয়ার বয়স, বৃদ্ধি ও বাঁচার হার ইত্যাদিও অন্তঃপ্রজননের ফলে হ্রাস পায়। জানা যায় যে, F এর মাত্রা ১০% হলে প্রজননের সাথে জড়িত একটি বৈশিষ্ট্য ৫-১০% কমে যায়; যদি সবগুলো বৈশিষ্ট্যে এক সাথে যোগ করা হয় তাহলে সার্বিক হ্রাস ২৫% হবে যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে স্বল্প মেয়াদে অন্তঃপ্রজনন মাত্রা ১% পর্যন্ত সহনীয় যা ঘব এর মান ৫০ হলে হতে পারে। দীর্ঘ-মেয়াদের জন্য পপুলেশন আকার ৫০০-এর উপরে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাছে অন্তঃপ্রজননের প্রভাবের উপর অনেক তথ্য জানা যায়। ঐগুলোর মধ্যে দেহ গঠনে মারাত্মক বিচ্যুতি, বর্ধণহার হ্রাস, আচরণে পরিবর্তন এবং প্রজনন অক্ষমতা অন্যতম। প্রজাতি ও পপুলেশন ভেদে যদিও অন্তঃপ্রজনন-মন্দার সহ্য ক্ষমতায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং এমনকি অন্তঃপ্রজননের প্রভাবের মাত্রার পূর্বাভাষ করা সম্ভব নয়, তথাপিও মোদ্দা কথা হচ্ছে তুলনামুলকভাবে সামান্য অন্তঃপ্রজনন প্রজননক্ষমতা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ধ্বস নামাতে পারে।

অন্তঃপপুলেশনে ভেরিয়েন্স হ্রাসের প্রভাব

ইহা পরিস্কার যে জেনেটিক ভেরিয়েন্স হ্রাস কোনভাবেই কাম্য নয়। হ্রাসপ্রাপ্ত ভেরিয়েন্স জেনেটিক এবং ফেনোটাইপের উপর কী বিশেষ পরিবর্তন আণয়ন করবে এবং কী প্রমাণ আছে যে ঐ সমস্ত পরিবর্তন বিপর্যকর প্রভাব ফেলবে? জেনেটিক ভেরিয়েন্স হ্রাসের তিনটি প্রধান উপসর্গ হলঃ বর্ধিত হোমোজাইগোসিটি যা ফিটনেস কমিয়ে দেয়, সংযোযনী ভেরিয়েন্স হারানো যা হেরিটেবিলিটি কমে দেয় এবং ক্ষতিকারক রেসেসিভ এলিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া যা অস্বাভাবিকতা বৃদ্ধি করে।

আন্তঃপপুলেশন ভেরিয়েন্স হ্রাসের প্রভাব

বিপন্ন প্রজাতির মাছেরা যখন একাধিক প্রাকৃতিক পপুলেশনে অবস্থান করে, তখন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে দুটো জেনেটিকভাবে পৃথক গ্রুপের অস্তিত্ব আবিস্কার করা যার সাহায্যে প্রজাতিকে পুনরুদ্ধার করা যাবে। ইহা কোন তাৎপর্যহীন অনুধাবন নয় বরং ইহা ব্রিডিং স্টক তৈরী করার জন্য ব্যবস্থাপককে মাঠ পর্যায়ে পুনঃসংযোজন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সুযোগ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন বিপন্ন মাছ অপরিবর্তনশীল

এবং পরিবর্তনশীল উভয় পরিবেশে টেকসই পপুলেশন ধরে রাখে। ব্যবস্থাপনার পছন্দ থাকবে কোন জিন পুল প্রজননের জন্য ব্যবহার করবে। উভয় পপুলেশন থেকে মাছ একত্রীত করবে নাকি নতুন কোন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পুকুরে জিন পুল মজুদ করবে। প্রাকৃতিক পপুলেশনকে জেনেটিকভাবে পৃথক রাখা যেতে পারে, মিশ্রিত করা যেতে পারে এবং বিচ্ছিন্ন আবদ্ধ স্টক হিসাবে রক্ষনাবেক্ষন করা যেতে পারে এবং স্টকিং এর জন্য জিনপুলকে পরিবেশের সঙ্গে বেশী খাপ খাওয়ানোর মত করে বানানো যেতে পারে। সুতরাং প্রাকৃতিক কারণে বিচ্ছিন্ন পপুলেশনের ভেরিয়েন্স, সহজসাধ্য না হলেও সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যেখানে সম্ভব, অবিরাম পৃথক রেখে ব্যবহার করতে হবে।

প্রাকৃতিকভাবে পৃথক পপুলেশন একীভূত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে সহ-অভিযোজিত জিন কমপ্লেক্স হারানো। ইহা ঘটে থাকে যখন এক পপুলেশনের জিন, যেগুলো একে অপরের সাথে কাজ করার জন্য নিকট-সংযুক্ত এবং সহ-অভিযোজিত, হাইব্রিডাইজেশনের ফলে ভেঙ্গে গিয়ে নতুন কমপ্লেক্স তৈরী হয় যা একত্রে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। ইহা খুবই সাধারণ ঘটনা যেমন উদাহরণস্বরূপ, প্রথম জেনারেশন হাইব্রিড শক্তিশালী কিন্তু পরবর্তী জেনারেশনে ইহার ফিটনেস কমে যায় সম্ভবত এই কারণে যে সহ-অভিযোজিত জিন কমপ্লেক্স ভেঙ্গে গিয়েছে। এই অবস্থাকে অনেক সময় বহিঃপ্রজনন মন্দা বলা হয়।

বিপন্ন মাছের ব্যবস্থাপনার কৌশল

উপরে উল্লিখিত তথ্য সংশ্লেষণ করে আমরা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে পারি যা জেনেটিক ক্ষতি কমাবে এবং ক্ষুদ্র পপুলেশনের দীর্ঘ-মেয়াদী জেনেটিক স্বাস্থ্যের সুযোগ সর্বাধিক করবে। সুষ্ঠু জেনেটিক ব্যবস্থাপনার জন্য পপুলেশন গঠন এবং জেনেটিক ও অঙ্গসংস্থান ভেরিয়েশন এর উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই উপাত্ত ছাড়া আমরা জেনেটিক ভেরিয়েশন সংরক্ষণের জন্য কেবল অন্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কোন পপুলেশনকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত বা বর্ণনা করার পরই কেবল যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব। যখন স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত কোন প্রজাতি পুনঃসংযোজন করা হবে, পূর্বের ভিত্তিমূলক তথ্য সংযোজিত স্টককে ভূতপূর্ব স্টকের কাছাকাছি নিতে সহায়ক হবে। অন্য সবকিছু সমান হলে, সংযোজনের জন্য সর্বাধিক জেনেটিক ভেরিয়েশনসম্পন্ন পপুলেশন সিলেকশন করা উচিত কারণ ইহা সম্ভবত কোন নতুন পরিবেশে বিবর্তনীয় অভিযোজনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ইলেকট্রোফোরেটিক, উঘঅ মার্কার ও ক্রোমোসোমাল বিশ্লেষণ থেকে এবং পরিমাপবাচক ও গণনাবাচক বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন থেকে জানা যেতে পারে।

কোন বিপন্ন মাছের প্রজাতির মধ্যে কিভাবে জেনেটিক ভেরিয়েশন বিস্তৃত এবং কিভাবে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে সেই ভেরিয়েশন সংরক্ষণ করা যাবে তা জানার জন্য উহার বিস্তারিত জেনেটিক বিশ্লেষণ করতে হবে। যেমন জেনেটিক ভেরিয়েন্সকে খুব সহজেই অন্তঃএলাকা, আন্তঃএলাকা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক গ্রুপের প্রতিনিধিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

জেনেটিক ভেরিয়েন্স-এর মাত্রা জানার জন্য সব ব্রুডস্টকের জেনেটিক বিশ্লেষণ করতে হবে যা থেকে পরবর্তী অন্যান্য ভেরিয়েশন পাওয়া যাবে। এধরনের বিশ্লেষণ মাছকে না মেরেই করা সম্ভবঃ মাংসপেশী, পাখনা, রক্ত কিংবা ত্বক মিউমাস ইত্যাদি মাছের খুব সামান্য আঘাত দিয়ে/ক্ষতি করে সংগ্রহ করা সম্ভব। এলিল ফ্রিকোয়েন্সী নির্ণয় করার জন্য অথবা এলিল হারানো শনাক্ত করার জন্য পরবর্তী আবদ্ধ জেনারেশনসমূহ থেকে মাঝে মাঝে নিয়মিতভাবে নমুনা সংগ্রহ করে জেনেটিক বিশ্লেষণ করতে হবে। তাৎপর্যপূর্ণ জেনেটিক অবনতি ঘটে থাকলে এধরনের কার্যকলাপ থেকে তা জানা যায় এবং ইহারা আবদ্ধ বিপন্ন মাছের জেনেটিক কল্যাণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহনে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। কেবলমাত্র জেনেটিক মনিটরিং এর মাধ্যমেই আমরা দুষ্প্রাপ্য মাছের বর্ধিত সময়ের জন্য রক্ষণাবেক্ষন আশা করতে পারি। আবদ্ধ ব্রিডিং কর্মসূচী ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ঘব রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী যে কোন প্রজাতির প্রাকৃতিক জেনেটিক ভেরিয়েশনের কিছু কিছু অজান্তেই হারিয়ে যাবে যখন কিছু মাছকে প্রতিষ্ঠাতা হ্যাচারী স্টক হিসাবে স্থাপন/গ্রহন করা হবে এবং নিবিড় হ্যাচারী উৎপাদনের প্রতি জেনারেশনে আরও অনেক ভেরিয়েন্স অজান্তেই খোয়া যাবে। ফলশ্রুতিতে সংরক্ষণ জেনেটিক্সের মুলনীতি হচ্ছে স্বল্পকালীন টিকে থাকার জন্য জেনেটিকভাবে কার্যকরী পপুলেশন আকার সর্বনিম্ন ৫০ হতে হবে। এই সংখ্যা প্রতি জেনারেশনে ১% অন্তঃপ্রজনন বৃদ্ধি (ঋ) ঘটাবে যা কয়েকটি জেনারেশন পর্যন্ত সহনশীল পর্যায়ে থাকে। দীর্ঘ-মেয়াদী জেনেটিক স্বাস্থ্যের জন্য সর্বনিম্ন ঘব হতে হবে ৫০০ যার অন্তঃপ্রজনন সহগ হবে ০.১%। অবশ্যই আকার এর থেকেও বড় হলে আরও ভাল। যে কোন ক্ষেত্রে, সমান অনুপাতে প্রজননকারী পুরুষ ও স্ত্রী মাছ রক্ষণাবেক্ষন করে, জোড়ায় জোড়ায় মিলন ঘটিয়ে এবং অতিরিক্ত প্রজেনী বর্জন করে প্রজেনীর সম-বন্টন নিশ্চিত করে এবং পপুলেশনে ধ্বস না নামিয়ে ঘব কে বাড়ানো সম্ভব। এ ধরনের কার্যকলাপ পরিমাণবাচক জেনেটিক ভেরিয়েশনের আরও ক্ষয় রোধ করবে এবং দুষ্প্রাপ্য এলিল হারানো এবং অন্তঃপ্রজনন প্রভাব কমাবে। সময় সময় আবদ্ধ পপুলেশনে বাইরে থেকে মাছ যোগ করেও এই সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

থাই পাঙ্গাস চাষে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও পানির গুণাগুণের জৈবিক ব্যবস্থাপনা

ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার[১]
ড. সালেহা খান[২]

আবহমান কাল হতে বাংলাদেশে পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*) স্বাদুপানির একটি অতি জনপ্রিয় ও সুস্বাদু মাছ। এ মাছটি বাংলাদেশের নদীতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা প্রাপ্তির স্বল্পতা ও কৃত্রিম উপায়ে পর্যাপ্ত পোনা উৎপাদন কার্যক্রম সফল না হওয়ার কারণে আমাদের দেশে আজও পুকুরে বাণিজ্যিকভাবে দেশীয় প্রজাতির এ মাছটির চাষ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। চাহিদার কথা বিবেচনা করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৯৯০ সনে পুকুরে চাষ উপযোগী এ মাছের অন্য একটি প্রজাতি *(Pangasius hypophthalmus)* প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে নিয়ে আসে যা থাই পাঙ্গাস নামে পরিচিতি লাভ করে। এ মাছটি থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে পুকুরে ও খাঁচায় চাষ করা হয়ে থাকে। থাই পাঙ্গাস দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার কারণে সহজেই অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় বলে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ মাছটি আমাদের দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং দেশ জুড়ে ছোট - বড় অসংখ্য খামারী এ মাছ চাষে আগ্রহী হয়ে যায়। পাঙ্গাস চাষকে কেন্দ্র করে অনেক হ্যাচারি, নার্সারি, উক্ত মাছের খাদ্য তৈরির কারখানাসহ নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠে এবং পাশাপাশি সৃষ্টি হয় ব্যপক কর্মসংস্থানের। এভাবে দেখা যায় যে, থাই পাঙ্গাস চাষ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ও প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশে পাঙ্গাস চাষ শুরু

থাই পাঙ্গাসের চাষ প্রথমে ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় সীমিত আকারে শুরু হয় ১৯৯০ সালে। নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে জানা যায় যে, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ও ভালুকা উপজেলার কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি (নির্মাণ ঠিকাদার) তাদের ইজারাকৃত পুকুরে সর্বপ্রথম এ মাছটির চাষ শুরু করেন। পরবর্তীতে দ্রুতবৃদ্ধি, অধিক ফলন ও মুনাফার কারণে পাঙ্গাস চাষ চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে পাঙ্গাস চাষ পদ্ধতি

প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রযুক্তি না পেয়ে খামার মালিকগণ নিজেদের মত করে এ মাছটির চাষ শুরু করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশি মুনাফার আশায় চাষিরা অধিক ঘনত্বে এবং অতিরিক্ত হারে খাবার প্রয়োগের মাধ্যমে পাঙ্গাসের নিবিড় একক চাষ (Monoculture) শুরু করে। বর্তমানে চাষিরা পাঙ্গাসের সাথে রুই জাতীয় মাছ মজুদ করে থাকেন। তবে এ সকল মাছের গবেষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন মজুদ হার না থাকায় চাষিরা অনেক ক্ষেত্রে পাঙ্গাসের সাথে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে ভাল ফলন পাচ্ছেন না।

পানির গুণাগুণের উপর অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের প্রভাব

নিবিড়ভাবে চাষকৃত পুকুরে পাঙ্গাসের উচ্ছিষ্ট খাবার ও জৈবিক বর্জ্য পদার্থ অণুজীব দ্বারা পচনের ফলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন উৎপাদনের জন্য সহায়ক প্রচুর পুষ্টি উপাদান (NO_3-N ও PO_4-P) ছেড়ে থাকে। এ সকল পুষ্টি উপাদান পুকুরের পানিতে প্রচুর পরিমাণে নীল-সবুজ শেওলা (Blue green algae) জন্মাতে সহায়তা করে। পাঙ্গাস মাছ এ সকল শেওলা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না বিধায় শেওলা পুকুরে অব্যবহৃত থেকে যায়। এই অব্যবহৃত শেওলা পুকুরের পানিতে মারাত্মক ব্লুমের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এই ব্লুমের পচনের ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে পুকুরের পানি মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

পাঙ্গাসে খারাপ গন্ধের (Off flavour) সৃষ্ট হওয়া

অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাংটন উৎপাদনের ফলে পাঙ্গাস চাষকৃত পুকুরের পানি দুষিত হয়। দূষিত পানিতে একদিকে পাঙ্গাসের ফলন কম হয়। অন্যদিকে নীল-সবুজ শেওলা বিশেষ করে *Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Oscillatoria* দ্বারা সৃষ্ট geosmin এবং ২-methylisoborneol (MIB) নামক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা পাঙ্গাসের শরীরে এক ধরনের খারাপ গন্ধের (Off flavour) সৃষ্টি হয় যা রান্নার পরেও দূরীভূত হয় না। এসব কারণে পাঙ্গাসের চাহিদা ও বাজার মূল্য পড়ে যায় এবং চাষে মুনাফার হারও অনেক নিচে নেমে আসে। ফলে চাষিরা বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় এবং পাঙ্গাস চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে থাকে। এভাবে দেখা যায় যে, পাঙ্গাসের পুকুরে অতিরিক্ত হারে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন ও পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়া বাংলাদেশে পাঙ্গাস চাষের ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের বাধা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাঙ্গাসের মত চ্যানেল ক্যাট ফিসের (*Ictalurus punctatus*) পুকুরেও অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন ও

১ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
২ প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

মাছের শরীরে Off flavour সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় বলে জানা যায়।

মাছের পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ব্যবস্থাপনা

ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন মাছ চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু পুকুরে অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন মাছ চাষের জন্য অসুবিধাজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। মাছের সর্বাধিক ফলন লাভ ও জলজ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পুকুরে অতিরিক্ত হারে উৎপাদিত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। নিবিড়ভারে চাষকৃত মাছের পুকুরে অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও জৈবিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যেমনঃ কপার সালফেট ($CuSO_4$, $5H_2O$), সিমাজিন (2-chloro-4, 6-bis (ethylamino)-s-triazine) সহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও পরবর্তীতে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া সহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। জৈবিক পদ্ধতিতে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাঙ্কটনভোজী (Filter feeding) মাছ যেমনঃ সিলভার কার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পুকুরের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অতিরিক্ত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন মাছ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধারণাকে ভিত্তি করে আমাদের দেশে পাঙ্গাসের পুকুরে অতিরিক্ত হারে উৎপাদিত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও পানির গুণাগুণ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই ও পরিবেশ উপযোগী চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সাফার প্রজেক্ট - ডিএফআইডি (SUFER project-DFID) -এর অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের অংশ হিসেবে পাঙ্গাসের নিবিড় একক চাষ এবং পাঙ্গাসের সঙ্গে শেওলাভোজী সিলভার কার্প ও কাতলা মাছের মিশ্র চাষের উপর একটি গবেষণা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ গবেষণা পুকুরে ও বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের নিকটবর্তী গ্রামের চাষিদের পুকুরে যুগপৎভাবে পরিচালনা করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, পাঙ্গাসের একক চাষের পুকুরে অধিক হারে শেওলা উৎপাদিত হয় যা পাঙ্গাস খায় না। ফলে শেওলা অব্যবহৃত থেকে যায়। এই অব্যবহৃত শেওলা পাঙ্গাসের একক চাষের পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং পুকুরের পানিকে দূষিত করে ফেলে। অন্যদিকে পাঙ্গাসের সঙ্গে শেওলাভোজী সিলভার কার্প ও কাতলা মাছের মিশ্রচাষের পুকুরে উৎপাদিত শেওলা সিলভার কার্প ও কাতলা গ্রহণ করে বড় হয়। এ ছাড়া সিলভার কার্প পাঙ্গাসের জন্য দেয়া পিলেট খাবার মোটেই খায় না । ফলে সিলভার কার্প মাছের খাদ্যের জন্য আলাদা কোন খরচের প্রয়োজন হয় না। সিলভার কার্প ও কাতলা পুকুরে উৎপাদিত শেওলা গ্রহণ করার কারণে পুকুরে পানির গুণাগুণেরও উন্নতি হয়, ফলে পাঙ্গাসের বৃদ্ধি ও ফলন দুটোই বেড়ে যায়। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, নিবিড় পাঙ্গাস চাষের পুকুরে প্রতি শতাংশে ৩০ টি সিলভার কার্প ও ৩০ টি কাতলা মজুদ করলে পাঙ্গাসের বৃদ্ধির হার ও লাভের পরিমাণ বেশি হয়। পাশাপাশি পানির গুণাগুণেরও উন্নতি হয়। গবেষণাকালীন সময়ে কেবল পাঙ্গাসকে প্রথম মাস পর্যন্ত শরীরের ওজনের ৮% হারে, দ্বিতীয় মাস পর্যন্ত ৬% হারে এবং অবশিষ্ট সময়ে ৪% হারে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পিলেট খাবার খাওয়ানো হয়েছিল। আমাদের দেশে মৎস্য চাষিরা পাঙ্গাসের একক চাষের পরিবর্তে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের জৈবিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঙ্গাস, কাতল ও সিলভার কার্পের মিশ্রচাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, অধিক মুনাফা অর্জন, পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে সক্ষম হবেন।

পাঙ্গাসের একক চাষ ও মিশ্র চাষের তুলনামুলক বিবরণঃ

পাঙ্গাসের একক চাষ

- খরচ বেশি
- পাঙ্গাসের বৃদ্ধির হার ও ফলন কম
- মুনাফা কম
- পুকুরে দূষিত পানি
- পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম
- গন্ধযুক্ত পাঙ্গাস উৎপাদন

পাঙ্গাস ও সিলভার কার্পের মিশ্র চাষ

- খরচ কম
- পাঙ্গাসের বৃদ্ধির হার ও ফলন বেশি
- মুনাফা বেশি
- পুকুরে তুলনামূলকভাবে ভাল পানি
- সিলভার কার্প ও কাতলার বাড়তি ফলন
- গন্ধমুক্ত পাঙ্গাস উৎপাদন

চিত্র ঃ বাণিজ্যিকভিত্তিতে উৎপাদিত পাঙ্গাস

জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও আমাদের করণীয়

মোঃ আবুল হাশেম

জীববৈচিত্র্য বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানের বিভিন্ন ধরনের উপাদান বা তাদের সমন্বিত পরিস্থিতির প্রাচুর্যতাকে বুঝায়। এক কথায় জীববৈচিত্র্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট স্থানের জীবের প্রকরণ ও বিভিন্নতা। বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, পেয়ারা, তাল, কুল, তেঁতুল ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এছাড়াও অসংখ্য বিভিন্ন প্রজাতির অণুজীব আছে যাদেরকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না - অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের দেখতে হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর অণুজীব তাদের পচনে সহায়তা করে। পরিবেশে অণুজীবের অনুপস্থিতিতে পচন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত এবং পর্যায়ক্রমে পৃথিবী বসবাস অনুপযোগী হয়ে পড়ত। পৃথিবীতে বিদ্যমান এ বৈচিত্র্যময় প্রাণী-উদ্ভিদ-অণুজীব অবস্থাকে জীববৈচিত্র্য বলা হয়। অণুজীব মাটিতে অবস্থিত জৈব উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে রূপান্তরিত করে। উদ্ভিদের উপস্থিতিতে পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জীব তথা জীববৈচিত্র্য পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। জীববৈচিত্র্য শুধুমাত্র জীবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়- এদের আবাসভূমির প্রকরণ ও বিস্তৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জীববৈচিত্র্য মূলত তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন- জীবগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity), আবাসগত বৈচিত্র্য (Habitat diversity) এবং প্রজাতি বৈচিত্র্য (Species diversity); এরা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ

সময়ের ব্যবধানে মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে বিভিন্ন প্রজাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবন-জীবিকা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল বিধায় জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মানব জাতির ওপর পড়বে- এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সকল কারণ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির অতি আহরণ বা যথেচ্ছা নিধন;
- গেম হান্টির বা গেম ফিসিং এর মাধ্যমে প্রজাতির নিধন;
- অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রজাতির ধ্বংস সাধন;
- পতঙ্গ বা পতঙ্গভুক প্রাণী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির জন্য আবাসস্থল ধ্বংস করা;
- জলাভূমিকে কৃষি জমি তথা আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার করে;
- মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে জলজ সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে বিদেশি প্রজাতি আমদানি;
- নতুন ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী আবির্ভাবের সাথে বা বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার আন্তঃপ্রতিযোগিতার ফলে;
- কোন ভক্ষণকারী প্রজাতির ব্যাপক ভক্ষণের ফলে;
- কৃষি ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য জলাভূমি হতে পানি অতিরিক্ত পরিমাণে আহরণ করার মাধ্যমে;
- মৎস্য প্রজাতিসমূহের আশ্রয়স্থল ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও অন্যান্য বাঁধ এবং সড়ক, মহাসড়ক অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা;
- ক্রমাগতভাবে কৃত্রিম প্রজননের ফলে মূল প্রজাতির পরিবর্তন ও স্বাভাবিক জিনগত অবনতি করা;
- কল-কারখানা ও শহরের বর্জ্য জলাধারে নিক্ষেপ ও জলজ পরিবেশ দূষণ করা ;
- অভিপ্রয়াণী প্রজাতিসমূহের প্লাবনভূমিতে প্রবেশ বন্ধ হওয়াতে জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়া।

বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহ রক্ষার যৌক্তিকতা

- পরিবেশের ভারসাম্য ও বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা;
- জিনপুলের গুণগতমান রক্ষা করা;
- রাসায়নিক ও ভেষজ গুণাগুণকে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগানো;
- নতুন পণ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক;
- স্থানীয় স্বল্পোন্নত জাতিগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো;
- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রক্ষায় কাজ করে;
- নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য কোন বিশেষ প্রজাতির ভূমিকা থাকে;
- পৃথিবীতে বর্তমান সকল জীবকূল একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কেবলমাত্র ইকোসিস্টেমের সচলতার জন্য নয় এমনকি মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় জীবকূলের ভূমিকা রয়েছে।

জীববৈচিত্র্য ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণের উপায়

- মারাত্মকভাবে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির জন্য জরুরিভিত্তিতে সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ; যেমন-গণসচেতনতা সৃষ্টি, অতিরিক্ত আহরণ বন্ধ, অভয়াশ্রম স্থাপন ইত্যাদি;
- কোন বিশেষ প্রজাতির জন্য ন্যূনতম সহনশীল উপযুক্ত জনতার আকার নির্ধারণ করা অর্থাৎ কী পরিমাণ নির্দিষ্ট জীবটি ঐ স্থানে থাকলে তার ভবিষ্যত প্রাচুর্যতা কমবে না;
- বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিকে সহনশীল জনতার আকারে পৌঁছানো। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা;
- কোন প্রজাতির জন্য সহনশীল আবাস ও ইকোসিস্টেম স্থির করা;
- ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাস ও ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার করা অথবা উপযুক্ত আবাস নতুনভাবে সৃষ্টি করা;

প্রকল্প পরিচালক, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

- ♦ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সঠিক বাস্তুতন্ত্র কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- ♦ জনগোষ্ঠী ও তার আবাস এবং ইকোসিস্টেমকে পরিবীক্ষণ করে তার গতিবিধি ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা;
- ♦ গাণিতিক মডেল ও কম্পিউটার ব্যবহার করে ভবিষ্যতে জনতার আকার সম্পর্কে ধারণা দেয়া;
- ♦ ক্ষতিগ্রস্ত জলাশয়গুলোর ধ্বংসের উৎস চিহ্নিতপূর্বক তা রোধকরণ;
- ♦ ঝুঁকিপূর্ণ প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি এবং এদের আবাসস্থল রক্ষাকরণ।

জলজ জীববৈচিত্র্য বলতে জলজ পরিবেশে উপস্থিত সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ বা জীবকূলের সমৃদ্ধতা বুঝায়। যেমন- কোন জলাশয়ের সকল জলজ প্রাণী তথা মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও অণুজীবসমূহ মিলেই সেখানকার জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। আর সেখানে প্রত্যেকের আবাসস্থল বা উপস্থিতি একে অপরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

পরিবেশে উপস্থিত সকল জীবেরই গুরুত্ব রয়েছে এবং একটি বিশেষ প্রজাতির সর্বনিম্ন পরিমাণের উপস্থিতি সেখানে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। জলাভূমিতে উপস্থিত প্রতিটি প্রজাতিই কোন না কোন স্বাভাবিক গুরুত্ব নিয়ে প্রকৃতিতে অবস্থান করছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দিনান্তরে জীববৈচিত্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

একথা সর্বৈব সত্য যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এদেশে দ্রুত বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মিটাতে মৎস্য জীববৈচিত্র্যকে বিশেষ বিবেচনায় আনা একান্ত প্রয়োজন। দেশের মানুষের আমিষের চাহিদার প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ এবং মোট প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% আসে মাছ হতে। জলজ পরিবেশের নানাবিধ জীববৈচিত্র্যের মধ্যে মৎস্য জীববৈচিত্র্যই প্রধানত লক্ষণীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল্যবান মৎস্য প্রজাতি এবং জাতের বিলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া দিনান্তরে বেড়েই চলছে বিধায় মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন তথা জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের 'ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প' নামের একটি কারিগরি সহায়ক প্রকল্প বর্তমানে পাবনা এলাকায় চলমান রয়েছে।

গাণিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাছের আবাসস্থল উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মাছের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় মৎস্যচাষ বিষয়ক কার্যক্রমসহ মাছ আহরণ মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নানাবিধ কারণের মধ্যে আবাসস্থল নষ্ট করা এবং মাত্রাতিরিক্ত হারে মাছ আহরণই মাছের জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জলাশয়ে নিয়ম বহির্ভূত মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করে সকল প্রজাতি/আকৃতির মাছ নির্দয়ভাবে আহরণ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, মৎস্য ও মৎস্যজাত সম্পদ সময়ের ব্যবধানে ব্যাপকভাবে উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

অপরিকল্পিভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো ব্যবস্থা, রাস্তা, কালভার্ট, জলাভূমিকে ব্যাপকভাবে মৎস্য খামারে রূপান্তর, বন ধ্বংস করা, নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং অন্যান্য অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে মাছের আবাসস্থল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, উন্মুক্ত জলাশয়ের পানি প্রবাহ কম, পলি ভরাটের ফলে নদ-নদীসহ অন্যান্য জলাভূমির গভীরতা হ্রাস, পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন্যার সময়কালের পরিবর্তন এবং প্লাবনভূমির পরিমাণসহ স্থায়ী জলমহালগুলো শুকিয়ে যাওয়া, গৃহস্থালী এবং শিল্পের বর্জ্য জলাভূমিতে বেআইনীভাবে জমা করায় পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া জলাশয় শুকিয়ে সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করা হয় বিধায় মৎস্য জীববৈচিত্র্য দিনদিন হারিয়ে যাচ্ছে।

মৎস্য জীববৈচিত্র্যের জন্য আর একটি মারাত্মক ঝুঁকি হলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদেশ থেকে মাছ আমদানি এবং এদের যথার্থ রোগ নিরোধক ব্যবস্থা না করা। অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকৃত নতুন মাছের সাথে সংশ্লিষ্ট জীবাণু এবং পরজীবীরা উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। সেজন্য আমদানির ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন প্রজাতির মাছকে পুনরুদ্ধারের স্বার্থে ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা অতীব প্রয়োজন। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে সর্বস্তরে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত মৎস্য বিষয়ক আইনসমূহ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন প্রয়োজন। হারিয়ে যাওয়া পুরনো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার স্বার্থক প্রয়াসে মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ- যা হবে প্রকৃত অর্থেই অনাগত দিনে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর।

জাটকা (পোনা ইলিশ) সংরক্ষণ কার্যক্রম ও জনসচেতনতা

ড. মোঃ মফিজুর রহমান

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। একটি পরিপূর্ণ রূপালি ইলিশ দেখলে জিহ্বায় পানি আসবে না এমন বাঙ্গালী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমন একটা সময় আমরা অতিবাহিত করে এসেছি যখন প্রায় সারা বছরই প্রচুর ইলিশ পাওয়া যেত। যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৪/৭৫ সালে মাত্র ১৫ টাকায় দু'হালি প্রমাণ সাইজের ইলিশ পাওয়া যেত। আর এখন গ্রাম-গঞ্জে ইলিশ প্রায় পাওয়াই যায় না, আবার যদিওবা কিছু পাওয়া যায় তা গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিত্তশালী মানুষ ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য ইলিশ মাছ খাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ ইলিশের দুষ্প্রাপ্যতা এবং সর্বোপরি মূল্যবৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস, পরিবেশ বিপর্যয়, ডিমযুক্ত মা ইলিশ ধরা এবং ক্রমবর্ধমান হারে জাটকা (ছোট ইলিশ) নিধন করায় ইলিশের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশকে শুধুমাত্র ছবি দেখিয়েই পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়তো হবে যে, দেখ এটাই হলো আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ।

ইলিশ মাছের গুরুত্ব

আমরা অনেকেই হয়তো জানিনা যে, প্রাণিজ আমিষের মধ্যে মৎস্য আমিষ সবচেয়ে উত্তম। মৎস্য আমিষ সহজপাচ্য। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ ভাগই আসে মৎস্য থেকে। অন্যান্য মাছের মধ্যে আবার ইলিশ মাছ এদিক থেকে অনন্য। কারণ এটি দেখতে যেমনি সুন্দর, খেতেও তেমনি অতীব সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে অতুলনীয়। ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতনামা স্যামন ফিস ও ভূমধ্যসাগরের হামুর মাছ অপেক্ষা বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ স্বাদে, গুণে কোন অংশেই কম নয়। ইলিশ মাছে আছে পর্যাপ্ত আমিষ যা মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। ইলিশ মাছে উচ্চমাত্রায় চর্বি (১৯.৪%), প্রোটিন (২১.৮%), খনিজ পদার্থ (২.২%) ও শর্করা (২.৯%) রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম ইলিশে ক্যালরির পরিমাণ ২৭৩ যা অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি। এ মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে এবং আরো আছে ওমেগা-৩ নামক ফ্যাটি এসিড যা মানুষের দেহের রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রাকে হ্রাস করে। ইলিশের তেল মানুষের হৃদরোগজনিত মৃত্যু ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করে। ইলিশ মাছ খেলে মানুষের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ৯ ধরনের এমাইনো এসিড পাওয়া যায়। পুষ্টিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, ইলিশ মাছের বেশ কিছু ঔষধি গুণও রয়েছে।

জাতীয় মাছ ইলিশ একক প্রজাতি হিসেবে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানসহ আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে ইলিশ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও পঞ্চাশের দশকে এ অঞ্চলে ইলিশ মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ১.০ থেকে ১.৫ লক্ষ মে. টন। ষাটের দশকে উৎপাদন কিছুটা কমে গেলেও আশির দশকে গড় উৎপাদন দেড় লক্ষ টনের মত ছিল। ২০০২-০৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ১.৯৯ লক্ষ টন এবং ২০০৮-০৯ সালে ২.৯৯ লক্ষ মে. টন হলেও জনসংখ্যার তুলনায় তা খুব যথেষ্ট ছিল না।

ইলিশ উৎপাদন হ্রাসের কারণ

ইলিশ উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ অবাধে জাটকা ও ডিমওয়ালা মাছ আহরণ, অতি আহরণ, জলজ পরিবেশগত পরিবর্তন ইত্যাদি। ইলিশ মাছ প্রায় সারাবছরই প্রজনন করে থাকে, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৎস্য বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম অক্টোবর মাস ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস। প্রজনন মৌসুমের সময় ডিমওয়ালা মা মাছ এবং ডিম ফুটে বাচ্চা ইলিশ (জাটকা) বের হবার পর পরিপক্বতা আসার আগেই নির্বিচারে জাটকা নিধন করার কারণেই মূলত বাংলাদেশের ইলিশ উৎপাদন এ শতকের শুরু পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান ছিল বলা যায়। বাংলাদেশের নদ-নদী, উপকূলীয় অঞ্চলে জগৎবেড় জাল, বেড়া জাল, ফাঁস বা কারেন্ট জাল, পোয়া জাল, বেহুন্দী জাল, ইত্যাদি ও নদ-নদীতে বাঁশ/বেড়া দিয়ে আড়াআড়ি জাল পেতে দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জাটকা নিধন করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কেবল ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়েই জাটকা ধরার পরিমাণ ছিল ১৯,২০০ মে.টন।

জাটকা রক্ষায় কার্যক্রম

ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ দেশের প্রায় ৪.৫ লক্ষ মৎস্যজীবী প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এ ধারা ১৩ সংশোধন করে নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত সময়ে ৯ ইঞ্চি বা ২৩ সেমি এর ছোট ইলিশের পোনা (জাটকা) ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মূল্যবান ইলিশ সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে জাটকা রক্ষায় সরকারি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় (২০০৪-০৭ সময়ে) প্রথম পর্যায়ে 'জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন/বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে ৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। মৎস্য বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান ৪টি প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন এবং সরকার উক্ত প্রজনন ক্ষেত্রগুলোকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করে অভয়াশ্রম এলাকায় (প্রায় ৭০০০ বর্গ কিমি) প্রতি বছর ৩০

১ উপসচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

চিত্র ঃ মাননীয় মৎস ও প্রাণিসম্প মন্ত্রী বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণ উপলক্ষে সচেতনতামূলক সভায় বক্তব প্রদান করছেন

আশ্বিন হতে ৯ কার্তিক পর্যন্ত (১৫-২৪ অক্টোবর) সব ধরনের ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে। এ আইন অমান্য করে মৎস্য আহরণ করা হলে নৌকা জাল বাজেয়াপ্তসহ প্রথমবার আইন ভঙ্গের জন্য ১ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড তৎসহ ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয় বার আইন ভঙ্গ করলে শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ করার বিধান করা হয়েছে।

সরকার জাতীয় মাছ ইলিশকে রার জন্য শুধু আইন সংশোধন করেছে তা নয় বরং জাটকা রক্ষার অভিযান পরিচালনা ও জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন করার জন্য একদিকে ৪টি জেলায় ২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে স্থানীয় মুদ্রায় ২২৮৮.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্ণিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাটকা ও ব্রুড ইলিশ রক্ষা করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি, অভয়াশ্রম এলাকায় ভরা প্রজনন মৌসুমে জাটকা আহরণ কমিয়ে আনা, জাটকা আহরণকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে অধিক মাত্রায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। প্রকল্পটি চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ভোলা ও পটুয়াখালী জেলার ২০ উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আশা করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প শুরুর সময়ে বাজারে যে পরিমাণ জাটকা পাওয়া যেত তার চেয়ে ৫০% কম জাটকা বাজারজাত হবে অর্থাৎ হারাহারিভাবে অনেক বেশি ইলিশের উৎপাদন হবে এবং জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার ৬০% উন্নয়ন ঘটবে। জাটকা রক্ষার অভিযানের মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা হলো জাটকা নিধন প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা, জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, ইলিশ অভয়াশ্রম ও ইলিশ প্রজননত্রে সংরক্ষণ, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন এবং জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও বিশেষ খাদ্য সহায়তা প্রদান।

মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বিএফআরআই, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, বিভিন্ন সংস্থা, মৎস্যজীবী ও জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিগত ২০০৪ সাল থেকেই এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এখন আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে জাটকা নিধন রোধকল্পে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং একই সঙ্গে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় রাজস্ব বাজেটের আওতায় চলমান 'জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন/বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি'ও অব্যাহত রাখা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০৭-১০ সময়ে) ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় যা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ অভিযান ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জাটকা নিধন প্রতিরোধকল্পে গত ২০০৮-১০ সময়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে গত ২১-২৭ মার্চ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন, গনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যমে সংবাদ সম্মেলন, ইলিশ প্রজননক্ষেত্র/অভয়াশ্রম সংক্রান্ত টিভি ফিলার ও টেলপ্ প্রচার, পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, লিফলেট প্রকাশনা ও বিতরণ। মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, র‍্যালি, ভিজিলেন্স টিমের মাধ্যমে কারেন্ট জাল আটক ও শাস্তি প্রদান, হাট-বাজার, মাছের ঘাট, আড়ৎ ইত্যাদি পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করা ইত্যাদি। তাছাড়া জাটকা নিধনের সঙ্গে যুক্ত মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শুধুমাত্র ২০০৯-১০ অর্থবছরেই ১,০৭,৯৩৫টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি (যা এর আগের সরকারের সময়ে মাত্র ১০ কেজি ছিল) করে খাদ্যশস্য সহায়তা দেয়া হয়েছে, বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে ৪,৩৭৫ জনকে প্রশিক্ষণসহ উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। জাটকা নিধন রোধকল্পে ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সময়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ-

কার্যক্রম	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০
অভিযান	৩৩৪০ টি	৪১৩১ টি
জাটকা আটক	২২৭.৯১ মে. টন	২৫৪.৯৭ মে. টন
আটককৃত অবৈধ জাল	৮০৩.৪৫ লক্ষ মিটার	৯২২.৯৪ লক্ষ মিটার
দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	৪৭ টি	৭৭ টি
জরিমানা	২.১৩ লক্ষ টাকা	১৩.৮১ লক্ষ টাকা
আটককৃত জাটকা ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিলামে বিক্রি	৫৯.৩৭ লক্ষ টাকা	৯৬.১০ লক্ষ টাকা

উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যেই ইলিশ উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন কারণেই ইতোমধ্যেই এর সুফল দেখা দিতে শুরু করেছে। ইলিশ উৎপাদন ২০০২-০৩ অর্থবছরে ১.৯৯ লক্ষ মে. টনের স্থলে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২.৯৯ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। জাটকা নিধন কর্মসূচি পালনের ফলে প্রজননক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ ইলিশ এবার ডিম ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে, ইলিশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে, বাজারে ইলিশের প্রাপ্যতা আগের তুলনায় বেড়েছে এবং জাটকা মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় মূল প্রকল্প চালু

চিত্র ঃ মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে গরু বিতরণ করছেন

আছে এবং কর্মসূচির আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে (২০১০-১১ থেকে ২০১২-১৩ সময়ে) তিন বছরে ৯ কোটি এবং জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচির আওতায় ২০১০-১১ থেকে ২০১২-১৩ বছর সময়ের জন্য ১২ কোটি টাকার আরও ১টি কর্মসূচি প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগে বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী 'ভিশন-২০২১' এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে 'একটি বাড়ী একটি খামার' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে ভিশন-২০২১ কে সামনে রেখে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যের পাশাপাশি প্রোটিনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৩৫ লক্ষ মে.টন ও ২০২১ সালের মধ্যে ৪১.৩৯ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ভিশনকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ২০০৯-২০১২ সময়ে ৬.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্যসেবা জোরদারকরণ' শীর্ষক একটি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে আমিষ খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জন (food security), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে টেকসই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা সর্বোপরি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আশা করা হচ্ছে যে, মানুষ মৎস্য চাষ ও গবেষণা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হবে এবং জাতীয় অগ্রগতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

জাটকা নিধন রোধ কার্যক্রমে জনসচেতনতা

সরকার কর্তৃক জাটকা ইলিশ নিধন রোধকল্পে গৃহীত কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। কারণ বর্তমান সরকারের যথেষ্ট আন্তরিকতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জাটকা নিধন পুরোপুরি ঠেকানো যায়নি এবং সেভাবে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি দৃশ্যমান হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবী, আড়তদার, পাইকার, মহাজন, খুচরা ব্যবসায়ী এবং সকল শ্রেণী পেশার আপামর জনগণ জাটকা নিধনের কুফল সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাটকা নিধন রোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। একদিকে যেমন জাটকা নিধন এবং বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে, অন্যদিকে সাধারণ ভোক্তাকেও নিরুৎসাহিত করতে হবে যেন জাটকা ক্রয় না করে। এ কাজগুলো করতে হলে শুধু মৎস্য সপ্তাহ পালন বা প্রকল্প বাস্তবায়নই যথেষ্ট নয় বরং সাধারণ মানুষকে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করানোর নিমিত্ত সচেতন করে তুলতে হবে এবং একই সঙ্গে জনগণকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে অন্যথায় জাটকা নিধন পুরোপুরি রোধ অত্যন্ত দুরূহ হবে।

ইলিশ সম্পদ রক্ষায় করণীয়

জাটকা নিধন ও এর কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও প্রপাগান্ডা করা; জাটকা রক্ষার প্রচারণা কার্যক্রম, যেমন- পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট, বিজ্ঞাপন, টিভি স্পট, নাটিকা, টিভি ফিলার, টেল্‌প, বেতার জিঙ্গেল, বেতার কথিকা, নাটিকা ইত্যাদি শুধুমাত্র মৎস্য সপ্তাহ বা বিশেষ বিশেষ সময়ে সীমাবদ্ধ না রেখে সারাবছর অব্যাহতভাবে প্রচার চালিয়ে যেতে হবে; বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনকে কমপক্ষে প্রতিদিন একবার করে হলেও এ বিষয়ে এক বা একাধিক প্রচারণা চালানোর জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে; প্রয়োজনে বেতার ও টিভিকে এর জন্য কিছু অর্থ দেয়া যেতে পারে; অভয়াশ্রমসমূহে প্রায় সারাবছরই অভিযান চালিয়ে আইনের কঠোর প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে; অভয়াশ্রম এলাকাসহ জাটকা রক্ষায় ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি জাটকা নিধন অভিযানে এলাকার জনপ্রতিনিধিগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে; অর্থাৎ অভিযানের সময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান অথবা ইউপি সদস্যগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে এর সুফল অনেক বেশি পাওয়া যাবে; জাটকা ক্রয়-বিক্রয়ের হাট/আড়ত/মোকাম এবং ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় বড় শহরে মাঝে মাঝে ভেজাল বিরোধী অভিযানের মত জাটকা বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন; এ ধরনের অভিযানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের ৫/৭ জন কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে; মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রণালয়ের সচিব, মচাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য বিজ্ঞানীগণের সমন্বয়ে প্রায়শ বিটিভিসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলের টক শোতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

দেশের মূল্যবান সম্পদ ইলিশকে রক্ষার জন্য জাটকা নিধন রোধের কোন বিকল্প নেই। তবে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ, স্বল্পকালীন বিকল্প কর্মসংস্থান এবং সীমিত আকারে জনসচেতনতার মাধ্যমে এর পূর্ণাঙ্গ সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। জাটকা ইলিশ আহরণের সঙ্গে যুক্ত মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগোষ্ঠীকে পুরোমাত্রায় সচেতন এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীকে সম্পৃক্ত করা খুবই জরুরি। এ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে অর্থাৎ জাতীয় ইস্যুতে রূপান্তর এবং জাটকা নিধন রোধে একটি গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বস্তরের জনগণকে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সময় পেণ করার আর কোন অবকাশ নেই। জাটকা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদের ব্যাপক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রমকে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপনের জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

হাওর অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

তপন কুমার পাল[১]
এম এম মাহবুব আলম[২]

বৈচিত্র্যময় জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। এ দেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর-দীঘি, নদ-নদী, খাল- বিল, বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। এছাড়াও আছে প্রাকৃতিক ও জীববৈচিত্র্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক জলজ সম্পদ- হাওর। হাওর হচ্ছে বিশাল পিরিচাকৃতির (Saucer-shaped) এক নিম্ন-প্লাবনভূমি অঞ্চল। হাওরের অন্যতম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্লাবনভূমির তুলনায় এ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিচু ও ব্যাপক বিস্তৃত। সাধারণত দু'টি বৃহৎ নদীর অন্তর্বর্তী উপত্যকা অঞ্চলটিই হাওর। হাওর বেসিনে নদী, উপ-নদী, শাখা নদী, খাল ইত্যাদি জালের ন্যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এবং এরই মাঝে মাঝে আরো অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা থাকে যাকে বলা হয় বিল। একটি হাওর বেসিনে একাধিক বিল থাকতে পারে। বর্ষাকালে পুরো হাওর বেসিন প্লাবিত হয়ে একটি বিশাল একক জলাশয়ে পরিণত হয়ে থাকে। বর্তমানে এরূপ অবস্থা বছরের প্রায় ৬ থেকে ৮ মাস বিরাজমান থাকে। আবার শুষ্ক মৌসুমে হাওর বেসিনের পানি সরে গিয়ে বড় নদী বা শাখা নদী বা খাল-বিলে জমে থাকে। হাওরের শুষ্ক হয়ে যাওয়া বাকী এলাকায় সাধারণত মৌসুমি শস্য আবাদ হয়ে থাকে। হাওর অঞ্চলের এ ধরনের একফসলী জমির প্রধান ফসল হলো বোরো ধান।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার প্রায় ২৫ শতাংশ এলাকা জুড়ে হাওর বিস্তৃত। এদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৪১১টি হাওর রয়েছে, যার বিস্তৃতি প্রায় ৮ হাজার বর্গ কিমি। বাংলাদেশের হাওর অধ্যুষিত প্রধান জেলাগুলো হলো সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা। এছাড়াও হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কিছু কিছু অংশ হাওর এলাকা হিসেবে সুপরিচিত। কাজেই বলা যায় দেশের সর্বমোট সাতটি জেলায় হাওর অঞ্চল বিস্তৃত।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, হাওর বেসিনের জলজ জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেজন্য এ অঞ্চলকে বলা হয় দেশের মৎস্যসম্পদের সূতিকাগার (Mother fishery)। বহু দেশীয় প্রজাতির মাছের আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র এই হাওর বেসিন। প্রজনন মৌসুমে হাওরে উৎপাদিত নানা প্রজাতির মাছের পোনা একটু বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলাশয়ে। হাওর অঞ্চল একসময় বিখ্যাত ছিল জিওল মাছের (কই, মাগুর, শিং প্রভৃতি) আবাসস্থল হিসেবে। শুষ্ক মৌসুমে হাওর বেসিনের অন্তর্গত বিলসমূহ পরিণত হয় দেশীয় মাছের আবাস ও বেড়ে ওঠার নিরাপদ স্থানে। হাওর বেসিনের অসংখ্য খাল-বিলের শামুক ও গুগলি আহরণ হাওর তীরবর্তী দরিদ্র জনসাধারণের আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। হিজল, তমাল ও করচ জাতীয় গাছ-গাছালিসহ নানা ধরনের উদ্ভিদ হাওর এলাকায় পাওয়া যায়। তাছাড়া গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত ছন, বাঁশ ও জলজ গুল্মও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া হয়। হাওরের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিভ্রমণকারী বা অতিথি পাখির উপস্থিতি। প্রতি বছর শীত মৌসুমে প্রায় ১৪০ প্রজাতির অতিথি পাখির আগমন ঘটে এই হাওর অঞ্চলে।

চিত্রঃ হালালুকি হাওরে অতিথি পাখি

জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অনন্য এ হাওর অঞ্চলের সেই অতীত আজ আর নেই বললেই চলে। বিরূপ প্রকৃতি আর অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে হাওরগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে এর অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। হাওর অঞ্চলের এ দৈন্যদশা কাটিয়ে ওঠার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল এ দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী, তাদের জীবন-জীবিকার একটা বিরাট অংশ পূরণ হয় হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা। কারও কারও ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত মৎস্যসম্পদ। বলা যায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় সব শ্রেণীর মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সকল শ্রেণী/জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রধান প্রধান সম্পদ আহরণকারী জনগোষ্ঠীগুলো হলো মৎস্যজীবী, কৃষক, অন্যান্য জলজ সম্পদ আহরণকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নৌযান শ্রমিক ইত্যাদি। একইভাবে হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/মন্ত্রণালয়, যেমন- মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও

১ কর্মসূচি সমন্বয়কারী পরিচালক, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, মৎস্য অধিদপ্তর
২ উপ-সহকারী পরিচালক, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, মৎস্য অধিদপ্তর

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভুমি মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এর পাশাপাশি হাওর উন্নয়নে বেসরকারি সংগঠনের সম্পৃক্ততাও সমভাবে আবশ্যক। হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। হাওরের মৎস্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সমন্বিত পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং ধাপে ধাপে এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক. স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নকাল এক থেকে তিন বছর মেয়াদী হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে মূলত ইজারা ও মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ক নীতিমালা সম্পর্কিত দলিলাদি প্রণয়ন, সংশোধন বা পরিমার্জন; হাওরের বর্তমান অবস্থা জরিপ; হাওর অঞ্চলের অবিকৃত প্রাকৃতিক অবস্থা হতে এর কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিরূপণ এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কী কী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান উৎপাদন অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান নিরূপণ ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচির অপর একটি অন্যতম কার্যক্রম হলো ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে হাওর অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর ভেতর গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের উৎসাহিত ও সংগঠিতকরণ। এছাড়াও মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণকল্পে কার্যকরভাবে মৎস্য আইনের বাস্তবায়ন স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচি কর্মপরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে যে সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তা নিম্নরূপঃ

১. নীতিনির্ধারণী দলিলাদি প্রণয়ন, অথবা অনুরূপ চলমান দলিলাদি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগীকরণ;
২. হাওর উন্নয়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে আন্তঃসমন্বয় স্থাপন করার লক্ষ্যে পদ্ধতিগত উন্নয়ন;
৩. হাওর উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান ও বাস্তবায়ন;
৪. হাওরের অবিকৃত প্রাকৃতিক অবস্থার হালনাগাদ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ;
৫. হাওরের মৎস্য সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার সমীক্ষা পরিচালনা;
৬. হাওরের মৎস্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম নিরূপণ;
৭. হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর পেশা ও অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় চিহ্নিতকরণ;
৮. হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রচার/প্রচারণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ;
৯. মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
১০. সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নকল্পে সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি;
১১. জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন;
১২. হাওর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৩. হাওর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির প্রয়োগ; এবং
১৪. জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বিশেষ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ।

খ. মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন মেয়াদ তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু কার্যক্রমের পরবর্তী পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন- প্রচার-প্রচারণা, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, সমাজভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চিহ্নিত জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার অন্যান্য বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ হবে নিম্নরূপঃ

১. হাওর সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের মৎস্য বিভাগীয় মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
২. গঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনসমূহের অনুকূলে হাওরের বিলসমূহ ইজারার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে ন্যস্তকরণ;
৩. হাওর অঞ্চলের সেচ অবকাঠামোসমূহ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নবান্ধব করণ;
৪. হাওর অঞ্চলে প্রচলিত স্লুইস গেইটে ফিসিং রোধ করা;
৫. উন্নত পাইল ফিসারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন;
৬. হাওর বেসিনের অন্তর্গত উপযোগী বিলে বিল নার্সারি স্থাপন;
৭. মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার;
৮. নির্বাচিত বিলে পোনা মজুদকরণ;
৯. জলজ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১০. হাওর অঞ্চলের উপযোগী জলাশয়ে খাঁচায় মৎস্যচাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ।

মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি বাস্তবায়ন শুরু করা যেতে পারে।

গ. দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ পাঁচ থেকে দশ বছর

মেয়াদী হতে পারে। এ পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ টেকসইভাবে চলমান রাখা হবে। বিশেষ করে হাওর বেসিনের সকল বিলে স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা এ মেয়াদে পূর্ণ করা হবে। এছাড়া চলমান কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

১. চলমান হাওর মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধিত কার্যক্রম প্রবর্তন;
২. সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা;
৪. বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির সম্প্রসারণ;
৫. নিয়মিত জরিপ, সমীক্ষা ও গবেষণা।

হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের এক অবহেলিত জনপদ- উন্নয়ন যেখানে সুদূর পরাহত। কখনও আগাম বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় ক্ষেতের ফসল, কখনোবা অনাবৃষ্টিতে ধানের ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন। তাইতো, সে অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা বহুলাংশে নির্ভর করছে প্রাকৃতিক উৎস থেকে মৎস্য আহরণ, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য ব্যবস্থার উপর। মৎস্য অধিদপ্তর গত ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি শীর্ষক এক নিবিড় কার্যক্রম হাওর অধ্যুষিত সাতটি জেলা (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা)-র সকল উপজেলায় (৬৯টি) তিন বছর মেয়াদে গ্রহণ করে। হাওর অঞ্চলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, আপামর জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তথা সার্বিকভাবে হাওরের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে হাওর কর্মসূচির আওতায় নিম্নলিখিত প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রসরমান রয়েছে।

১. জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ

জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট জেলার মৎস্য অধিদপ্তরের সকল কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নিয়ে কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মতবিনিময়ের একটি অন্যতম মাধ্যম। এর ফলে হাওর অঞ্চলে মৎস্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির কার্যক্রমকে অধিকতর বেগবান ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধ্যান-ধারণা সুপারিশমালা আকারে পেশ করার সুযোগ পাচ্ছে, যা কর্মসূচির পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এই ধরনের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি জেলায় কর্মসূচির মেয়াদকালে পাঁচটি করে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাওর এলাকায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ হবেন অনেক বেশি দক্ষ ও কর্মঠ।

চিত্র ঃ জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ

২. উদ্বুদ্ধকরণ সভা/সমাবেশ

উদ্বুদ্ধকরণ সভা/সমাবেশ-এর মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকল সুফলভোগীদের স্থানীয় মৎস্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসূচির আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়ন বিষয়ে সচেতন করে তোলার একটি প্রচেষ্টা। স্থানীয় জনসাধারণকে আরও বেশি দায়িত্বশীল ও সচেতন করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/সমাবেশ সুফলভোগী এলাকায় একটি সফল কার্যক্রম হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা এ সভায় অংশ নিচ্ছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যা মৎস্যজীবীদের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাচ্ছে। এ ধরনের সভা/সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি এলাকায় কর্মসূচি মেয়াদকালীন সময়ে প্রায় ১০ হাজার মৎস্যজীবী/সুফলভোগীকে সচেতন করা হবে।

চিত্র ঃ উপজেলা পর্যায়ে জনসাধারণ উদ্বুদ্ধকরণ সভা

৩. হাওর অঞ্চলে বিল নার্সারি স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্লাবনভূমি, খাল-বিল ও নদীতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন তথা হাওর এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপনের উদ্যোগ হাতে

নেওয়া হয়েছে। এ সকল উপযোগী বিলে এক থেকে দুই হেক্টর আয়তনের বিল নার্সারি স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এসব বিল নার্সারিতে মূলত দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের রেণু মজুদের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিল নার্সারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচি মেয়াদকালে বিল পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ১০ হাজার মৎস্যজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে তিন দিন মেয়াদী এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিল নার্সারি প্রস্তুতি থেকে বিলে পোনা অবমুক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সকল দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ফলে মৎস্যজীবীরা এ বিষয়ে হচ্ছে অনেক বেশি কর্মদক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী। এ প্রশিক্ষণের ফলে মৎস্যজীবীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সংগঠিত হচ্ছে বিল নার্সারি কার্যক্রমকে সফল করার জন্য।

৪. নির্বাচিত হাওরে অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আইইউসিএন (২০০৩) এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়। হাওর অঞ্চলে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও বিলুপ্তপ্রায় মৎস্যকূলকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি সাতটি জেলার প্রতিটিতে দু'টি করে উপযোগী জলাশয়ের ৫ থেকে ১০ শতাংশ জলায়তনে মোট ১৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করবে। এই কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় মৎস্যজীবীদের নিয়ে গঠন করা হচ্ছে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রমের সঠিক বাস্তবায়ন ও মৎস্যজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাওর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে অভয়াশ্রম স্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এ লক্ষ্যে কর্মসূচি মেয়াদে প্রায় ১২ হাজার মৎস্যজীবীকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তিন দিন মেয়াদী এই প্রশিক্ষণের ফলে মৎস্যজীবীরা মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের গুরুত্ব অনুধাবনের পাশাপাশি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের সকল দিক ও তার রক্ষণাবেক্ষণে করণীয় নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। মৎস্যজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হওয়ায় মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

৫. মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মৎস্যজীবীরা শুধুমাত্র হাওরকে মৎস্য আহরণের একমাত্র ক্ষেত্র ও তাঁদের জীবন-জীবিকার অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচনা করলে হাওরে মাছের অতি আহরণ বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব বলেই অভিজ্ঞ মহল মনে করে। এজন্য তাঁদেরকে মৎস্য আহরণের পাশাপাশি অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কাজ যেমন- কার্প জাতীয় মাছের পোনা প্রতিপালন, স্থানীয় পর্যায়ে পোনার ব্যবসা, খাঁচায় মাছ চাষ, হাঁস প্রতিপালন, মাছ ধরার উপকরণ তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হলে মাছ আহরণের উপর চাপ অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চলমান এ হাওর কর্মসূচি এর মেয়াদকালে প্রায় ১২ হাজার মৎস্যজীবীকে দু'দিন মেয়াদে বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৬. পোনা অবমুক্তকরণ

মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে হাওরগুলোতে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ক্রমাগতভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাছের প্রজনন ক্ষেত্রগুলো, ফলে মাছের পর্যাপ্ত প্রবেশন সম্ভব হচ্ছে না। তাই হাওর অঞ্চলের জলাশয়গুলোতে মাছের পর্যাপ্ত মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম। আশা করা যায় এ কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের ফলে হাওর এলাকায় দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের প্রাচুর্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

৭. হাওর এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়ন

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে মাছের চাহিদা। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণিজ আমিষের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মাছের দামও। ফলে মৎস্যজীবীরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় নির্বিচারে ধরছে মাছ, এমনকি ধরছে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ, ব্যবহার করছে নিষিদ্ধ জাল ও সরঞ্জাম। ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে হাওর কর্মসূচি হাওর এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নের উপর জোর দিচ্ছে। তাছাড়া হাওর অঞ্চলের মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রবাহের অংশ হিসেবে ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারেরও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

উপসংহার

হাওর অঞ্চলে চলমান এই কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপজেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, প্রচারমাধ্যম কর্মী ও মৎস্যজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। হাওর কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অনেকাংশেই সম্ভব হবে, নিশ্চিত হবে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা তথা জীবনমানের উন্নয়ন - এটাই সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা।

কাপ্তাই হ্রদ - অপার মৎস্য সম্পদের আধার

কমান্ডার জাহিরুল আলিম[১]
এ কে এম আজাদ রহমান[২]

কাপ্তাই হ্রদ আমাদের দেশ এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি অন্যতম বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এর বিস্তৃতি প্রায় ৫৮,৩০০ হেক্টর। মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীর উপর ১৯৬১ সালে বাঁধ নির্মাণের ফলে সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে মিঠাপানির মাছের উৎপাদন, নৌপথ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে এ হ্রদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের একক জলাশয় হিসেবে সর্বোচ্চ মৎস্য উৎপাদন কাপ্তাই হ্রদ থেকেই আসে। ইংরেজি 'H' আকৃতির এই হ্রদটি একটি সরু ক্যানেলের মাধ্যমে শুভলং নামক স্থানে পুরাতন কর্ণফুলী নদীর অববাহিকায় মিলিত হয়েছে। হ্রদের ডানবাহুটি কর্ণফুলী ও কাচালং নদীর প্রবাহ দিয়ে কাচালং চ্যানেল এবং বামবাহুটি চেঙ্গি ও রিয়ংখং নদী মিলিত হয়ে রিয়ংখং চ্যানেল দিয়ে গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল কৃত্রিম হ্রদের ন্যায় মূল পরিকল্পনায় এ হ্রদটির মৎস্য সম্পদের কথা বিবেচনায় আনা হয়নি। ফলে হ্রদে নিমজ্জিত গাছের গুড়ি এখনও মৎস্য আহরণে ও নৌ চলাচলের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রাথমিকভাবে হ্রদের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও ক্রমান্বয়ে হ্রদের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবিকার প্রাণ হয়ে উঠেছে এই কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য সম্পদ। পাহাড়ি জনগণের দৈহিক গড় উচ্চতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাপ্তাই হ্রদ একটি অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

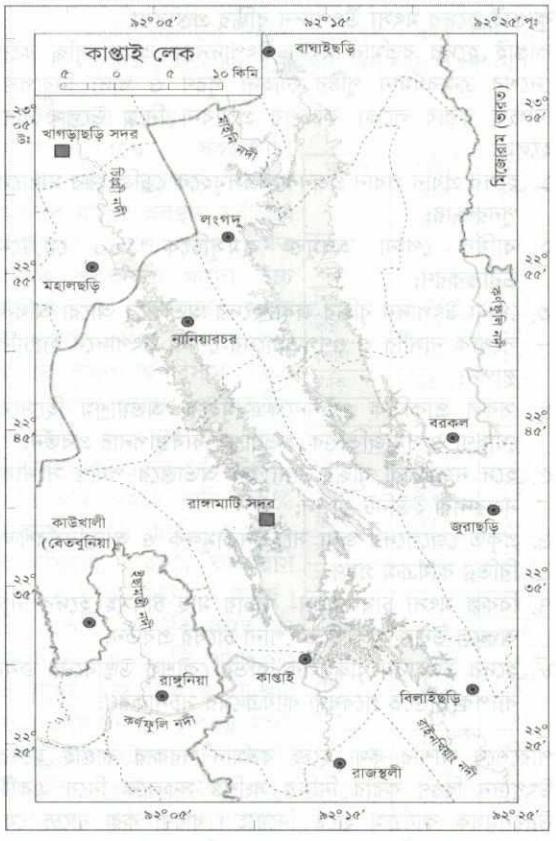

চিত্রঃ কাপ্তাই লেকের মানচিত্র

কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য সম্পদ

কাপ্তাই হ্রদে বর্তমানে প্রায় ৭২ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ ও চিংড়ির মধ্যে ৬৭টি দেশীয় প্রজাতি এবং ৫টি বিদেশি প্রজাতির মাছ রয়েছে। এ সকল প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৩৬ প্রজাতির মাছ বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আহরিত মাছ পাহাড়ি এলাকার স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সারাদেশে ও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশীয় বিপন্নপ্রায় বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আইড়, কালিবাউস, বাচা ও পাবদা মাছ এখনও কাপ্তাই হ্রদে পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতিবছর প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এ সকল মাছের অস্তিত্ব রক্ষায় ২০০৮ সালে প্রায় ১৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন মৎস্য অভয়াশ্রম। ১৯৬৫-৬৬ সালে কাপ্তাই হ্রদের বার্ষিক উৎপাদন ৪৫০ মে.টন ছিল যা ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪৩০৬ মে.টনে উন্নীত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ২০০৯-১০ সালে ৮৫০০ মে.টনে এসে দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার অত্যন্ত চমৎকার হলেও দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে হ্রদের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধি করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় আদিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অতি দ্রুত এ লেকের মৎস্য সম্পদ তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আজ লেকের তীরবর্তী

চিত্রঃ কাপ্তাই লেক

১ ট্যাজ, পিএসসি, বিএফডিসি, রাঙ্গামাটি
২ বিএফডিসি, রাঙ্গামাটি

খাদ্য তালিকায় মাছের ঐতিহ্য

মাছ-ভাত বাঙালির আবহমানকালের সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সভ্যতা লালিত আমাদের এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের আদি অধিবাসী আদি-অস্ট্রালয়েডরা প্রধান খাদ্য হিসেবে মাছ গ্রহণ করেছিল। বাঙালির মৎস্যপ্রীতির উল্লেখ আছে বেশ কিছু ধ্রুপদী সাহিত্যে। প্রাচীন সাহিত্য 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' লেখা হয়েছে, 'যে স্ত্রীলোক প্রতিদিন তাঁর স্বামীকে মৌরলা মাছের ঝোল খাওয়ান, সে স্বামী হয় পূণ্যবান বা ভাগ্যবান'। বাঙালি শাস্ত্রকার ভগদেবভট্র এগারো শতকে লিখেছেন, মাছ খাওয়া শরীরের জন্য অশেষ হিতকর। অনেক টীকাকার মাছের তেলের অনেক গুণের কথা তাঁদের লেখায় উপস্থাপন করেছেন। কেউ কেউ শুটকি মাছের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন, বিশেষ করে নিম্নবঙ্গে লোকদের এ মাছ খুবই প্রিয় ছিল। অষ্টম-নবম শতকের পাহাড়পুর ও ময়নামতি বৌদ্ধবিহারের অনেক পোড়ামাটির ফলকে মাছ কোটা, ঝুড়িতে মাছ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য আছে। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাঙালির অন্যতম ব্যঞ্জন হিসেবে মৎস্যরন্ধনের চমৎকার বর্ণনা করেছেন; 'কৈ ভাজে গণ্ডাদশ মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে'। যুগসন্ধিক্ষণের রসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন 'ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল'। উল্লিখিত পংক্তি ও উপাত্তসমূহ মাছের প্রয়োজনীয়তা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

ছোট মাছের বর্তমান অবস্থা

কৃষিখাতে সবুজ বিপ্লব শুরুর পূর্বে আমাদের প্রাকৃতিক জলাশয় তথা- খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা-নালায় ছোট বড় সব মাছের যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে ছোট মাছের বৈচিত্র্যময় এ বিপুল ভাণ্ডারের অনেক প্রজাতিই আজ চরমভাবে বিপন্ন ও বিলুপ্তির পথে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে স্বাদুপানির বিপন্ন ৫৪টি প্রজাতির মাছের মধ্যে ৩টি ছোট মাছ হিসেবে বিবেচিত; এর মধ্যে ৫টি চরম বিপন্ন, ১৮টি বিপন্ন ও ৯টি সঙ্কটাপন্ন। অপরিকল্পিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, খাল-বিল ভরাট করা, কলকারখানার বর্জ্য নদ-নদী ও প্লাবনভূমিতে নিষ্কাসন, জলাশয়ের অবক্ষয়, কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, অতিরিক্ত ও অপরিমিত পানি ব্যবহার, পানি দূষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতি আহরণ ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তির পথে।

The international Union for the Conservation of Nature (IUCN) কর্তৃক ২০০৩ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় আমাদের দেশে ৫৪টি প্রজাতির মাছকে বিলুপ্তপ্রায় ঘোষণা করা হয়। উল্লিখিত ৫৪টি প্রজাতির মধ্যে ৩২টি ছোট প্রজাতির মাছ।

সারণি ঃ বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় ছোট মৎস্য প্রজাতির তালিকা

ক্র. নং	মাছের নাম	মাছের ছবি	আবাসস্থল	বর্তমান অবস্থা
১.	ভাঙন/ভাঙন বাটা *Labeo boga*		সব নদী	মহাবিপন্ন
২.	ঘোড়া মুইখ্যা/ঘোড়া মাছ *Labeo pangusia*		সব নদী	মহাবিপন্ন
৩.	সরপুঁটি/স্বর্ণ পুঁটি *Puntius sarana*	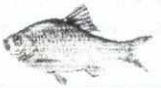	সব জলাশয়	মহাবিপন্ন
৪.	বাচা *Eutropiichthys vhacha*		সব জলাশয়	মহাবিপন্ন
৫.	সিসর/চেনুয়া *Sisor rhabdophorus*		উত্তরাঞ্চলের নদীসমূহ	মহাবিপন্ন
৬.	জয়া/হিরালু *Barilius bendelisis*	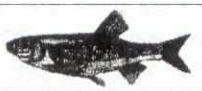	উত্তরাঞ্চলের নদীসমূহ	বিপন্ন
৭.	খোকশা *Barilius vagra*		দিনাজপুরের নদী	বিপন্ন
৮.	এলং/সেফাটিয়া *Bengala elanga*		সব নদী	বিপন্ন
৯.	কালা বাটা *Crossocheilus latius*	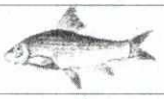	নদী ও মোহনা	বিপন্ন
১০.	ভাঙন বাটা/বাটা *Labeo bata*		সব নদী	বিপন্ন
১১.	বোল *Raiamas bola*		সব নদী	বিপন্ন
১২.	দারকিনা *Rasbora rasbora*		সব জলাশয়	বিপন্ন
১৩.	রাণী *Botia dario*		সব জলাশয়	বিপন্ন
১৪.	রাণী/পুতুল/বেটি Botia *lohachata Chaudhuri*	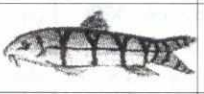	সব নদী	বিপন্ন
১৫.	কানি পাবদা/বোয়ালি পাবদা *Ompok bimaculatus*		সব জলাশয়	বিপন্ন
১৬.	মধু পাবদা *Ompok pabda*		সব জলাশয়	বিপন্ন
১৭.	পাবদা *Ompod pabo*		সব জলাশয়	বিপন্ন

১৮.	চেকা/চেগা *Chaca chaca*		সব জলাশয়	বিপন্ন
১৯.	এক ঠোটা *Dermogenys pesillus*		কর্ণফুলি নদী	বিপন্ন
২০.	কোটা কুমিরের খিল *Microphis deocata*		উত্তরাঞ্চলের নদী	বিপন্ন
২১.	নাপিত কৈ/কৈ বানদী *Badis badis*		সব জলাশয়	বিপন্ন
২২.	নেফতানি *Ctenops nobilis*		সব জলাশয়	বিপন্ন
২৩.	কাশ খয়রা *Chela laubuca*		সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন
২৪.	টাটকিনি/ ভাংনা *Cirrhinus reba*		সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন
২৫.	তিতপুঁটি *Puntius ticto*	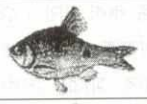	সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন
২৬.	গুলশা/গুলশা টেংরা *Mysthus cavasius*		সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন
২৭.	কাজলি/বাঁশ পাতা *Ailia punctata*	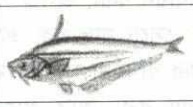	সব নদী	সঙ্কটাপন্ন
২৮.	চান্দা/নামা চান্দা *Chanda nama*	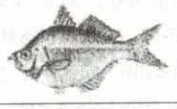	সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন
২৯.	রাঙা চান্দা/লাল চান্দা *Pseudambasis ranga*		সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন
৩০.	মেনি/ভেদা/রয়না *Nandus nandus*		সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন
৩১.	তেলো টাকি/রাগা/চ্যাঙ/গাচুয়া *Channa orientalis*		হাওড়, বাওড়, বিল	সঙ্কটাপন্ন
৩২.	তারা বাইম *Macrognathus aculeatus*		সব জলাশয়	সঙ্কটাপন্ন

সূত্রঃ IUCN, ২০০৩

বর্তমানে (২০০৮-০৯ অর্থবছরে) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের মোট উৎপাদন প্রায় ২১.৮৭ লক্ষ মে.টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন প্রায় ১১.২৪ মে.টন (মোট অভ্যন্তরীণের প্রায় ৫১.৪%). এসকল উৎপাদনে ছোট মাছের কী অবস্থান তা জানা খুবই প্রয়োজন। বিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়। সারা দেশে বিলে মাছের মোট উৎপাদন প্রায় ৭৯২০০ মে.টন।

গোল্লাপাড়া মাছের বাজার রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তানোর উপজেলা সদরে অবস্থিত একটি বাজার। বাজারের পার্শ্বের বিল কুমারী বিল এবং চারপার্শ্বের গ্রামের অধিকাংশ মাছই এ বাজারের মাধ্যমে কেনাবেচা হয়ে থাকে। এবাজারে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাছের সরবরাহ, পরিমাণ ও বাজারজাতকরণের উপর এক নিবিড় গবেষণা করা হয় যার ফলাফল নিম্নরূপঃ

সারণী ঃ গোল্লাপাড়া বাজারে ২০০৭ সালে সরবরাহকৃত মাছের মধ্যে ছোট মাছের অবস্থান

সময়	মাছের সরবরাহ			
	বড়মাছ (মে.টন)	ছোটমাছ (মে.টন)	মোট (মে.টন)	ছোট মাছের সরবরাহ হার (%)
জানুয়ারি	২৯.৪১৫	২৫.৭৮৫	৫৫.২	৪৬.৭১২
ফেব্রুয়ারি	৩.৭৩৬	২.৫৪	৬.২৭৬	৪০.৪৭১৬
মার্চ	২.২৯	২.০১	৪.৩	৪৬.৭৪৪২
এপ্রিল	২	১.৮	৩.৮	৪৭.৩৬৮৪
মে	১.৯৪	২.৮	৪.৭৪	৫৯.০৭১৭
জুন	২.৪	১.৮	৪.২	৪২.৮৫৭১
জুলাই	২.০৩	১.৯	৩.৯৩	৪৮.৩৪৬১
আগস্ট	২.২৮	২.৮৪	৫.১২	৫৫.৪৬৮৮
সেপ্টেম্বর	১০.৪৩	২৭.০১	৩৭.৪৪	৭২.১৪২১
অক্টোবর	৩০.৫২	৪০.০৪	৭০.৫৬	৫৬.৭৪৬
নভেম্বর	৩৯.৬৭	৩৭.২৬	৭৬.৯৩	৪৮.৪৩৩৬
ডিসেম্বর	৪৩.৬১	৩১.৯৯	৭৫.৬	৪২.৩১৪৮
মোট	**১৭০.৩২**	**১৭৭.৭৮**	**৩৪৮.১**	**৫১.০৭০৭**

উপরের সারণিতে দেখা যায় গোল্লাপাড়া বাজারে মাছের সরবরাহ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি যা বাজারে বিল কুমারী বিলের প্রাধান্য নির্দেশ করে।

এছাড়াও বোঝা যাচ্ছে যে, বাজারে ছোট মাছের সরবরাহ বেশি। অবশ্য বিলের মাছ ও পুকুরের মাছের অনুপাত কিংবা ছোট মাছ ও বড় মাছের অনুপাত ব্যাপক উঠানামা করে। বিলের মাছ ধরার পিক সময়ে বাজারে মাছের সরবরাহ খুবই বেড়ে যায়, তখন বাজারে বিলের মাছের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, ছোট মাছ যেহেতু বিলেই বেশি থাকে পুকুরে খুবই কম সেহেতু বিলে মাছ ধরার শুরুর দিকে ছোট মাছের সরবরাহ সবচেয়ে বেশি থাকে। যদিও গোল্লাপাড়া বাজার দেশের সব মাছের বাজারের কিংবা বিল কুমারী বিল দেশের সব বিলের প্রতিনিধিত্ব করে না তবুও উল্লিখিত গবেষণার ফলাফল থেকে সারা দেশের ছোট মাছের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়া যায়।

বাঙালীর জীবনযাপনে ছোট মাছ

মাছ আমাদের জাতীয় জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাছ আমাদের দেশের অর্থনীতি, পুষ্টি ও কর্মসংস্থানে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। অতীতকালে ছোট মাছ শুধুমাত্র গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যতালিকায় ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটা এখন সব ধরনের জনগোষ্ঠীর খাদ্যতালিকায় পাওয়া যায়। তাই ছোট মাছের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যপকভাবে। পাবদা, দেশী মাগুর ইত্যাদি কিছু ছোট মাছের দাম অনেক বড় মাছের চেয়েও বেশি। আজকাল দামী ছোট মাছ ধনী এবং সস্তা ছোট মাছ দরিদ্র লোকের খাবার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য প্লাবনভূমি ও হাওড় এলাকায় বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সব ধরণের ছোট মাছই খেয়ে থাকে। ফ্যাপ-১৭ এর এক গৃহ জরিপে দেখা যায় যে, খাদ্য হিসেবে গৃহীত সকল প্রকার মাছের মধ্যে ছোট মাছের পরিমাণ ৪৩% যেখানে রুই জাতীয় মাছের পরিমাণ ১৩%। দেশের বহু লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যাদের অনেকেই অভ্যন্তরীণ মাছ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় কাজ করে। এদের কেউ ছোট মাছ উৎপাদন/ধরা, কেউ ব্যবসা করা, কেউ আড়তদার, কেউ মধ্যস্বত্বভোগী কেউ দিনমজুর আবার কেউ পরিবহনকারী।

ছোট মাছের সম্ভাবনা

এদেশে আদিকাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের পুষ্টির যোগান দিয়ে আসছিল। পরিবেশ বিপর্যয়সহ নানাবিধ কারণে ছোট মাছের অনেক জাত আজ বিলুপ্তির পথে এবং অন্যান্য মাছের মত ছোট মাছের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। তবু এখনও ছোট মাছের উৎপাদন ও এর জীব বৈচিত্র পূনরুদ্ধারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অধিকাংশ ছোট মাছ বছরে একাধিকবার প্রজনন করে, এরা খুব কম সময়ে প্রজননক্ষম হয়, প্রায় সব ধরণের জলাশয়ে ছোট মাছের চাষ করা যায়, কোন কোন ছোট মাছ কম অক্সিজেন ও বেশী তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়াও পুকুরে বড় মাছের সাথে ছোট মাছের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ আছে। তাই জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোট মাছের বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি ও রক্ষা করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। এছাড়া মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম তৈরির মাধ্যমেও ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সেই সাথে প্রয়োজন দুই ধরণের প্রচেষ্টা- সামাজিক সচেতনতা এবং গবেষণা করে ফিশিং গিয়ার ও তার মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে ছোট মাছের উৎপাদনে সহনশীলতা আনায়ন। এছাড়াও সকল প্রজাতির মাছকে এলাকাভিত্তিক নিবন্ধনের আওতায় এনে এবং তা নিয়মিত নবায়ন করা, জলজ পরিবেশের দূষণ যথাসম্ভব বন্ধ করা, পানি সেচে মাছ ধরা একেবারে বন্ধ করা, কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহার সহনীয় মাত্রায় আনা, প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ করা, অতি আহরণ না করা, খননের মাধ্যমে মাছের প্রজনন ও আবাসস্থল পূণরুদ্ধার করে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ছোট মাছের উৎপাদন ও জীব বৈচিত্র রক্ষা ও পূণরুদ্ধার করা যায়।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কর
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কর

ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ভূমিকা

মোঃ মিজানুর রহমান[১]
এস এম আশিকুর রহমান[২]

যশোর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে ষাটের দশকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পোল্ডার প্রকল্প বাস্তবায়নকালে টেকা নদীর কোল ঘেষে যশোর জেলার অভয়নগর, কেশবপুর, মনিরামপুর ও খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার সীমান্ত এলাকার ভবানীপুরের ভবদহ নামক স্থানে স্লুইস গেইট নির্মিত হয়। প্রথম দিকে উক্ত স্লুইস গেইট সুফল বয়ে আনলেও আশির দশকের শেষের দিকে গঙ্গা অববাহিকায় পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় এবং জোয়ারের পানিতে আসা অতিরিক্ত পলি স্লুইস গেইটের দু'পাশের পানি নির্গমনের চ্যানেলে জমা হওয়ায় নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে নব্বই দশকের প্রথম দিকে এ এলাকায় স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। স্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে ঐ এলাকার জনসাধারণ কৃষির পরিবর্তে মৎস্য আহরণ ও মৎস্যচাষকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে এবং এটি তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্র ঃ ভবদহ স্লুইস গেইট

ভবদহ এলাকার ২৭টি ছোট বড় বিল ও প্লাবনভূমির মোট আয়তন প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর, যেখানে স্থানীয় মৎস্যজীবীগণ দেশীয় অনেক প্রজাতির মাছ প্রতিদিন আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু দেশীয় প্রজাতির মাছের অতিরিক্ত আহরণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ নিধন, কারেন্ট জালের ব্যবহার, বিলের মধ্যে ঘের তৈরি, সংযোগ খাল ভরাট করে মাছের অভিপ্রয়াণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, মাছের চলাচলের পথে আড়াআড়িভাবে পাটা জাল দিয়ে মাছ আহরণ করা, কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকের অপরিকল্পিত ব্যবহার, ইত্যাদি কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তির পথে। এ সকল বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে অচিরেই হারিয়ে যাবে চিরপরিচিত ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আমিষ সরবরাহের প্রধান উৎস দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ।

চিত্র ঃ ভবদহ এলাকায় নির্মিত মৎস্য অভয়াশ্রম

জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ভবদহ এলাকার বিস্তীর্ণ এই প্লাবনভূমিকে দেশীয় প্রজাতির মাছের বিশাল ভাণ্ডার রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। মৎস্য অধিদপ্তর ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ভবদহ এলাকার সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত আন্তরিক ও উদ্যোগী। তারই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রকল্পটি অনুমোদন করে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর পাঁচ বছর মেয়াদে (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ খ্রি.) যশোর জেলার ৪টি উপজেলায় (যশোর সদর, অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুর) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ভবদহ অঞ্চলের ১১টি বিলের ১২,০০০ হেক্টর জলায়তনে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি (১০০০ কেজি/হেক্টর) এবং দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
- স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে উক্ত জলাশয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ জীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- প্রকল্প এলাকার নারীদের মৎস্যচাষ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তাদের অবস্থার উন্নয়ন এবং অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক

১ প্রকল্প পরিচালক, যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
২ সহকারী পরিচালক, যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

কাজে সহায়তা প্রদান করা।

- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।
- মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের (SIS) বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা।

চিত্র ঃ মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের কার্যক্রম

- প্রকল্পের আওতায় মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের ৭০টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) মোট ১৭৫০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের ৩৫০টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) একদিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যচাষের ৪টি প্যাকেজের উপর প্রতিটি উপজেলায় ৩টি করে মোট ১২টি (৬.০০ হেক্টর) কার্প মিশ্র চাষ প্রদর্শনী, প্রতিটি উপজেলায় ৩টি করে মোট ১২টি (৬.০০ হেক্টর) চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী, প্রতিটি উপজেলায় ৩টি করে মোট ১২টি (৬.০০ হেক্টর) কার্প নার্সারি প্রদর্শনী এবং প্রতিটি উপজেলায় ৪টি করে মোট ১৬টি (৮.০০ হেক্টর) সমন্বিত মৎস্যচাষ প্রদর্শনী সর্বমোট ৫২টি (২৬.০০ হেক্টর) ফলাফল প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে।
- কমিউনিটি মবিলাইজেশন-এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ১৩১টি দল গঠন (২৬,২০০ জন) করা হবে, যারা প্রকল্পের অবমুক্ত পোনা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং পরবর্তীতে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সাধন করবেন। দল গঠনে ৩০ - ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৪টি উপজেলার ১১টি বিলে/জলাশয়ে ১২,০০০ হেক্টর জলায়তনে ৪-৬ ইঞ্চি আকারের (২৫ কেজি/হেক্টর) ৩.০০ লক্ষ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হবে।
- প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় বিভিন্ন জলাশয়ে ৩টি করে মোট ১২টি (৬.০০ হেক্টর) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট (SIS) মাছের বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় ৫.০০ হেক্টর বিল/খাল/নার্সারি পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করা হবে।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে ৪০টি বাঁশের পাটা এবং ৪ কিমি বাঁধ-কাম-মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হবে।
- প্রকল্প এলাকায় ৪টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও গার্ডশেড নির্মাণ করা হবে।
- প্রকল্প এলাকার প্রতিটি উপজেলা মৎস্য দপ্তরে ২টি করে পানি পরীক্ষাকরণ কিটবক্স এবং ১টি করে জাল সরবরাহ করা হবে।
- সাধারণ জনগণের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে কৃষক র‍্যালী বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের মেয়াদোত্তর সম্ভাব্য পরিবর্তন/ফলাফল

প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকল্পটি পাঁচ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হলে ভবদহ অঞ্চলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায়-

- ১৭৫০ জন মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।
- মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপনের ফলে মৎস্যচাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হবে।
- পোনা অবমুক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে ১১টি বিলে মাছের গড় উৎপাদন ১০০০ কেজি/হেক্টর হারে বৃদ্ধি পাবে।
- ২৬,২০০ জন সদস্য নিয়ে কমিউনিটি গ্রুপ গঠনে তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।
- ৪টি উপজেলায় গ্রামীন নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন হবে।
- অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি হবে।
- আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে ভবদহ এলাকায় উৎপাদিত মাছের বাজারজাত ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে।
- সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধ অঞ্চলে রুই জাতীয় মাছ চাষের সাথে সাথে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হবে। যার ফলে অত্র এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জলাবদ্ধ দুর্গত মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটবে।

পুরুষ গলদা চিংড়ির বৈচিত্র্যময় অসম বৃদ্ধি ঃ প্রাসঙ্গিক গবেষণার ফলাফল

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল ওহাব[১]
ড. এস এম শামছুর রহমান[২]

স্বাদুপানির চিংড়ি (Freshwater prawn) প্রজাতিসমূহের মধ্যে গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*) সবচেয়ে বড় আকারের। এটি আমাদের দেশীয় একটি প্রজাতি। নামে স্বাদুপানির চিংড়ি হলেও গলদার জীবনটা শুরু হয় হালকা লবণাক্ত পানিতে। কারণ লার্ভা থেকে পোস্ট লার্ভা (পিএল)-তে পরিণত হতে এর জন্য হালকা লবণাক্ত পানি একান্ত অপরিহার্য একটি মাধ্যম। তাই সমুদ্র উপকূল এলাকার নদ-নদী ও মোহনায় গলদা চিংড়ির ডিম ফুটে লার্ভি এবং তা থেকে পিএল এ রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে পিএল বেড়ে উঠতে থাকে এবং অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির জলাশয়ের পানে ধাবিত হয়। তাই হ্যাচারিতে গলদার পোনা উৎপাদনের জন্যও হালকা লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হয়।

পুরুষ গলদার দৈহিক বৃদ্ধির হার স্ত্রী গলদার তুলনায় বেশি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাছাই করে কেবল পুরুষ গলদার চাষ করলে স্ত্রী-পুরুষের একত্রিত চাষ বা শুধু স্ত্রী গলদার চাষের তুলনায় বেশি উৎপাদন ও মুনাফা পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষ গলদার দৈহিক বৃদ্ধির হারও রহস্যঘেরা এবং খুবই বৈচিত্র্যময়। একই বয়স ও আকারের গলদার পোনা একই পুকুর/জলাশয়ে লালন-পালন করলেও সকল পুরুষ পোনা একই সাথে সমানভাবে বাড়তে পারে না। বয়সে পরিপক্ব এবং প্রজননক্ষম হয়েও এরা তিনটি ভিন্ন ধরন ও আকারে পরিণত হয়। কিছু সংখ্যক পুরুষ গলদা আকারে বেশ বড় হয়ে যায়। এদের দ্বিতীয় জোড়া পা অনেক বড় এবং কাঁটাযুক্ত ও নীল রং ধারণ করে। এ পর্যায়ে এদের দেহ আর বৃদ্ধি পায় না। এদেরকে নীল নখরওয়ালা বা নীলপদী পুরুষ (blue-clawed male, BC) বলা হয়। এদের নীল পা দেহের দেড়গুণের চেয়েও বেশি লম্বা হতে পারে। কিছু সংখ্যক পুরুষ গলদা মাঝারি/বড় আকারে পরিণত হয় যাদের দ্বিতীয় জোড়া পা কমলা রং ধারণ করে। এদেরকে কমলা নখরওয়ালা বা কমলাপদী পুরুষ (orange-clawed male, OC) বলা হয়। এদের কমলা পায়ের দৈর্ঘ্য দেহের প্রায় সমান হয়ে থাকে। এদের দেহ আরো বৃদ্ধি পেয়ে এক পর্যায়ে নীলপদী পুরুষে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বহু সংখ্যক পুরুষ গলদা আকারে ও ওজনে খুবই ছোট রয়ে যায় যাদেরকে ক্ষুদ্র পুরুষ (small male, SM) বলা হয়। এদের দ্বিতীয় জোড়া পায়ের দৈর্ঘ্য দেহের প্রায় অর্ধেক। চিত্রে একই বয়সের তিন ধরনের পুরুষ গলদা চিংড়ি দেখানো হলো।

১ ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
২ সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

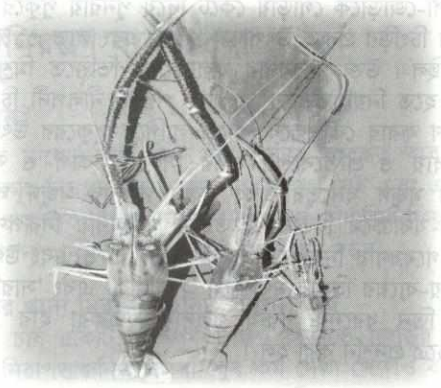

চিত্র ঃ একই বয়সের তিন ধরনের পুরুষ গলদা চিংড়ি

পুরুষ গলদা চিংড়ির বৈচিত্র্যময় দৈহিক বৃদ্ধিকে heterogeneous individual growth (HIG) বলা হয়ে থাকে যা গলদা চিংড়ি চাষে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। অনেক সময় এমনও হয় যে, চাষকৃত গলদা চিংড়ি আহরণকালে পুরুষ চিংড়ির মাত্র ১০% নীলপদী ও ৪০% কমলাপদীতে পরিণত হয়। অবশিষ্ট ৫০% পুরুষ গলদা ক্ষুদ্রই থেকে যায়। তবে চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে এ হার কিছুটা কম বেশি হতে পারে। গবেষণায় জানা যায় যে, নীলপদী চিংড়িগুলোর আগ্রাসন বা দমন নীতির কারণেই ক্ষুদ্র পুরুষগুলো বড় হতে পারে না। কারণ এদেরকে সর্বদা নীলপদীদের সাথে খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এদের ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় এবং খাদ্য রূপান্তরের ক্ষমতা কমে যায়। এদেরকে সর্বদা নীলপদীদের ভয়ে তটস্থ থাকতে হয়। ফলে বেঁচে থাকার জন্যই শক্তি খরচের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। উপরন্তু ক্ষুদ্র পুরুষগুলো প্রজনন-ক্রিয়ার বেলায়ও নীলপদীদের চরম আক্রোশের শিকার হয়। এসব কারণে এদের দৈহিক বৃদ্ধি তেমনটা ঘটতে পারে না। নীলপদীদের কাঁটাওয়ালা নীল পা জোড়াই ক্ষুদ্র পুরুষদের দৈহিক বৃদ্ধিকে অবদমিত করে রাখার মূল হাতিয়ার। গবেষণা থেকে আরো জানা যায় যে, ক্ষুদ্র পুরুষগুলোকে নীলপদীদের প্রভাব বা সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করা গেলে অথবা নীলপদীদের নীল পাগুলোকে অপসারণ করা হলে ক্ষুদ্র পুরুষগুলোও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রথমে কমলাপদীতে এবং শেষ পর্যন্ত নীলপদীতে রূপান্তরিত হয়। তাই চাষাধীন পুকুরের ক্ষুদ্র পুরুষগুলোকে নীলপদী চিংড়িতে পরিণত হবার সুযোগ করে দেয়া গেলে মোট উৎপাদন ও আয় উভয়ই বৃদ্ধি পেতে পারে।

এ প্রেক্ষাপটে পুরুষ গলদার সাথে সিলভার কার্প, কাতলা ও মলা মাছের মিশ্রচাষের ওপর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে ধারাবাহিকভাবে তিনটি গবেষণা সম্পন্ন করা

১ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
২ বায়োকেমিস্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

হয়েছে। প্রথম গবেষণায় মিশচাষের পকর হতে নিয়মিতভাবে

উল্লেখ্য যে, চাষি ভাইয়েরা নিজেদের পকর/খামারে কচ্ছতার সাথে

ক. আহরণপূর্ব মাননিয়ন্ত্রণের জন্য অনুসরণীয় ব্যবস্থাপনাসমূহ

১. চিংড়ি চাষের স্থান নির্বাচন যথাযথভাবে হতে হবে যেন তা সর্বপ্রকার দূষণ/দূষণের উৎস থেকে মুক্ত থাকে।

২. চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত পানির গুণগুতমান ভাল থাকতে হবে। দূষিত পানি উৎপাদিত চিংড়ির দেহে ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটাতে পারে।

৩. চিংড়ি খামারে অনুসরণীয় স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিতে হবে। খামারে কর্মরত লোকজনকে কোন অবস্থাতেই খামারের পানিতে, খামারের পাড়ে এবং পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত কোন জলাশয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না। পানির উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরি করতে হবে। এছাড়া পশুর মল ও হাঁস-মুরগির বিষ্টা কোন ক্রমেই সার হিসেবে চিংড়ি খামারে ব্যবহার করা যাবে না।

৪. চিংড়ির পিএল নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে যাতে এটি কোনভাবেই ভাইরাস কিংবা কোন এন্টিবায়োটিক দ্বারা সংক্রমিত না হয়।

৫. চিংড়ি ঘেরে ব্যবহৃত খাদ্য সম্পর্কিত উত্তম ব্যবস্থাপনাসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে। সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, খাদ্য এবং খাদ্য উপাদানসমূহ ক্ষতিকর নাইট্রোফিউরানের প্রধান উৎস। কাজেই খাদ্যের গুণগতমান যাচাই সাপেক্ষে এবং স্থানীয়ভাবে খাদ্য তৈরির সময় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ও জীবাণুমুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে তৈরি খাদ্য ব্যবহার করতে হবে।

৬. চিংড়ির ঘেরে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ির রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অবশেষে চাষির জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। এন্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘ সময় ব্যবহার চিংড়ির দেহে এন্টিবায়োটিকের অবশেষ জমা করে এবং চিংড়ির মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কাজেই ঔষধ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং ঔষধের অবশেষ নিঃশেষের সময় (উইথড্রয়াল পিরিয়ড) মেনে চিংড়ি আহরণ করতে হবে।

৭. চিংড়ি আহরণের ৭-১০ দিন আগে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি আহরণপূর্ব পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে যাতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন ত্রুটি ধরা পড়লে ঘেরে প্রয়োজনীয় সংশোধিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্ভাব্য সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়।

খ. আহরণকালীন ও আহরণোত্তর অনুসরণীয় উত্তম ব্যবস্থাপনাসমূহ

♦ আহরণকালীন উত্তম ব্যবস্থাপনাসমূহ

১. চিংড়ির গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য আহরণের ২ দিন আগে থেকে চিংড়ির খাবার কমিয়ে দেয়া।

২. ভোরে অথবা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরণ করা।

৩. যদি খাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুসারে নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর চিংড়ি আহরণ করতে হবে।

৪. চিংড়ি অধিক আঘাত পায়, অঙ্গ বিনষ্ট হয় এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এমন কোন পদ্ধতি, কৌশল কিংবা সরঞ্জাম দিয়ে চিংড়ি আহরণ থেকে বিরত থাকা।

৫. চিংড়ি আহরণের পর বরফ ঠাণ্ডা পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন কাদা/ময়লা না থাকে।

চিত্র ঃ চিংড়ি ঘের

♦ আহরণোত্তর উত্তম ব্যবস্থাপনাসমূহ

১. চিংড়ি আহরণের পর হতেই তার গুণগতমান অবনতির প্রক্রিয়া শুরু হয়। কাজেই ধরার পরপরই চিংড়িকে জীবাণুমুক্ত প্লাস্টিকের বক্সে কুচি কুচি বরফের মধ্যে রাখতে হবে। প্রথমে বরফের একটি স্তর, তারপর চিংড়ির একটি স্তর এবং তারপর আবার বরফ এভাবে সাজাতে হবে।

২. পরিবহনে কত সময় লাগবে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কত তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণত চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ১ ঃ ১। তবে দিনের তাপমাত্রা ও দূরত্বের বিবেচনায় প্রয়োজনে বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. ইনস্যুলেটেড বা রেফ্রিজারেটেড ট্রাকে বা ভ্যানে করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চিংড়িকে ডিপো বা আড়তে বা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. চিংড়ি বাক্সের ডিজাইন এমন হওয়া উচিত যেন উপরের বাক্স

থেকে চোয়ানো পানি নিচের ব্যাক্সের মধ্যে না পড়তে পারে।

৫. কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চিংড়ি পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। পরিচর্যার কাজটি হাতে রবারের দস্তানা পরে সম্পন্ন করাই উত্তম।

৬. কোন ক্রমেই ডিপোতে চিংড়ির মাথা ছাড়ানো যাবে না এবং চিংড়ি দেহে ওজন বাড়ানোর জন্য কোন প্রকারের পানি, সাগুদানা, ময়দা বা অন্য কোন পদার্থ পুশ করা যাবে না।

৭. চিংড়ি আহরণ সংরক্ষণ ও পরিবহণের সময় যেন তেল, মবিল, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিকের কোন দূষণ না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

চিত্র ঃ আহরিত চিংড়ি

চিংড়ি মাননিয়ন্ত্রণে হ্যাসাপ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা

যে কোন খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য হ্যাসাপ একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোন খাদ্যের কাঁচামালের উৎস থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে এমনকি ঐ পণ্যটির সর্বশেষ ব্যবহারের পর্যায়ে ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিকর পদার্থগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং তার আলোকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোন্ কোন্ ধাপ সঙ্কটপূর্ণ তা নির্ধারণ করে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ধাপেই বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়। হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য মূলভিত্তি হিসেবে প্রথমেই কিছু প্রি-রিকুইজিট প্রোগ্রামস পুরণ করতে হয়; যেমন- গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিস (GMP), স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউর (SOP) স্যানিটেশন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউর (SSOP), ইত্যাদি। কাজেই চিংড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চিংড়ির খামার থেকে শুরু করে কারখানা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে একযোগে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

চিংড়ির মাননিয়ন্ত্রণে ট্রেসিবিলিটি সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা

চাষ পর্যায়ে চিংড়ির ট্রেসিবিলিটি প্রকৃতপক্ষে একটি তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে চিংড়ির খামার, চাষ, আহরণ ও পরিচর্যা এবং বিপণন সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু তথ্য এমনভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয় যার সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট দূষণের উৎস শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এর ফলে চূড়ান্ত ক্রেতা বা ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকারী দূষিত পণ্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যবস্থা (যেমন- চাষ ব্যবস্থাপনার সংশোধন, পণ্য বিনষ্টকরণ, পণ্য প্রত্যাহার, পণ্য রিকল ইত্যাদি) গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

চিত্র ঃ চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণ

ইতোমধ্যে দেশে চিংড়ি চাষ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চূড়ান্ত পণ্য প্রস্তুত পর্যন্ত সকল ধাপে ট্রেসিবিলিটি পদ্ধতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তা ও ইউনিডো-এর উদ্যোগে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প' -এর আওতায় ২০০৬ সাল থেকে দেশের চিংড়ি ভ্যালু চেইনে ট্রেসিবিলিটি পদ্ধতি বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় Strengthening of Fishery and Aquaculture Food Safety and Quality Management System in Bangladesh (BEST- Better Work and Standards Program) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ থেকে এ কার্যক্রম এগিয়ে নেবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, চিংড়ির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষে উৎপাদন পর্যায় হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পর্যন্ত সকল ধাপে হ্যাসাপ পদ্ধতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য সকল ধাপে নিয়োজিত জনগণকে সততা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতে হবে। তাহলে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন টিকে থাকা যাবে; তেমনি দেশের ১৬০ মিলিয়ন লোকের পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ সম্ভাবনাময় স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পুরণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় ছোট মাছ

ড. মোঃ ইনামুল হক

ছোট মাছের সম্ভাবনা

এদেশে মিঠাপানির ২৬৫টি মৎস্য প্রজাতির মাঝে প্রায় ১৪০টি ছোট মাছ বলে স্বীকৃত। লোনাপানি বা উপকূলীয় জলাশয়ে ছোট মাছের সংখ্যা এখনও অজানা। তবে ৪৭৫টি সামুদ্রিক বা লোনাপানির মাছের মাঝে যে অনেকগুলোই ছোট জাতের মাছ তা স্বীকার করতে হবে। আদিকাল হতে আমাদের দেশে মিঠাপানির মলা, পুঁটি, কেচকি, বাইম, কৈ, চান্দার মত নানা প্রজাতির ছোট মাছ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টির যোগান দিয়ে আসছে। ছোট মাছে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ও আয়োডিনের মত খনিজ দ্রব্য। এগুলো মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করে। উপরন্তু ছোট মাছের যকৃতে যে চর্বি জাতীয় দ্রব্য থাকে তা ভিটামিন-এ ও ডি তে সমৃদ্ধ যা আমাদের হাড়, দাঁত, চর্ম ও চোখের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সর্বোপরি ছোট মাছ অন্ধত্ব, রক্তশূন্যতা, গলগণ্ড প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণীর রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকে।

পরিবেশ বির্পযয়সহ নানাবিধ কারণে ছোট জাতের অনেক মাছ আজ বিলুপ্তির পথে। মূলত এসব মাছের আবাসস্থল হচ্ছে নদ-নদী, খাল-বিল ও প্লাবনভূমি। অপরিকল্পিত ও সমন্বয়বিহীন উন্নয়ন ও উৎপাদন বাবস্থাপনার কারণে সামগ্রিকভাবে অন্যান্য মাছের ন্যায় ছোট মাছের উৎপাদনও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। অপরদিকে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের ক্রমাগত প্রভাবে অনেক ছোট জাতের মাছ যেমন- বেলে, পারশে, বাইম, ভাঙ্গনা, বাটা, টেংরা, কৈ, পোয়া ইত্যাদি মাছের প্রাচুর্যতা অনেক কমে গেছে। এলাকাবাসীর মতে এসব এলাকায় এককালে কৈ, মাগুর, টাকি, আলুয়া, তাপশী মাছের যে প্রাচুর্যতা ছিল আজ তা বিলুপ্তির পথে। সাম্প্রতিক সময়ে এসব মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত ও বিভিন্ন কর্মশালায় আলোচনা করা হচ্ছে। বাস্তবে কৃত্রিম প্রজননে ছোট মাছের বাণিজ্যিক পোনা উৎপাদন ও চাষ সম্প্রসারণ করা কঠিন কাজ। যদিও গবেষণা পর্যবেক্ষণে ছোট মাছ রেখেই জলাশয়ে বড় মাছ চাষের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে, তথাপি এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ব্যাপারে অনেকেই সন্দিহান। তাই জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোট মাছের বংশবিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। তাছাড়া মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম নির্মাণের মাধ্যমেও ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সেই সাথে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। আজ বাংলাদেশে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ছোট মাছের উৎপাদন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

উপকূলীয় জলাশয়ের জন্য একই কথা। কারণ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এসব ছোট মাছের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

পুষ্টি চাহিদা পূরণে ছোট মাছ

অধিকাংশ ছোট মাছ সামান্য পরিচর্যার (শুধু নাড়ি-ভূঁড়ি ফেলে দেয়া হয়) পর রান্না করা হয়। তাই এসব মাছ ক্যালসিয়ামের একটি ভাল উৎস। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানবদেহে কার্যকর ক্যালসিয়াম শোষণের পরিমাণ ছোট মাছের বেলায় ২৪.৬% ও দুধের ক্ষেত্রে ২২.৬%। ছোট মাছের মধ্যে মলা মাছে ভিটামিন-এ এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ৪-৬ বছরের শিশুদের বেলায় দৈনিক ১৭ গ্রাম হারে মলা মাছ খেলে তাদের দৈনিক ভিটামিন-এ চাহিদার পুরোটাই পূরণ হয়। সেই সাথে দৈনিক ক্যালসিয়াম চাহিদার ২২ শতাংশেও এতে পাওয়া যায়। উপকূলীয় ছোট মাছের ভেতর অলুয়া, বেলে, বিষতারা, খয়রা, খল্লা, ফ্যাসাও তুলার দাণ্ডি মাছে আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি (সারণি দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া খল্লা ও তাপসি মাছে তেলের পরিমাণ বেশি। লোনাপানির অনেক ছোট মাছে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ উল্লেখ করার মত। উপকূলীয় এসব ছোট মাছের পুষ্টিগুণের কথা আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না। এসব মাছের পুষ্টিমান এখন উপকূলবাসীকে ছোট মাছ চাষ ও সংরক্ষণে সচেতন করে তুলবে।

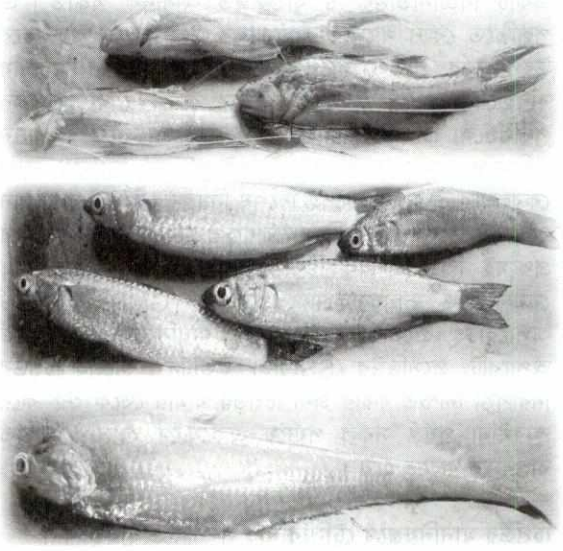

চিত্রঃ তাপসি (উপরে), ফ্যাসা (মাঝে) ও অলুয়া (নিচে)

সারণি ১ ঃ উপকূলীয় ছোট মাছের পুষ্টিমান (১ম অংশ)

নং	উপকূলীয় ছোট মাছসমূহ	আমিষ(%)	তৈল(%)	খনিজ দ্রব্য(%)
১	অলুয়া/আমাদি (*Coilia dussumieri*)	৬৬.৩৪	১০.৪৬	১৬.৮৫
২	সাদা বেলে (*Platycephalus indicus*)	৭১.৩৯	১১.৯৬	১৫.২০
৩	কাল বেলে (*Butis melanostigma*)	৬২.০০	৮.১৪	১৬.৯২
৪	বিষতারা (*Scatophagus argus*)	৭৭.৭৫	৯.৬৯	৭.২২
৫	চন্দনা/খয়রা (*Elops machnata*)	৭২.০৩	৬.০৪	১৮.৩৯
৬	ডগরি (*Apocryptes bato*)	৬৬.৪১	৮.৯৮	১৩.৮৪
৭	একঠুটা (*Hyporhamphus limbatus*)	৬৯.৫০	১৪.০৪	২০.১৬
৮	কাইন মাগুর *Plotius canius*	৫৮.৯৯	২২.৮০	১৮.১৭
৯	খল্লা/খরশুলা *Rhinomugli corsula*	৭৩.৮১	২৩.৭০	১৪.৮১
১০	কই পুটি *Anodontostonna thailandiac*	৬৫.৩৯	১৩.১৬	১৫.২৫
১১	নোনা টেংরা *Mystus gulio*	৬৬.৩৪	১৬.৫৩	১৭.২৪
১২	পারশে *Liza parsia*	৫৯.৫৪	১২.৩১	১৬.৪৯
১৩	মধু ফ্যাসা *Setipinna taty*	৭৮.৭৫	১১.০২	১১.৪২
১৪	রেখা/কাট কৈ *Terapon jarbua*	৬৩.০৯	১০.৪৫	২০.৭৬
১৫	সুতানলী *Crossocheilus latius*	৬৭.০১	১৭.১৩	১১.৩২
১৬	তাপসি *Polynemus paradiseus*	৬০.৮১	২৫.৩০	৯.২৩
১৭	তুলার দাণ্ডি *Silloginopsis panijus*	৭৮.১৩	১১.১০	১০.৫১

সারণি ১ ঃ উপকূলীয় ছোট মাছের পুষ্টিমান (২য় অংশ)

নং	ছোট মাছসমূহ	ক্যালসিয়াম (%)	ফসফরাস (%)	পটাশিয়াম (%)	সোডিয়াম (%)
১	অলুয়া/আমাদি	২.৮০	১.৯৪	১.১২	০.৩৫
২	সাদা বেলে	২.৫০	১.৯৮	০.৭৬	০.৪১
৩	কাল বেলে	৩.২৮	১.৬৮	০.৭১	০.৩৪
৪	চন্দনা/খয়রা	৩.৭২	২.৬৮	১.০৫	০.৩৮
৫	ডগরি	২.০৯	২.০৫	০.৮২	০.৩২
৬	একঠুটা	৩.৩৫	২.৭৫	০.৬৯	০.৩৬
৭	খল্লা/খরশুলা	২.৫৪	২.২৯	২.৪১	০.৫৪
৮	কই পুটি	২.১৩	১.৩৬	২.১৩	০.৩৫
৯	নোনা টেংরা	৪.৮৮	২.৭১	০.৪৯	০.৪৭
১০	পারশে	২.৫০	১.৮১	০.৭৬	০.৪১
১১	মধু ফ্যাসা	২.৫০	২.২১	০.৯০	০.২৭
১২	রেখা/ কাট কৈ	২.৭৫	২.০৭	০.৭৯	০.৩২
১৩	সুতানলী	১.৯৫	১.২৫	০.৮৩	০.৩৬
১৪	তাপশী	১.৫৫	১.১৩	০.৮৫	০.৩৪
১৫	তুলার দাণ্ডি	১.৯৫	১.৩৮	১.১৯	০.৩১

স্বাস্থ্য রক্ষায় ছোট মাছ ও সবুজ শাকসবজি থেকে যে ভিটামিন-এ পাওয়া যায় তা হলো ক্যারোটিন। ক্যারোটিন শরীরে গিয়ে ভিটামিন-এ তে রূপান্তরিত হয়। সবুজ শাকসবজি থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন-এ এর পরিমাণ মোট ক্যারোটিনের ছয় ভাগের এক ভাগ। সুতরাং মাছে যে ভিটামিন-এ থাকে তার প্রাপ্যতা শাকসবজি থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন-এ এর চাইতে অনেক বেশি। ভিটামিন-এ এর অভাব পূরণে মাছের ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ। এছাড়া মাছে অন্যান্য ভিটামিন যেমন ভিটামিন-ই, রাইবোফ্লাবিন, থায়ামিন ইত্যাদিও রয়েছে। তাই পরিবারের পুষ্টি চাহিদাসহ ভিটামিনের অভাব পূরণে মাছ বিশেষ করে ছোট মাছের ভূমিকা অপরিসীম।

ছোট মাছে প্রচুর খনিজ দ্রব্যাদি বিদ্যমান। এতে রয়েছে লৌহ, তামা, দস্তা, আয়োডিন ইত্যাদি। বাংলাদেশে শতকরা ৭০ ভাগ মা ও শিশু রক্তশূন্যতায় ভোগে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে খাবারে প্রয়োজনীয় লৌহের অভাব। ছোট মাছ শরীরের লৌহ চাহিদার এই অভাব পূরণ করে। আমাদের দেশে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত অপুষ্টিও যথেষ্ট বিদ্যমান। ক্যালসিয়ামের অভাবে বাচ্চাদের শরীরের হাড় ঠিকমত গড়ে ওঠে না এবং গড়ে ওঠা হাড় শক্ত হয় না। অধিকাংশ ছোট মাছ কাঁটাসহ খাওয়া হয় যাতে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায়। ছোট মাছের কাঁটা ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের একটি ভাল উৎস। আমাদের দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক কোন না কোন ধরনের আয়োডিনের অভাবজনিত রোগে ভুগছে। খাবারে আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ হয়। সামুদ্রিক মাছ বিশেষত লোনাপানির অনেক ছোট মাছে প্রচুর আয়োডিন থাকে। এসব মাছ আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে।

শেষ কথা

আমাদের দেশে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ছোট মাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, উপকূলীয় ছোট মাছে অনেক ক্ষেত্রে মিঠাপানির মাছের চেয়ে বেশি পুষ্টিগুণ বিদ্যমান। অলুয়া, পারশে, ফ্যাসা, তাপসি, তুলার দাণ্ডি ইত্যাদি মাছের পুষ্টিমান উপকূলবাসীর কাছে ছোট মাছের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এসব মাছ সংরক্ষণ বা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এদেশে আমিষ চাহিদা পূরণ তথা খাদ্য নিরাপত্তায় নতুন দ্বার খুলে দিতে পারে।

ভাইরাসমুক্ত জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা

ড. নিত্যানন্দ দাস[১]
সরোজ কুমার মিস্ত্রী[২]
আ ক ম শফিক-উজ-জামান[৩]

বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার বৃহত্তর অংশ মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। দেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কক্সবাজার ও আশেপাশের জেলাগুলোতে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে লবণ পানি প্রবেশের ফলে প্রচুর পরিমাণে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট কাজে এ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছেন। যার ফলে একদিকে যেমন তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটেছে তেমনি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও বাগদা চিংড়ির অবদান অপরিসীম। দেশের চিংড়ি খাতের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৭% আসে বাগদা চিংড়ি হতে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ২.১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। আশির দশকে দেশে ক্ষুদ্র পরিসরে চিংড়ি চাষ শুরু হয়ে বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হলেও বাগদা চিংড়ির গড় উৎপাদন ২০০-২৫০ কেজি/হেক্টর/বছর, যা বিশ্বের অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য। অথচ এ দেশের মাটি, পানি ও পরিবেশ চিংড়ি চাষের বিশেষ উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা ও বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন এবং চাষির নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহার কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লাভ করতে পারছি না। অথচ পরিকল্পিত সুষ্ঠু চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে কমপক্ষে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশের বাগদা চাষ এখনও সনাতন পদ্ধতিতে রয়ে গেছে। যার ফলে দিন দিন ঝুঁকিও বাড়ছে। ১৯৯৪ সালে হোয়াইট স্পট ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এদেশের বাগদা ঘেরে ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। ঐ বছর মড়কের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, অধিকাংশ বাগদা চাষি কম বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভাইরাসে আক্রান্ত চিংড়ি ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায় এবং অতি দ্রুত সংক্রমিত হয়। যার ফলে আক্রান্ত পুকুর/ঘেরের সমুদয় চিংড়ি অতি অল্প সময়ের মধ্যে মারা যেতে পারে। যেহেতু ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোন চিকিৎসা নেই। তাই আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই ঘেরে ভাইরাসের সংক্রমণ না হয়। বর্তমান চাহিদার আলোকে আমাদেরকে চাষ ব্যবস্থাপনার ধরন ও কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তন, বাগদা চাষের উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত চাপ ইত্যাদি কারণে আমাদের হেক্টরপ্রতি উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া দিন দিন মৎস্য উৎপাদনের ঝুঁকিও বাড়ছে। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় রেখে ভাইরাসমুক্ত পরিবেশবান্ধব জৈব বদ্ধ পদ্ধতির বাগদা চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাগদা খাতে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লাভ করা যেতে পারে।

ভাইরাসমুক্ত পরিবেশবান্ধব জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা

আলোচ্য বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাগদা চাষ পদ্ধতি হতে হবে ভাইরাসমুক্ত উপায়ে। অর্থাৎ বাগদা চাষে যেন ভাইরাস আক্রমণ করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ পদ্ধতিতে ভাইরাসের সংক্রমণরোধে চাষের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে-

ক. **পিএলঃ** পোনার মাধ্যমে যেন ভাইরাস সংক্রমিত না হয় সে জন্য PCR পরীক্ষিত পিএল (বাগদার পোনা) ব্যবহার করা;

খ. **ঘের/পুকরের পানিঃ** ঘের/পুকরের পানিতে যেন ভাইরাস প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পাড় মজবুত করা এবং পানি চুয়ানো রোধে পাড়ের ভিতরে পলিথিন ব্যবহার করা;

গ. **ঘন নেটের স্থাপনঃ** কোন বাহকের মাধ্যমে যেন ভাইরাস প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ঘেরের চারিপার্শ্বে ঘন নেট দিয়ে বেড়া দেওয়া;

ঘ. **জীবাণুমুক্তকরণঃ** ঘেরে ভাইরাস প্রতিরোধে পোনা ছাড়ার পূর্বে পানি জীবাণুনাশক দ্বারা পরিশুদ্ধ করা, পানি পরিবর্তনের দরকার হলে রিজার্ভ পুকুর হতে পরিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা, ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত রাখা এবং খামারের বায়ো-সিকিউরিটি বজায় রাখা।

পরবর্তী বিষয় হলো পরিবেশবান্ধব। বাগদা চাষের ফলে যেন পরিবেশ দূষিত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি না করে বরং পরিবেশ সহায়ক উপায়ে বাগদা চাষের কলাকৌশল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তী বিষয় হলো জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে চিংড়ি শিল্পে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি। চিংড়িতে উল্লিখিত পদার্থের উপস্থিতির কারণে বিশ্ববাজারে আমাদেরকে বারবার বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১ প্রকল্প পরিচালক, বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
২ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চ. দা.), বটিয়াঘাটা, খুলনা
৩ সহকারী পরিচালক, বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

উক্ত সমস্যা হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এবং পরিবেশ সহনীয়তা বজায় রাখতে খামারে সকল প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে বিরত থাকা। সেক্ষেত্রে চাষের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে উন্নত জৈব বদ্ধ পদ্ধতিতে বাগদা উৎপাদন করলে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায়। আমাদের বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে বাগদা চাষ করে হেক্টরপ্রতি ২৫০-৩০০ কেজি উৎপাদন লক্ষ্য করা যায়। অথচ জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ২০০০-২৫০০ কেজি লাভ করা যায়। মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়-

প্রচলিত পদ্ধতির বাগদা চাষে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ২০০-৩০০ কেজি
হেক্টরপ্রতি বার্ষিক আয় (২৫০X৪০০/-)= ৮০০০০-১০০০০০/-
হেক্টরপ্রতি বার্ষিক খরচ (লীজ মূল্য)= ৬০০০০ - ৭০০০০/-
হেক্টর প্রতি নীট লাভ = ৩০০০০ - ৪০০০০/-

অথচ পরিবেশবান্ধব জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতিতে -
হেক্টরপ্রতি বার্ষিক উৎপাদন ২০০০-২৫০০ কেজি
হেক্টরপ্রতি বার্ষিক আয় (২৫০০X ৪০০/-)=৮০০০০০-১০০০০০০/-
হেক্টরপ্রতি বার্ষিক খরচ = ৫০০০০০ - ৬০০০০০/-
হেক্টরপ্রতি নীট লাভ = ৩০০০০০ - ৪০০০০০/-

মৎস্য অধিদপ্তরের 'বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের' আওতায় পবিবেশবান্ধব জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতিতে চাষকৃত একটি প্রদর্শনী খামারের ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি ও ফলাফল

পুকুরের আয়তন	ঃ ০.৫৯ হেক্টর
পোনা মজুদ	ঃ হেক্টর প্রতি ৮৩,০০০ টি
বাঁচার হার	ঃ ৬১.%
পোনা মজুদের তারিখ	ঃ ১৫/০৫/২০০৯ খ্রি.
এফসিআর	ঃ ১.৩৯
চিংড়ি আহরণের তারিখ	ঃ ০৫/০৯/০৯ খ্রি.
বিক্রয় মূল্য	ঃ ৪৪৯.০০ টাকা/কেজি
প্রাপ্ত উৎপাদন হেক্টরপ্রতি	ঃ ২০৭৬ কেজি
হেক্টরপ্রতি মোট ব্যয়	ঃ ৪,৫৪,৩৬৩.০০ টাকা
গড় ওজন	ঃ ৪১ গ্রাম/প্রতিটি
হেক্টরপ্রতি মোট বিক্রয়	ঃ ৯,৪৯,৪০৬.০০ টাকা
হেক্টর প্রতি নীট লাভ	ঃ ৪,৯৫,০৪৩.০০ টাকা

জৈব বদ্ধ উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চাষের কলাকৌশল

এ পদ্ধতিতে চাষ শুরু করার পূর্বে পুকুর/ঘের ভালভাবে প্রস্তুত করতে হবে। পুকুর প্রস্তুতিতে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলোঃ

ক. পুকুরের পাড় হবে প্রশস্ত, শক্ত, মজবুত, ঢালু ও উঁচু। পানি চুঁইয়ে বাইরে যাবে না অথবা বাইরের পানি ভেতরেও আসবে না।

খ. পুকুরের পানির গভীরতা হবে ৪-৫ ফুট

গ. পুকুরের পানি ধরে রাখা এবং ভিতরের পানি বাইরে এবং বাইরের পানি ভিতরে প্রবেশ বন্ধে পাড় তৈরিতে শক্ত পুরু পলিথিন ব্যবহার করতে হবে। পাড় ভালভাবে দুরমুজ করতে হবে।

ঘ. নতুন চাষ শুরু করার আগে এবং প্রতি ফসল উৎপাদনের পর ঘের ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। তলার কালো কাদা দূর করতে হবে।

ঙ. ঘেরে/পুকুরে রোগজীবাণুবাহী প্রাণীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার লক্ষ্যে ঘন নেট জাল দিয়ে ঘেরের/পুকুরের চারপাশ ঘিরে দিতে হবে।

চ. পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতের পর পুকুরে পানি প্রবেশ করাতে হবে। সেক্ষেত্রে পানি ভাল করে ছেকে প্রবেশ করানো ভালো। পানি প্রবেশের করানোর পর পানি জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে পানির লবণাক্ততার উপর ভিত্তি করে ৩০-৬০ পিপিএম হারে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে পানি জীবাণুমুক্ত করা হয়। ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর পানিতে প্রাকৃতিক খাবারের স্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখতে হেক্টরপ্রতি অটো পালিশ ১০ কেজি, চিটাগুড় ১০ কেজি ও ইস্ট ১০০ গ্রাম তিন গুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে ২৪ ঘণ্টা পর ঘন ন্যাকড়ায় ছেকে নিতে হবে। ছাঁকা পানি পুকুরে সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে। একইভাবে তিন-চার দিন পর পর প্রয়োগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানির রং হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের পর পোনা (পিএল) মজুদ করা হয়। সকাল বেলায় পোনা মজুদ করা উত্তম। পোনা মজুদের ক্ষেত্রে গুণগতমান সম্পন্ন ভাইরাসমুক্ত (পিসিআর পরীক্ষিত) ও সুস্থ-সবল পোনা ব্যবহার করতে হবে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদীর পোনা ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

পোনা পরবহন ও ছাড়ায় বিবেচ্য বিষয়

- প্যাকিং, পরিবহন, নাড়াচাড়ায় ও পুকুরে ছাড়ায় যত্নবান হতে হবে।
- অধিক তাপমাত্রায় এবং অধিক ঘনত্বে পোনা পরিবহন পরিহার করতে হবে।
- পোনা পরিবহনকালে পরিবহন পাত্রে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পোনায় যেন ধকল কম হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- পুকুর/ঘেরে পোনা ছাড়ার আগে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নিতে হবে।
- সকালে পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে
- হেক্টর ৮০,০০০-১,০০,০০০টি পোনা ছাড়লে ভাল ফল পাওয়া যায়।

খাদ্য প্রয়োগঃ পোনা ছাড়ার পর পুকুরে নিয়মিতভাবে গুণগতমান সম্পন্ন সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। খাদ্য গুণগত মানসম্পন্ন না হলে চিংড়ির উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এমনকি চিংড়ি বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারাও আক্রান্ত হতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়

- ভাল মানের খাবার সঠিক পরিমাণে দিতে হবে।
- একই স্থানে, একই সময়ে খাবার দিতে হবে।
- মাঝে মাঝে খামারের মাছ ও চিংড়ি নমুনায়ন করে খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।
- নমুনায় প্রাপ্ত ওজন অনুযায়ী দিনে কতটা খাবার লাগবে তা ঠিক করতে হবে।
- দিনের সব খাবার একবারে নয়, ৩-৪ বার দিতে হবে। রাতের বেলা বেশি খাবার দিতে হবে।
- খাবার ঠিকমত খায় কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- চিংড়ি বাড়ছে কি না, সুস্থ-সবল আছে কি না তা দেখতে হবে।
- পুকুরের তলা পরিষ্কার রাখতে হবে।
- পুকুরে পরিমিত পরিমান প্রাকৃতিক খাবারের উপস্থিতি রক্ষা করতে হবে।

পুকুরের পানির গুণাগুণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে এবং সঠিকমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চিংড়ি চাষে পানির আদর্শ গুণাগুণগুলো হলো-

- পানির গভীরতা ঃ ৪-৫ ফুট
- পানির স্বচ্ছতা ঃ ২৫-৩৫ সেমি
- লবণাক্ততা ঃ ৫-১৫ পিপিটি
- পানির পিএইচ ঃ ৭.৫-৮.৫ (সকালঃ ৭.৫-৮.০; বিকাল ঃ ৮.০-৮.৫)
- পানিতে অক্সিজেন ঃ ৫-৮ মি.গ্রা./লি.
- পানির ক্ষারত্ব ও খরতা ঃ ৮০-১২০ পিপিএম
- এ্যামোনিয়া ঃ ০.১০ পিপিএম এর কম
- হাইড্রোজেন সালফাইড ঃ ০.০২ পিপিএম এর কম

চিংড়ি চাষে পানির গুণাগুণ বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে প্রবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রবায়োটিক ব্যবহারের ফলে-

- মাটি ও পানির পচনজনিত ক্ষতিকর গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে
- খাদ্য পচনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব কমায়
- পুকুরের তলদেশ ভাল রাখে
- অপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমায়
- উপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়ায়
- তিকর ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে
- চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

ভাইরাস রোগ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

- পুকুরের আকার ছোট করতে হবে। এক একর হলে ভাল হয়। পুকুর ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন কোন ক্র্যাস্টাসিয়া জাতীয় প্রাণী না থাকতে পারে। পুরাতন পুকুর হলে তলদেশের কাদা ও পচা মাটি অপসারণ করে প্রাথমিকভাবে অল্প পানিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে সকল প্রাণী মেরে ফেলতে হবে।

চিত্র ঃ চিংড়ি খামারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

- পানি ঢুকানোর পূর্বেই পুকুরের চারিপাশে ঘন নেট এর বেড়া দিতে হবে যেন বাইরে থেকে কোন ভাইরাস বহনকারী এবং রাক্ষুসে প্রাণী পুকুরে ঢুকতে না পারে ।
- পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর সময় ঘন ফিল্টার নেট এর মাধ্যমে ছেকে ঢুকাতে হবে যেন কোন ভাইরাস বহনকারী

প্রাণী বা তার ডিম প্রবেশ করতে না পারে। সমস্ত চাষকালীন সময় পানির উচ্চতা থাকতে হবে কম পক্ষে ৪-৫ ফুট।

- পুকুরের পানিকে দূষণমুক্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ভাইরাসমুক্ত করার জন্য অনুমোদনকৃত জীবাণুনাশক দ্বারা বিশুদ্ধ করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধক হিসেবে সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় হলো হ্যাচারিতে ভাইরাসমুক্ত ডিমওয়ালা চিংড়ির ডিম ফুটাতে হবে এবং ভাইরাসমুক্ত সুস্থ-সবল পোনা সরবরাহ করতে হবে। উক্ত পোনা খামারে মজুদ করতে হবে এবং সুষ্ঠু চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষকালীন সময়ে খামারের পানির বিভিন্ন নিয়ামক নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যাতে চিংড়ির ওপর অধিক পরিবেশের চাপ সৃষ্টি না হয়।

চিত্র ঃ পানি অক্সিজেন সমৃদ্ধকরণ

- সমস্ত চাষকালীন সময় পুকুরে উন্নত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। কোনভাবেই জীবন্ত ক্র্যাস্টাসিয়া জাতীয় খাবার (কাঁকড়া কিংবা চিংড়ি দ্বারা তৈরি) দেওয়া উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে।
- উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুকুরের সঠিক পরিবেশ, পানির গুণগত মান, প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ঠিক রাখতে হবে যা রোগের ব্যাপকতা কমাতে সহায়তা করে।
- অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ পরিহার করতে হবে। কম ঘনত্বে পোনা মজুদ করলে পোনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের চাপও কম পড়ে।
- ঘেরের পানির লবণাক্ততা যেন খুব বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাগদা চিংড়ির সহনীয় লবণাক্ততায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- হোয়াইট স্পট রোগ প্রতিরোধে একক চাষের পরিবর্তে মিশ্র চাষ করাই উত্তম। সেক্ষেত্র বাগদার সাথে তেলাপিয়া ও পার্সে মাছ (*Mugil* spp.) চাষ করা যেতে পারে।
- চাষে ব্যবহৃত পানি নদী/সাগরে অবমুক্ত করার আগে তা দূষণমুক্ত করা প্রয়োজন। এভাবে পানি দুষণমুক্ত করার ফলে তা রোগ বিস্তারের ঝুঁকি কমায় এবং পানি বিশুদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। ভাইরাস আক্রান্ত ঘেরের পানিতে ১০০ পিপিএম হারে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে ৭ দিন রেখে দিলে তা দূষণমুক্ত হয়।

চিত্র ঃ চিংড়ি আহরণ

- ভাইরাস আক্রান্ত ঘেরে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি কোন অবস্থাতেই অন্য ঘেরে বা পরবর্তী চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- কোন পুকুরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে তা নিশ্চিত হওয়ার পরই পুকুরের সমস্ত চিংড়ি ধরে ফেলা উচিত তাতে আর্থিক ক্ষতি কিছুটা কমবে। খামারে ভাইরাস আক্রান্ত ছোট চিংড়ি আহরণ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে কিংবা গর্তে ফেলে চুন দিয়ে ও পরে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে। খামারের সরঞ্জামাদি উচ্চ ঘনত্বের পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট দ্রবণে পরিশোধন করে নিতে হবে। তবে চিংড়ি ধরার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন উক্ত চিংড়ি এবং এর পানি অন্য পুকুরে যেতে না পারে। এরপর উক্ত পুকুর এবং পানিকে পুনরায় জীবাণু মুক্ত করে পরবর্তী চাষে যেতে হবে।

উপসংহার

বাগদা চিংড়ি চাষে উপরোক্ত বিষয়গুলো মেনে চললে ভাইরাসমুক্ত পরিবেশে বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি উৎপাদন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চাষিরা অধিক লাভবান হতে পারেন। তাই প্রচলিত পদ্ধতিতে বাগদা চাষ না করে জৈব বদ্ধ ও পরিবেশবান্ধব ভাইরাসমুক্ত পরিবেশে বাগদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খামারীদের আগ্রহী হতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্দ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। এ সেক্টরের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সকলের সচেতনতা ও আন্তরিকতায় বাগদা সেক্টরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প

জোয়ারদার মোঃ আনোয়রুল হক[১]
মোঃ আব্দুস সালাম[২]

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য অধিদপ্তর বিগত কয়েক দশক ধরে যুগোপযোগী ও লাগসই কর্মকা-ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে আসছে। তবে 'ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের ধারণা একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, মৎস্যনীতি Fisheries Strategy and Fisheries Sector Road Map এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বাস্তবতার আলোকে গ্রাম পর্যায়ে ফলাফল প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং মৎস্যচাষিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবাকে জনগণের দোরগড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে 'ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২২৭৬.৮১ লক্ষ টাকা। দেশের ৭টি বিভাগের ৫১টি জেলার ২৪০টি উপজেলার ১৭৬০টি ইউনিয়নে এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যাবলী

ক) স্থানীয় মৎস্যচাষিদের সম্পৃক্ত করে নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের গ্রামের সকল বা অধিকাংশ পুকুরে এবং অন্যান্য চাষযোগ্য জলাশয়ে উন্নততর লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

খ) মৎস্য অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, Local Extension Agent for Fisheries (LEAF, লিফ) এবং স্থানীয় মৎস্যচাষিদের মিলিত প্রচেষ্টায় ইউনিয়নভিত্তিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। প্রতি পরিবার থেকে কমপক্ষে একজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা বর্তমান সরকারের একটি নির্বাচনী অঙ্গীকার। ১৭৬০টি ইউনিয়নে ১৭৬০ জন লিফ নির্বাচন ও ৬০০ জন ক্ষেত্রসহকারী নিয়োগ উক্ত নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে সহায়ক হবে।

গ) মাছ ও চিংড়ি চাষ, পোনা ব্যবসা এবং অন্যান্য মৎস্য ভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় পুরুষ ও নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী খামার স্থাপনসহ স্থানীয় মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা। ফলে মাছ চাষ সম্প্রসারণ ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ পদ্ধতি

একজন চাষির মাধ্যমে অন্যান্য চাষির কাছে প্রযুক্তি সেবা প্রসার অর্থাৎ ট্রিকল ডাউন মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ও দলভিত্তিক সংযোগ রক্ষার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে লিফ ও বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় একাধিক ফলাফল প্রদর্শক (আরডি) নির্বাচন করা হবে। প্রত্যেক আরডির ৫ থেকে ১০ জন করে বন্ধুচাষি থাকবে। আরডিদেরকে ফলাফল প্রদর্শনী পুকুরের জন্য প্রকল্প থেকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। বন্ধুচাষি ছাড়াও অতিরিক্ত চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তারা প্রযুক্তি সেবা পেয়ে উপকৃত হতে পারেন। আরডিদেরকে দুই ধাপে মোট ৪ দিন ও বন্ধুচাষিদেরকে একধাপে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষিত চাষিদের কাছ থেকে এলাকার অন্যান্য পুকুর মালিকগণ মাছ চাষের আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারবেন। প্রদর্শনী প্যাকেজগুলো হলোঃ (ক) নার্সারি, (খ) কার্প মিশ্রচাষ, (গ) গলদা কার্প মিশ্রচাষ এবং (ঘ) ধান ক্ষেতে মাছচাষ।

লিফ নিয়োগ

মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রতিটি ইউনিয়নে কোন সম্প্রসারণ কর্মী নেই। স্থানীয় মৎস্যচাষি, পোনা চাষি, পোনা ব্যবসায়ী বা মৎস্য সম্পর্কিত কর্মকা-ে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রতি ইউনিয়নে একজন করে লিফ নির্বাচন করা হবে। সম্প্রসারণ পদ্ধতি ও মৎস্য কার্যক্রম সম্পর্কে কারিগরি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করে স্থানীয়ভাবে মৎস্য বিষয়ক সাধারণ পরামর্শ প্রদানের জন্য লিফগণকে যোগ্য করে গড়ে তোলা হবে। সরকার কার্যকরভাবে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে লিফ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে আর জনগণ স্থায়িত্বশীল প্রক্রিয়ায় লিফ ব্যবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।

ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃষ্টি

রাজস্ব বাজেটে ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃষ্টি করে প্রাথমিকভাবে অত্র প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করার বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এতে করে প্রতি ২-৩টি ইউনিয়নের জন্য একজন করে ক্ষেত্র সহকারী কর্মরত থেকে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প' এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। প্রত্যন্ত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদসমূহ মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে যা গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১ প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প
২ সহকারী পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প

উপকূলীয় চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধিতে চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র

মোঃ সিরাজুল করিম

আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান যেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন তেমনি এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অযৌক্তিক, অপরিমিত ও অসচেতন ব্যবহারই আবার কোথাও কোথাও ডেকে আনতে পারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতির এক নাজুক সঙ্কটময় অবস্থা। আজকের আধুনিক সভ্যতায় উন্নত রাষ্ট্রসমূহের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন কার্যক্রম যেমনি আমাদের ঠেলে দিচ্ছে চরম এক পরিবেশ বিপর্যয়ের জীবন-মরণ সঙ্কট-সমস্যার দিকে তেমনি বিশ্বায়নের উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ কোটি কোটি ভোক্তাদের কাছে অতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি করছে আন্তঃসেক্টর দ্বন্দ্ব আর প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের। তাই আন্তঃসেক্টর দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মানব সভ্যতার নিরাপদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সতর্ক ব্যবহারে আমাদের হতে হবে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান।

চট্টগ্রাম বিভাগের ৩টি জেলার কিছু এলাকা এবং খুলনা বিভাগের ৫টি চিংড়ি সমৃদ্ধ জেলার অন্তর্গত স্বাদু, মৃদু লোনা এবং লোনা পানির বৈশিষ্ট্যময় বৈচিত্র্যপূর্ণ জলজ প্রাকৃতিক পরিবেশে সাম্প্রতিক তথ্যমতে প্রায় ৩০০ প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি পাওয়া যায়। তবে উপকুলীয় চিংড়িচাষ মূলত খুলনা বিভাগের ৫টি চিংড়ি সমৃদ্ধ জেলাতেই বেশি বিধায় আমার চাষ-ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র বিষয়ক আলোচনাটি এই জেলাসমূহে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। বর্তমান সময়ে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে এই প্রজাতিসমূহের কতিপয় বিপর্যয় ও বিলুপ্তির পথে যা বাস্তব জরিপের মাধ্যমে নির্ণয় করে আধুনিক তথ্যব্যাংক স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ভৌগোলিক পরিবেশ বিস্তৃতির দিক থেকে যেমনি এই ৮টি জেলা বৈচিত্র্যময় তেমনি এর অন্তর্গত জলাশয়ের জৈব-রাসায়নিক গুণাগুণ বিচারেও অনন্য বৈশিষ্ট্যে তাৎপর্যমণ্ডিত। পৃথিবীর বৃহত্তম প্যারাবন (ম্যানগ্রোভ) সমৃদ্ধ লোনা ও স্বাদুপানির প্রবাহে সুন্দরবন এলাকাকে পরিণত করেছে মাছ ও চিংড়ির অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজনন ও নার্সারি ক্ষেত্রে।

সাদা মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি ৫টি চিংড়ি সমৃদ্ধ জেলার চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার সমৃদ্ধিও সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অনন্য অবদান রেখে আসছে চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে। দেশের মোট চিংড়ি উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশই উৎপাদন হয়ে থাকে খুলনা বিভাগে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ উৎপাদন ব্যবস্থাতে অপ্রতুল অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, লাগসই প্রযুক্তি, সম্প্রসারণ সেবার অপ্রতুলতা, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পরিবেশবান্ধব স্থায়িত্বশীল পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রায় ১.৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করছে মৎস্য সেক্টরের উপর। আর এ মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের পথে যেমনি আছে নানাবিধ সমস্যা, তেমনি আছে এর সমাধানের পথও যার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে কাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন। বিভাগের মোট মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন ১,৯১,৭৫৪ মে.টন এবং মোট চিংড়ি উৎপাদন ৭৬,৪৬২ মে.টন যার মধ্যে ৪০,৫৩২ মে.টন বাগদা ও ৩১,৮২২ মে.টন গলদা। খুলনা বিভাগের ৪৯টি নদী, ১১২টি বাঁওড়, ৩৪টি বিল, ১,৭৬,৯৮৯টি পুকুর, মোট ১,৮৩,৩০৪ হে. আয়তনের ১,৩৯,২০৬টি ঘের এবং মোট ১,৬৯,৯০৫ হে. সুন্দরবন এলাকার জলাশয়ে পরিবেশবান্ধব টেকসই মৎস্য ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধিতে চাষ ব্যবস্থাপনায় সঙ্কট ও সমস্যাদি

সম্পদ যেখানে বেশি এবং বিচিত্র সঙ্কট-সমস্যাও সেখানে অধিকতর। মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যার কথা বলতে গেলে মুক্ত জলাশয়, আধাবদ্ধ জলাশয় ও বদ্ধ জলাশায়ের সমস্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। সুন্দরবন ও চিংড়ি ঘের এলাকার সমস্যাবলীও ভিন্ন প্রকৃতির। এসব সমস্যার কিছু কিছু যেমন প্রযুক্তি, পুঁজি কিংবা উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত তেমন কিছু কিছু সমস্যা আবার সম্পদের উপর কর্তৃত্বের সাথে জড়িত যা সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অতি মুনাফালোভী ব্যক্তি বা দলীয় দাপটে সৃষ্ট। সুন্দরবন অঞ্চলের জলাশয়ে সমস্যাদি আবার পূর্বোক্ত সমস্যাদি থেকে সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন ধরনের যার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ভিন্নতর। আমার আলোচনা প্রধানত ঘের এলাকায় চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সঙ্কট-সমস্যাদিতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

খুলনা বিভাগেই দেশের সিংহভাগ চিংড়ি ঘের অবস্থিত যার যথাযথ চাষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে বিভাগের ৫টি চিংড়ি সমৃদ্ধ জেলায় ঘেরে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ঘেরে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার সমস্যাদি তুলনামূলকভাবে অধিকতর জটিল যার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. চিংড়ি চাষি ও দানাদার শস্য উৎপাদকের মধ্যে ঘের এলাকার পানি সরবরাহ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও বৈরীতা যা সমাধান যোগ্য হলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও তা আরো জটিলতর করে তোলা;

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অবঃ), মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

২. পরিবেশবান্ধব দানাদার শস্য ও চিংড়ি উৎপাদনের সুস্পষ্ট কার্যকর নীতিমালার অভাব;
৩. জলাশয়ে ও জমির প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উৎপাদন সম্ভাব্যতার বিচারে লাগসই উৎপাদনের স্বার্থে পৃথক পৃথক জোনে ভাগ বা অঞ্চলিকরণের অভাবে পারস্পরিক জঠিলতর দ্বন্দ্ব ও বৈরীতা;
৪. অতি মুনাফালোভীদের স্বপক্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান সঙ্কটকে অনেক ক্ষেত্রে আরো জটিলতর করে তোলার ফলে দানাদার শস্য ও চিংড়ির উৎপাদন বিঘ্নিত;
৫. চিংড়ি চাষের লক্ষ্যে ইজারা নেয়া জলা বা জমির মালিকদের যৌক্তিক ইজারা মূল্য সময়মত পরিশোধ না করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে চিংড়ি ঘের মালিক এবং জমি বা জলার মালিকের দ্বন্দ্ব ও বৈরীতা সৃষ্টি;
৬. জলাশয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির অভাব;
৭. প্রয়োজনীয় পুঁজি, পোনা ও চাষ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপকরণের অভাব ও অপ্রতুলতা;
৮. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় জনবলের অভাবে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবার অপ্রতুলতা;
৯. পরিবহন, যোগাযোগ ও টেকসই পর্যাপ্ত বাজার ব্যবস্থার অভাব;
১০. পরিবেশবান্ধব টেকসই চাষ-ব্যবস্থাপনার নীতিমালার অভাব;
১১. বন ও পবিবেশ, স্থানীয় সরকার, কৃষি ও অন্যান্য সংস্থার সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ের অভাব।

বিদ্যমান সঙ্কট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে তদারকি জোরদার করাসহ আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিভিন্ন শাস্তি ও জরিমানা আরোপে অধিকতর কঠোর মনোভাবাপন্ন হয়েছে, উৎপাদন থেকে রপ্তানি পর্যন্ত সকল স্তরের ব্যবস্থাপনায় হ্যাসাপ ও ট্র্যাসেবিলিটি বাস্তবায়নের সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছে, রাজনৈতিক প্রত্যয়-অঙ্গীকারকে সামনে রেখে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়া, ডিপো-আড়তের কার্যক্রম, মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার প্রক্রিয়াজাতকরণ আর নানা বিধির অনুসরণ ইত্যাদি সার্বিক বিষয়েই কমবেশি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে একথা যেমন সত্যি এই অবস্থার আরো অধিকতর উন্নয়ন দরকার একথাও তেমন অনস্বীকার্য। উৎপাদনের প্রথম স্তর থেকে রপ্তানি পর্যন্ত সকল স্তরের বিদ্যমান সমস্যাদির কার্যকর সমাধানের কোন বিকল্প নেই এবং তা করতে সকলেরই কমবেশি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এই সত্যের উপর বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং এ দেশের পনের কোটি মানুষকে নিরাপদ মৎস্যজাত খাবার সরবরাহের স্বার্থে এবং আমাদের রপ্তানিবাজার সম্প্রসারণে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্পৃক্ত সকলকে আরো অধিকতর নিষ্ঠা-সততা-দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।

উপকূলীয় চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধিতে চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র

বিদ্যমান বিচিত্রধর্মী এসব আর্থসামাজিক, জীবন-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত, সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত ইত্যাদি সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত কৌশলপত্র/সুপারিশ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে পরিবেশবান্ধব লাগসই চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপকূলীয় চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধি অনেকাংশেই ত্বরান্বিত হতে পারে।

১. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবেলার নিমিত্ত উপকুলবর্তী জেলাসমূহের স্থাপনাগত প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ঘটাতে হবে সকল সংস্থা ও জনগোষ্ঠীর সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে।
২. দেশি-বিদেশি সকল বিশেষজ্ঞবৃন্দের পরামর্শ ও সুপারিশকে সামনে রেখে সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও সম্পৃক্ত জনগণকে নিয়ে সকলের গ্রহণযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ-সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত সেবা জোরদার করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন তথা সকল পর্যায়ে দক্ষ জনবল আরো বাড়াতে হবে।
৪. স্থায়িত্বশীল কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের জন্যে আধাবদ্ধ ও বদ্ধ জলাশয়ের অধিকতর পরিবেশবান্ধব টেকসই চাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কার্যকর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে সমন্বিত উদ্যোগে।
৫. পরিবেশানুযায়ী উপকূলীয় এলাকায় মাছ/চিংড়ি/কাঁকড়া, গাছ ও দানাদার শস্যের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য সঙ্কট-বিপর্যয় কিংবা তাৎক্ষণিক পরিবর্তন সহ্য করতে সক্ষম প্রজাতি নির্বাচনে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।
৬. পরিবেশগত ভারসাম্যতা রক্ষা করে পরিবর্তিনশীল উপকূলীয় ও অন্যান্য এলাকার উপযোগী উন্নত জাতের মা মাছ ও চিংড়ির প্রাপ্যতা নিশ্চিৎ করে মাছের পোনা ও চিংড়ির পিএল সরবরাহ জোরদার করতে হবে।
৭. সার্বিক সমন্বিত পরিবেশ মাটি-পানি ও প্রয়োজনীয় উপকরণের জৈব-রাসায়নিক গুণাগুণ এবং অন্যান্য উপকারি কিংবা ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক কার্যকর গবেষণা করে উৎপাদনভিত্তিক অঞ্চলিকরণ করতে হবে।
৮. পশু ও মৎস্য খাদ্য আইন অনুযায়ী উৎপাদনকারী কারখানার মাধ্যমে টেকসই পরিবেশবান্ধব, জনস্বাস্থ্য সহায়ক এবং উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন উপকরণের যৌক্তিক প্রাপ্যতা নিশ্চিৎ করতে হবে।
৯. সরকারি-বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে অনুসরণযোগ্য আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতন এবং কর্মদক্ষ করে তুলতে হবে।
১০. সুন্দরবন এলাকায় সম্পৃক্ত সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগে

মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক প্রজনন এবং নার্সারি ক্ষেত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে মৌসুমি ও স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. মাছ ও চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুন্দরবন এলাকার সকল জলাশয় এবং মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন-ব্যবস্থাপনার সকল ধরনের কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত করতে হবে।

১২. সুন্দরবন এলাকার জন্যে প্রযোজ্য পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি শস্য উৎপাদন, পশুপাখি পালন, কাঠ উৎপাদন এবং মাছ/চিংড়ি উৎপাদন-আহরণের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. সকল ক্ষুদ্রাকার বদ্ধ জলাশয়ে একক এবং বৃহদাকার বদ্ধ জলাশয়ে প্রযোজ্য প্রযুক্তিতে সমাজভিত্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

১৪. সরকারি জলাশয়ে বর্তমান রাজস্বভিত্তিক ইজারা প্রথার বদলে উৎপাদনসহায়ক প্রকল্পভিত্তিক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ইজারা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বর্ধিত পরিবেশবান্ধব লাগসই মাছ ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী লাগসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ সেবা, পুঁজি, উপকরণ, ইত্যাদির বিদ্যমান সঙ্কট দূর করে টেকসই মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. মাছ ও চিংড়ি হ্যাচারি ও নার্সারি, ঘের ও খামার, মৎস্য ও পশুখাদ্য কারখানা, ডিপো ও আড়ৎ, সরবরাহকারী ও বিপণনকারী ইত্যাদি সম্পদগত ইউনিটকে নিবন্ধন এবং লাইসেন্সভুক্ত করে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যকর তত্ত্বাবধানে এসবের পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক অপ্রতিরোধ্য পরিবেশকে বাধা প্রদান নয় - এসবের পরিবর্তন ও গতি সহায়ক পন্থায় জমি-জলাশয়ের পৃথক পৃথক উৎপাদন অঞ্চলে ভাগ করে ঘেরের আয়তন অবস্থাভেদে ০.৫ থেকে ১.০ হেক্টরে সীমিত করে সম্পদের প্রাপ্যতা ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়নে আর্থসামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে।

১৮. সকল আধাবদ্ধ ও মুক্ত জলাশয়কে শিল্পবর্জ্য, কৃষি কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক দূষণমুক্ত রাখা, শ্রেণী পরিবর্তন ও দখলকৃত জলাশয় পুনরুদ্ধারে পরিবেশ ও আবাসস্থলের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

১৯. সকল বদ্ধ-আধাবদ্ধ এবং মুক্ত-আধামুক্ত জলাশয়, সুন্দরবন এলাকা, উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্র তথা পৃথক পৃথক সম্পদভিত্তিক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় সমন্বিত সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২০. সুন্দরবন বহির্ভূত অন্যান্য এলাকার মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক প্রজনন ও নার্সারি এলাকার সংরক্ষণ-উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।

২১. সুন্দরবন বহির্ভূত অন্যান্য এলাকার সম্ভাব্য জলাশয়ে স্থায়ী ও মৌসুমি মৎস্য/চিংড়ি অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ক্ষতিকারক পন্থায় অতিমাত্রার মাছ ও চিংড়ি আহরণ বন্ধ করে প্রাকৃতিক নবায়নযোগ্য মজুদ বাড়াতে হবে।

২২. মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাস ও তথ্যব্যাংক স্থাপন করে সম্পদের ঘনত্ব ও গুরুত্ব বিবেচনায় খাঁচায় মাছ চাষসহ টেকসই চাষ ব্যবস্থাপনার কার্যকর প্রযুক্তির বাস্তবায়ন করতে হবে।

২৩. উৎপাদন ও বিপণন উন্নয়নে যোগাযোগ, পরিবহন ও টেকসই বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে উৎপাদক, সরবরাহকারী, ডিপো-আড়ৎদার, প্রক্রিয়াজাতকারক, রপ্তানিকারক, ইত্যাদি স্টেকহোল্ডারদের সুবিধা দিতে হবে।

২৪. মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের স্বার্থে মাছ ও চিংড়ি চাষি, হ্যাচারি ও নার্সারি মালিক, আড়ৎ ও ডিপো মালিক এবং মৎস্যখাদ্য উৎপাদনকারীদের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ভর্তুকি বা সহজ সুদমুক্ত ঋণ দিতে হবে।

২৫. মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে ঘেরের ইজারা মূল্য, রেণু বা মাছের পোনা বা পিএল, খাবার মাছ ও চিংড়ি, মাছের খাবার, অন্যান্য উপকরণ, ইত্যাদির মূল্য ক্রেতাগণ দ্রুত পরিশোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে এহেন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়।

২৬. মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বজনস্বীকৃত সমন্বিত জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আওতায় মৎস্য, শস্য, বন, পরিবেশ, শিল্পসহ সকল সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ে সম্পর্ক উন্নয়নে টেকসই পরিবেশবান্ধব সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট আন্তঃসেক্টর দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে।

২৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থেই অত্যাবশ্যক বিধায় প্রত্যেক কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের কারখানায় তুলনামূলক কম কাজের সময়ে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সম্পদের কার্যকর সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে ও সময়ের যৌক্তিক দাবী আর তা করতে পারলেই আসতে পারে উপকূলীয় চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা। একটি কার্যকর উপকূলীয় চিংড়িচাষ ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সমস্যার পরিবেশবান্ধব টেকসই যৌক্তিক সমাধান দিতে পারলে এ দেশের চিংড়ি সম্পদ বৃদ্ধিতে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে এটাই আমাদের সকলের বিশ্বাস আর প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

এবিএম আনোয়ারুল ইসলাম[১]
মোঃ শফিকুল ইসলাম[২]
মোঃ আতিয়ার রহমান[৩]

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও সমুদ্রোপকূলবর্তী কৃষিপ্রধান ব-দ্বীপ রাষ্ট্র। এখানকার ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বরাবরই ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে কৃষিজ খাদ্য উৎপাদনে আমরা অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও তিন-চার দশক পূর্বে খাদ্য আমদানীকারক দেশ হিসেবেই এদেশের পরিচিতি ছিল। 'মাছে-ভাতে বাঙ্গালী' প্রবাদটি আর বর্তমান প্রেক্ষিতে ধোপে টেকে না। কারণ, ব্যক্তি পর্যায়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম আমিষ গ্রহণ করেই আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নয়-দারিদ্র্যসীমার নিচে। কাজেই প্রায় সব ভোগ্যপণ্যই সাধারণ নাগরিকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করার জন্য পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছে। কেননা খাদ্য উৎপাদন বিশ্বব্যাপীই নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হুমকির মুখোমুখি- অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদন কমে যাচ্ছে - যদিও বাড়ছে মানুষ। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেও খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম খাদ্য উপাদান - আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি আজ আর শুধু স্লোগান নয়, ন্যূনতম প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে কৃষিজ আমিষের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বাড়ানো রাতারাতি সম্ভব হয়ে উঠে না। এর জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। তাই আমাদের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম যোগান আসে যে মৎস্য খাত হতে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সবারই কাম্য। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পাশাপাশি দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম ক্ষেত্র আমাদের সামুদ্রিক অঞ্চলকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা গেলে খাদ্য নিরাপত্তা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন -এ দুটি ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং' প্রকল্প-এর বিশেষভাবে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা

বঙ্গোপসাগরের ৭১০ কিমি উপকূল ও ২০০ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত ১,৬৬,০০০ বর্গকিলোমিটার জলায়তন আমাদের দেশের মূল ভূখণ্ডের আয়তনের চেয়েও বেশি। এই বিপুল আয়তনের একটি ক্ষুদ্র অংশই মাত্র আমরা সম্পদ আহরণের কাজে লাগাতে পারছি। আমাদের সমুদ্র অঞ্চলে চারটি 'মৎস্য আহরণ এলাকা' (Fishing ground) রয়েছে; রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়িসহ বিপুল সম্ভাবনাময় জলজ সম্পদ। সমুদ্রের উপরিস্তর, মধ্যস্তর ও তলদেশে এই সব মৎস্য সম্পদের আবাস। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে নিয়োজিত রয়েছে দেশীয় কাঠের তৈরি প্রায় ৫০ হাজার অযান্ত্রিক ও যান্ত্রিক নৌযান এবং ১৫০টির মত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাতের তৈরি আধুনিক মৎস্য ট্রলার বহর। দেশে বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪.৯৭ লক্ষ মে. টন যা মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২০%। দেশের প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবী সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত এবং প্রায় ১৩.৫০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

দেশীয় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান দ্বারা সাগরের ৪০ কিমি গভীরতার ভিতরে ও ট্রলার বহর কর্তৃক ৪০ মিটারের অধিক গভীরতায় মাছ ধরার নিমিত্ত বিধিবিধান প্রচলিত রয়েছে। বেহুন্দি জাল, ফাঁস জাল, বড়শী, ট্রল জালসহ নানা ধরনের জাল ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সাগরে মৎস্য আহরণ করা হয়ে থাকে। ছোট আকারের ফাঁসযুক্ত জাল, মোহনা বেহুন্দি জাল, কোম জাল ইত্যাদিতে কিশোরবয়সী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছ ধরা পড়ে যা সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বংশবৃদ্ধির জন্য হুমকিস্বরূপ। সমুদ্রে প্রজননক্ষম (Brood stock) মাছের পরিমাণ একটি যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে না পারলে সামুদ্রিক মাছের টেকসই আহরণ সম্ভব হবে না - সমুদ্র ক্রমান্বয়ে মৎস্যশূন্য হয়ে পড়বে। বিশ্বে এরকম অনেক নজির রয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির হুমকিসমূহ

নানাবিধ কারণে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমকির মুখোমুখি। নিচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

১. **চিংড়ি পোনা/অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছ আহরণঃ** উপকূলীয় অঞ্চলে 'ঘের' বা পুকুরে বাগদা/গলদা চিংড়ির চাষ জনপ্রিয় ও কিছুটা প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে বাগদা/গলদা চিংড়ির পোনা আহরণ আইনত নিষিদ্ধ হলেও তা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন জরিপ ও

১ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বিএমএফসিবি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
২ সহকারী পরিচালক, বিএমএফসিবি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
৩ সহকারী পরিচালক, বিএমএফসিবি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি চিংড়ির পোনা ধরতে গিয়ে ১০০টি হতে ৩০০টি পর্যন্ত অন্যান্য প্রজাতির কিশোর ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছ/চিংড়ি ধরা পড়ে - যেগুলো সমুদ্রে ফিরে গিয়ে বড় হয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যোগান দিতে পারতো।

২. **ক্ষতিকর জাল-সরঞ্জামাদির ব্যবহারঃ** মোহনা বেহুন্দি জাল, কোম জাল, কারেন্ট জাল ও অন্যান্য ছোট ফাঁসযুক্ত জালের ব্যবহারের ফলে মোহনা অঞ্চলে ও নদীর খাড়িতে লক্ষ লক্ষ টন কিশোরবয়সী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদ ধরা পড়ছে। এতে করেও বিপুল পরিমাণে পরিণতবয়সী মৎস্য সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

৩. **মা বাগদা চিংড়ি আহরণঃ** বাগদা চিংড়ির হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত অপরিকল্পিতভাবে মা-চিংড়ি ধরার ফলে সমুদ্রে বাগদা চিংড়ির পরিমাণ যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি সাগরের তলদেশে একই এলাকায় বারবার ট্রলিং (Trawling) করার কারণে সাগরের তলদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এতে তলদেশীয় জীববৈচিত্র্যও হুমকির সম্মুখীন।

৪. **শামুক-ঝিনুক আহরণঃ** সমুদ্র উপকূলে বিশেষ করে কক্সবাজার অঞ্চলে সৈকতে ব্যাপকভাবে শামুক-ঝিনুক আহরণ করা হয়-যাতে প্রতিনিয়ত সমুদ্রের প্রতিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শামুক-ঝিনুক সাগরের পানি পরিশোধনে ও সৈকতের ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. **পরিবেশ দূষণঃ** কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও খুলনাসহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প কারাখানার বর্জ্য, চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে জাহাজ কাটা শিল্প হতে নির্গত দূষিত তেল ও বর্জ্য এবং কক্সবাজারের বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির বর্জ্য ইত্যাদি মোহনা অঞ্চলের পানিতে মিশে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে যার পরিণতিতে পোনা ও কিশোর বয়সী মাছ মারা যাচ্ছে- যেগুলো সাগরে ফিরে গিয়ে বড় হয়ে প্রকৃত মৎস্য উৎপাদনে যোগ হতে পারতো।

৬. **উপকূলীয় প্যারাবন (Mangrove) ধ্বংস ঃ** কক্সবাজার ও খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ, লবণ চাষ ও অন্যান্য ব্যবসায়িক/গৃহস্থালী কাজের জন্য ব্যাপক হারে প্যারাবন ধ্বংস করা হচ্ছে। প্যারাবনের অনুকূল পরিবেশে মাছ ও চিংড়ির জীবনচক্রের গুরুত্বপূর্ণ সময় শৈশব ও কৈশোর কেটে থাকে। প্যারাবন ধ্বংসের কারণে মাছ বা চিংড়ির পোনা বড় হয়ে সাগরে ফিরে যেতে পারছে না- প্রতিকূল পরিবেশে অকালে ঝরে যাচ্ছে।

উপকূলীয় প্রতিবেশ বিপর্যয়ের জন্য উল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও বিদেশি জাহাজ কর্তৃক রাসায়নিক বর্জ্য নিক্ষেপ, বিদেশি জাহাজে আনীত পানি (Blast Water) পরিবর্তন, তিমি ও হাঙ্গর ধরা, কচ্ছপ নিধন ও আরও অনেক মনুষ্যসৃষ্ট কারণ রয়েছে। এছাড়াও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে ধীর লয়ে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। তার ফলে সাগরের পানির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাতে সাগরের প্রাকৃতিক খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন ব্যাহত হবে। ফলশ্রুতিতে সাগরের প্রাকৃতিক খাদ্য চক্রের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং এতে করে মাছসহ অন্যান্য জলজ সম্পদ বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে।

সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোর উপায়সমূহ

আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে ঠিকই কিন্তু মৎস্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামাদির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে 'প্রতি প্রচেষ্টায় আহরণ' (Catch per unit effort) কমে যাচ্ছে এবং সে কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে মৎস্যজীবীদের আয়ও প্রতিনিয়ত কমছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি উপায় রয়েছে।

১. প্রজাতি নির্বিশেষে মাছের বাৎসরিক আহরণ এমন পর্যায়ে রাখা যাতে কিছু মাছ বড় হয়ে ডিম ছাড়ার উপযোগী হয় এবং সেই ডিম ফোটার পর সেগুলো প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে পুনরায় যুক্তিযুক্ত মৎস্য আহরণের পর্যায়ে আসে। বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তভিত্তিক জরিপ কাজের মাধ্যমে মৎস্য আহরণের প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে টেকসই মৎস্য আহরণ করা সম্ভব। যাতে করে প্রতিবছরই টেকসই মাত্রায় মৎস্য আহরণ করা যাবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মা মাছ সাগরে তৈরি হবে যা থেকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় মৎস্য সম্পদের যোগান আসবে। আমাদের দেশে মূলত মুক্ত জলাশয়ের টেকসই আহরণ পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) পদ্ধতির কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমুদ্রে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কম ব্যয়-সাপেক্ষ ও অধিক গ্রহণযোগ্য।

'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'-এর আওতায় যে জরিপ জাহাজ ক্রয় করা হচ্ছে সেটির মাধ্যমে আমাদের ২০০ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত সমুদ্র অঞ্চলের উপরিতল (Pelagic), তলদেশীয় (Demarsal) ও চিংড়ি সম্পদের প্রকৃত মজুদের পরিমান, সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রার আহরণ এবং অন্যান্য জীবতাত্ত্বিক (Biological) ও সমুদ্রতাত্ত্বিক (Oceanographic) তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। এ সকল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার নিরিখে মৎস্য নৌযানসমূহের দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের এলাকা, মৌসুম ও সংখ্যা (Effort) নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে, টেকসই মৎস্য আহরণ সম্ভব হবে।

২. খাঁচায় মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করে উপকূলীয় অঞ্চলে ও সমুদ্রে নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ উৎপাদন সম্ভব। সমুদ্রে এমনিতেই প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে, তদুপরি সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করে এর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। অবশ্য সমুদ্রের কোন অংশে খাঁচায় মাছ চাষের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে তা যাচাই করেই এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়। প্রাথমিকভাবে বলা যায় যে, আমাদের উপকূলে ও সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার স্রোতের তীব্রতা, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বৈরীতা, ইত্যাদি কারণে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল যেমন, সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ, কক্সবাজার ও খুলনার মোহনা অঞ্চলে ভেটকি বা কোরাল মাছ, বোল মাছসহ বেশ কিছু মাছ এবং কন্তুরা, সাগর শশা, সাগর গুল্ম, ইত্যাদি চাষের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সম্ভাবতা যাচাইয়ের মাধ্যমে এবং গবেষণা ও জরিপ কাজ সম্পাদন করে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদের উদ্যোগ নিলে প্রাণিজ আমিষ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে জরিপ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

বিশাল বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের ভাণ্ডার কী পর্যায়ে রয়েছে তা জানার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জরিপ কার্যক্রম প্রয়োজন। এটিকে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক পর্যায় বলা যায়। আমাদের দেশে বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বেশ কিছু জরিপ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এসব জরিপ থেকে আমাদের সামুদ্রিক এলাকায় চারটি 'ফিসিং গ্রাউন্ড' আবিষ্কৃত হয়েছে। তলদেশীয় মাছ ও চিংড়ির মজুদ (Standing stock) ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণযোগ্য পরিমাণ (Maximum Sustainable Yield) নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিগত ১০-১৫ বছর ধরে মৎস্য অধিদপ্তরের জরিপ জাহাজ 'আরভি মাছরাঙা' ও 'আরভি অনুসন্ধানী' বিকল হওয়ায় ও কার্যক্ষম না থাকায় বর্তমানে সমুদ্রে মাছের মজুদ ও আহরণযোগ্য মৎস্যসম্পদের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। অথচ মাত্রাতিরিক্ত আহরণ (Over-fishing) সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মতো নবায়নযোগ্য (Renewable) প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যময় ভাণ্ডারকেও নিঃশেষ করে দিতে পারে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে বর্তমানে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' ও মালয়েশিয়া সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'-এর মাধ্যমে একটি আধুনিক জরিপ জাহাজ ক্রয় এবং ল্যান্ডবেইজড্ সার্ভে, পেলাজিক ও ডিমার্সাল সার্ভে সম্পাদনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার নিমিত্ত নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় এমসিএস-এর ব্যবহার

বর্তমানে বিশ্বব্যাপীই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স সংক্ষেপে MCS পদ্ধতির ব্যাপক সমন্বিত ব্যবহার চলছে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রচলিত মৎস্য আইনসমূহ প্রয়োগের সমন্বয়ে মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়ন্ত্রণ ও আইনসমূহ প্রয়োগে বাস্তব তদারকির মাধ্যমে এই MCS পদ্ধতির ব্যবহার একটি দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বহুলাংশে বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় খুবই অপ্রতুল জনবল ও একটিমাত্র সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট রয়েছে। কাজেই সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে MCS কার্যকর করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল বাড়ানো, সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টের উন্নয়ন ও সংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি এবং মৎস্যজীবী তথা দেশবাসীকে সম্পৃক্ত করে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। চলমান 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'-এর আওতায় শক্তিশালী ডেটাবেইজ ও ভ্যাসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম (Vessel Tracking Monitoring System- VTMS) স্থাপনের মাধ্যমে অচিরেই আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সন্নিবেশ করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে, দেশের মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মৎস্যজীবী পরিবারের কর্মচাঞ্চল্য বাড়বে ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার শতকরা ২০ভাগ উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপসংহার

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মিঠাপানির মৎস্যসম্পদ ক্রমান্বয়ে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায়, সামুদ্রিক মৎস্য তথা জলজ সম্পদকে লালন-পালনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া ও খাদ্য নিরাপত্তায় মৎস্য সম্পদের অবদান বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন শুরু করার এখনই সময়। এই প্রেক্ষাপটে গৃহীত 'ভিশন ২০২১' এর আওতায় মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার নিমিত্ত সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের কোন বিকল্প নেই। 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প' এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও গুণগতমান সম্পন্ন শুটকি মাছ উৎপাদন

ড. এম জলিলুর রহমান[১]
ড. এম শাহাব উদ্দিন[২]

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশে, বিশেষকরে উপকূলীয় এলাকাতে, শুটকি অত্যন্ত জনপ্রিয় মৎস্য পণ্য। দেখা গেছে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান দ্বারা আহরিত মাছের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ প্রচলিত পদ্ধতিতে রৌদ্রে শুকিয়ে শুটকি করা হয় ও আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় করা হয়। বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ শুটকি তৈরির এলাকাগুলো হলো কক্সবাজারের নাজিরারটেক, সোনাদিয়া দ্বীপ ও শাহপরীর দ্বীপ এবং খুলনার দুবলার চর এলাকা। আর এ শুটকি তৈরির জন্য মাছ ধরা, মাছ আনা, মাছ বাছাই, মাছ রৌদ্রে দেওয়া ও তার প্রয়োজনীয় পরিচর্যার মাধ্যমে শুটকি তৈরি করে বাজারজাত করা, ইত্যাদি কার্যক্রমে অসংখ্য শ্রমিক ও ব্যবসায়ী জড়িত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী। তাই নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য শুটকিমহালগুলো বিশেষভাবে অবদান রাখছে। কিন্তু এই প্রচলিত পদ্ধতিতে তৈরি শুটকির প্রধান সমস্যা হচ্ছে শুটকি উৎপাদনকারীরা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন করে না। প্রথমত মাছ সংগ্রহের সময় কম দামে ক্রয়ের জন্য পচা না তাজা মাছ সে ব্যাপারে বাছ-বিচার করে না। তাছাড়া, মাছ সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয় না বলে মাছের গায়ে কাদা-মাটি লেগেই থাকে। অন্যদিকে মাছ বেশি পচা হলে বা আবহাওয়াজনিত কারণে বেশি পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে লবণ মেশান হয়। মাছ বাছাই ও লবণ দেওয়ার প্রক্রিয়া সরাসরি মাটিতে, কখনোবা চাটাইতে করা হয়। আশপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপর খুব একটা নজর দেওয়া হয় না। তাছাড়া, অপরিশোধিত কাদা-মাটি মিশ্রিত লবণই মেশানো হয় এবং চারধারে অসংখ্য কুকুর থাকে যেগুলো শুটকি তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে শুটকি খাচ্ছে ফলে জলাতঙ্কের মত রোগ সংক্রমণেরও আশঙ্কা থাকে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে শুটকি তৈরির বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর দিকগুলো যেমন-ধুলা-কাদা, মাছি, কুকুর, ইত্যাদির সংক্রমণ ও সর্বোপরি কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি তৈরির জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক সার্বক্ষণিক, অর্থাৎ রাত-দিন ২৪ ঘন্টা ব্যবহার উপযোগী ড্রায়ার উদ্ভাবিত হয়েছে। সদ্য উদ্ভাবিত এই নতুন ড্রায়ারটির নাম রাখা হয়েছে বিএফআরআই ফিস ড্রায়ার। এই ড্রায়ারটির মাধ্যমে শুটকি তৈরির স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত গুণগতমান সম্পন্ন শুটকি মাছ তৈরি করা যায়। এই নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি দ্বারা স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত গুণগতমান সম্পন্ন শুটকি মাছ তৈরি করার বিভিন্ন দিক সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারের গঠনগত বর্ণনা

বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারে সৌর শক্তি ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে দু'টি মডেল তৈরি করা হয়েছে। এই মডেল দু'টিকে যথাক্রমে সৌর মডেল ও বৈদ্যুতিক মডেল বলা হয়। যেস্থানে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির প্রাপ্যতা আছে সেখানে বৈদ্যুতিক মডেল আর যে স্থানে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তি নেই সেখানে সৌর মডেল ব্যবহার করা যায়। এই উদ্ভাবিত বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারের উভয় মডেলের মূল কাঠামো কাঠের তৈরি এবং আকার ও আকৃতিতে একই। প্রথমে কাঠ দ্বারা ১.০ মি. প্রস্থ ও ৫.৫ মি. দৈর্ঘের একটা আয়তাকার ড্রায়ার কাঠামো তৈরি করা হয় যা দেখতে অনেকটা আয়তাকার টানেলের মত মনে হয় (চিত্র ১)। টানেলের এক মুখে দরজা ও অন্য মুখে বাতাস বের হওয়ার জন্য নেট লাগানো হয় (চিত্র ২)।

চিত্র ১ঃ বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারের আয়তাকার ড্রায়ার কাঠামো

দরজা যুক্ত মুখে একটা কাঠের পাটাতনের উপর একটি ফ্যান ও একটি হট-প্লেট বা গ্যাস চুল্লি স্থাপনের ব্যবস্থা থাকে। মেঝে কালো রং করা হয়। ড্রায়ারের উপরে ৪৫০ ঢালু করে ঢাকনা থাকে (চিত্র ৩)। শুধুমাত্র নেটের প্রান্ত ছাড়া অন্যান্য সকল পার্শ্বে (ঢাকনা ও দরজাসহ) দুই স্তরে ০.২ মিমি পুরুত্বের স্বচ্ছ সেলুলয়েড লাগান হয়। অবশ্য সৌর মডেলের এক প্রান্তে একটি সোলার প্যানেল (২০/৩০ ইঞ্চি) স্থাপন করা হয়। সোলার প্যানেলের ফটোভোল্টিক সেল সূর্যের তাপ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে ফ্যান চালানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু যেখানে বিদ্যুৎ আছে খোনে এই কাজের জন্য সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করাই শ্রেয়। সূর্যালোকের অভাবে (রাতে বা মেঘলা দিনে) তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য সৌর মডেলে গ্যাস চুল্লি ও বৈদ্যুতিক মডেলে হট-প্লেট ব্যবহৃত হয়।

১ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
২ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

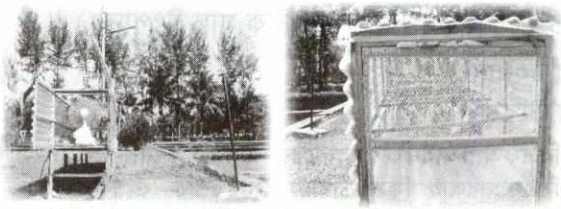

চিত্র ২ঃ বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারের এক মুখে দরজা (ক) ও অন্য মুখে বাতাস বের হওয়ার নেট (খ)

চিত্র ৩ঃ বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারের ৪৫০ ঢালু করে ঢাকনা স্থাপন

উভয় মডেলে স্বচ্ছ সেলুলয়েডের মধ্য দিয়ে সূর্যকিরণ ভিতরে প্রবেশ করে ও কালো অংশে শোষিত হয়ে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় যা ড্রায়ারের ভেতরের বাতাস গরম করে। এই গরম বাতাস ফ্যানের মাধ্যমে মাছের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে দ্রুত মাছ শুকানো হয়। স্বচ্ছ পলিথিনের ঢাকনা থাকায় বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর দিকগুলি যেমন-ধুলা-কাদা, মাছি, কুকুর, ইত্যাদির সংক্রমণ ও সর্বোপরি কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি তৈরি করা হয় (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪ঃ বিএফআরআই ফিস ড্রায়ারে শুটকি উৎপাদনের দৃশ্য অবলোকন করছেন মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্যসম্মত ও গুণগতমান সম্পন্ন শুটকি উৎপাদনে বিএফআরআই ফিশ ড্রায়ার পদ্ধতি

বিদেশে রপ্তানির জন্যই হোক আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের সচেতন ও সামর্থ্যবান ক্রেতাদের জন্যই হোক, বিএফআরআই ফিস ড্রায়ার ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসম্মত ও গুণগতমান সম্পন্ন শুটকি তৈরির জন্য নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা যেতে পারে:

- সাধারণভাবে খাওয়ার উপযোগী টাটকা মাছ জোগাড় করে (কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত পচা মাছ ব্যবহার করা যাবে না) পরিষ্কার পানি দ্বারা ধুয়ে চকচকে করা।
- মাছগুলোকে প্রথমে প্রজাতি ভেদে বাছাই করা ও পরে একই প্রজাতির মধ্য থেকে আকার ও জৈবিক অবস্থা (ডিম/চর্বির পরিমাণ) ভেদে বাছাই করা। বেশি চর্বি/ডিম যুক্ত মাছ শুটকি করার জন্য উপযুক্ত নয়।
- প্রজাতি ও আকার ভেদে এবং ক্রেতার চাহিদানুসারে মাছের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করা, আঁইশ ফেলা ও স্লাইস করে আংশিক কেটে ড্রেসিং করে নেওয়া। যেমন, ছুরি মাছের পেটে অন্য মাছ থাকলে পেট কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করা জরুরি কিন্তু রূপচান্দার ক্ষেত্রে পেট কাটা জরুরি নয় কিন্তু দেহের এক পাশে একটি মাত্র উপর থেকে নিচে স্লাইস করে ফাকা করে দেওয়া জরুরি।
- ড্রেসিং করা মাছগুলো থেকে অতিরিক্ত পানি ঝরিয়ে নিয়ে বড়শির সাহায্যে মাথা উপরের দিকে দিয়ে কাঠের আড়াতে সারিবদ্ধভাবে ড্রায়ারের নির্দিষ্ট স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন একটি মাছ থেকে আর একটি মাছ কিছুটা ফাঁকা থাকে ও সহজে সব মাছের উপর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। একটি ড্রায়ারে সর্বোচ্চ ৫০ কেজি কাঁচা মাছ শুকানোর জন্য দেওয়া যেতে পারে।
- মাছ দেওয়া শেষ হলে, ড্রায়ারের মাঝামাঝি স্থানে একটি ম্যাক্সিমাম-মিনিমাম থার্মোমিটার ঝুলিয়ে দিয়ে তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে। পরে ঢাকনাটি বন্ধ করে দরজা খুলে ফ্যান চালু করতে হবে। তারপর তাপমাত্রা ও রোদের উপস্থিতি/অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে হট-প্লেট চালু ও তাপমাত্রার লেভেল ঠিক করতে হবে।
- কয়েক ঘণ্টা পরপর তাপমাত্রা তদারকি করে এবং হট-প্লেট বন্ধ/চালু করতে হবে, সাথে সাথে লেভেল সেটিং প্রয়োজনে পরিবর্তন করে তাপমাত্রা যাতে ৪৫-৫৫°সে. থাকে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।
- একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রয়োজনে ফ্যান/হট-প্লেটের কাছের মাছগুলোকে ড্রায়ারের পিছনের দিকে এবং পিছনের মাছগুলোকে সামনের দিকে দিয়ে শুকানোর মাত্রায় সমতা আনতে হবে।
- এইভাবে একাধারে তিনদিন শুকানোর পরে শুকনা মাছের ওজন যখন ১২-১৩ কেজির (অর্থাৎ প্রতি ০৪ কেজি কাঁচা মাছ শুকিয়ে ০১ কেজি শুটকি হবে) মধ্যে আসবে তখন শুটকি প্যাকেট করার উপযুক্ত হয়েছে বলে ধরে ড্রায়ার থেকে সরিয়ে নিতে হবে।
- ড্রায়ার থেকে সরিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আধা কেজি বা এক কেজি আকারের প্যাকেট করে রাখতে হবে। প্যাকেট করে অল্পদিন সংরক্ষণের জন্য স্বচ্ছ পলিথিন, মাঝারি মেয়াদি সংরক্ষণের জন্য স্বচ্ছ সেলুলয়েড ও দীর্ঘ মেয়াদি সংরক্ষণের জন্য স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বৈয়ম ব্যবহার করা ভাল। সবশেষে, সঠিকভাবে লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত/গুদামজাত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে শুটকি তৈরির অস্বাস্থ্যকর দিকগুলো যেমন-ধুলা-কাদা, মাছি, কুকুর, ইত্যাদির সংক্রমণ ও সর্বোপরি কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত ও গুণগতমান সম্পন্ন শুটকি তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ড্রায়ার প্রযুক্তিটি।

মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স ঃ কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা

মোঃ মঞ্জুর কাদির[১]
মোঃ মনিরুজ্জামান[২]
মোঃ মুখলেসুর রহমান[৩]

বাংলাদেশ একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। ব্যানবেইস (বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো- BANBEIS পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা জরিপ ২০০৮ অনুযায়ী দেখা যায় মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযুক্ত জনসংখ্যার ৪৫.০৯% স্কুলে পড়াশুনা করে। মাধ্যমিক চক্র সমাপ্তির হার মাত্র ৩৮.৬২% এবং ঝরে পড়ার হার ৬১.৩৮%। ঝরে পাড়ার এই বিশাল অংশের ছাত্র/ছাত্রীর কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবলে পরিণত করতে পারলে তাদের সহজ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। একই সঙ্গে তারা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে। তাছাড়া উন্নত বিশ্বে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অধিক জনসংখ্যার দেশ হিসেবে এ সুযোগকে সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ আবশ্যক।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসার মাননিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সনদের স্বীকৃতি বিষয়ক গুরুত্বের কারণে পর্যায়ক্রমে পলিটেকনিক, মনোটেকনিক, সার্ভে প্রযুক্তি, বস্ত্র প্রযুক্তি, কৃষি প্রযুক্তি, মেরিন টেকনোলজি, এনিম্যাল হেলথ এন্ড প্রোডাকশন টেকনোলজি, ফুড ও বেভারেজ প্রযুক্তি, পর্যটন প্রযুক্তি, বিউটিফিকেশন প্রযুক্তি, লেদার ও কেমিক্যাল, কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স, ইলেট্রিক্যাল, স্বাস্থ্যসেবা, ইলেক্ট্রো-মেডিকেল প্রযুক্তি, যুব উন্নয়ন বিষয়ক প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে সমন্বয় করে চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সে কারণে অন্যান্য শিক্ষাক্রমের মতই জাতীয় প্রয়োজনে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মৎস্য ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে চালু করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কোর্স কারিকুলাম ও বোর্ডের বিধি অনুযায়ী এ শিক্ষাক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বোর্ড কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড Technical Education Act, 1967 (EP Act No-1 of 1967) Section-40(c)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ডিপ্লোমা কোর্সসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দুর্নীতি মুক্ত, সমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে 'ভিশন-২০২১' প্রণয়ন করেছে। 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। সে লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর ২০% কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স

মৎস্য অধিদপ্তরাধীন মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাংলাদেশে মৎস্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। এ কোর্স একদিকে যেমন মধ্য পর্যায়ে মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে, অপরদিকে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ শিক্ষাক্রমের প্রচলন করা ছিল সময়ের দাবী। এ শিক্ষাক্রমের প্রচলন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করার উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশে নতুন নয়। মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা, এমনকি জেলেরাও ইতোমধ্যে অনেক মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা কৌশলের সাথে খাপ খেয়ে নিয়েছে। মৎস্য সেক্টরের কার্যক্রম যেমন-পুকুরে মাছ চাষ, মৎস্য খামার পরিচালনা, হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, প্লাবনভুমিতে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইত্যাদি বর্তমানে সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই ধরনের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তির অধিকাংশই অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানে লাগসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও স্থায়িত্বশীল মৎস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও কারিগরি প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্পটি সরকারের অনুমোদন ক্রমে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্য পর্যায়ের কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের

১ প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
২ সহকারী পরিচালক, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
৩ উপ-সহকারী পরিচালক, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

প্রেক্ষিতে ২০০৯-২০১০ শিক্ষা বর্ষ হতে ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্সের প্রচলন করা হয়েছে। ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্সের সফল সমাপনান্তে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় সনদপত্রধারী যোগ্য, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীগণ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ ও গবেষণামূলক সংস্থা, ব্যাংক, বিভিন্ন হ্যাচারি-নার্সারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান এবং এহেন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত এনজিও-তে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে এই পর্যায়ের দক্ষ ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি রপ্তানি করারও সুযোগ রয়েছে। এতে করে একদিকে যেমন ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য

- যোগ্য শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে মধ্য পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য খামার, মৎস্য খাদ্য কারখানা, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, এনজিও, ইত্যাদিতে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে দক্ষ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- প্রকল্পের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চাঁদপুরস্থ মৎস্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-এ সফলভাবে ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রকল্পের ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান।

প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম

- মৎস্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (এফটিআই), চাঁদপুর-এ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর অধীন ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রম চালু করা।
- ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রমে প্রতি বছর ২৫ জন করে ৪ বছরে মোট ১০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (এফটিআই), চাঁদপুর-এ ৪ তলা বিশিষ্ট ১২০০০ বর্গফুটের মোট ৪৯ কক্ষবিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মাণ করা।
- প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য প্রশিণ ইন্সটিটিউট (এফটিআই), চাঁদপুর-এ ২ তলা বিশিষ্ট ৫১২০ বর্গফুটের একটি কাসরুম-কাম-ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা।
- হোস্টেল, কাসরুম ও ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্থান করা।
- ইন্টারনেট সুবিধাসহ অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব নির্মাণ করা।
- মৎস্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, চাঁদপুরে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রমে প্রতি বছর ২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে পাঠদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রমের ১ম ব্যাচ-এর কোর্স সম্পন্ন করা।
- ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রমের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প কর্তৃক প্রণয়নকৃত সিলেবাস মুদ্রণ করা।
- ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রমের কোর্স কাঠামো প্রণয়ন এবং সিলেবাস প্রণয়ন করা।
- ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ৪১টি বই প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা।

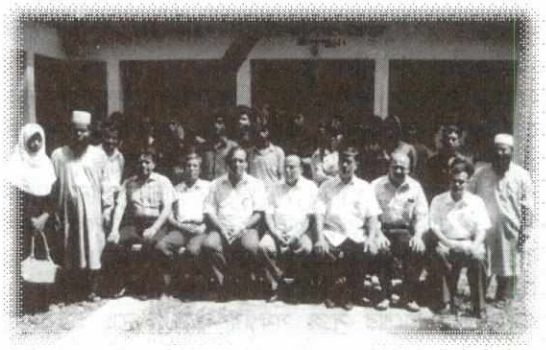

চিত্র ঃ ১ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ অধ্যক্ষ, প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-শিক্ষকবৃন্দ

ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ-এর কোর্স কাঠামো

বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ শিক্ষাক্রমে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর শিক্ষকবৃন্দ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ-এর গবেষকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে সর্বমোট ১৫৭ ক্রেডিট ঘণ্টার ৪(চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্সে কোর্সকাঠামো ও সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। চার বছরের এ কোর্স ৮টি সিমেস্টারে বিভক্ত। প্রতিটি সিমেস্টার ৬ মাস মেয়াদী। সিমেস্টারভিত্তিক পাঠ্য বিষয়সমূহ অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।

সেমি	ক্রমিক নং	বিষয়	তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	ক্রেডিট
প্রথম	১	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ পরিচিতি ও সম্ভাবনা	২	৩	৩
	২	জলজ প্রাণিবিদ্যা	২	৩	৩
	৩	বাংলা	২	০	২
	৪	ইংরেজি-১	২	০	২
	৫	গণিত-১	২	৩	৩
	৬	পদার্থ	২	৩	৩
	৭	রসায়ন-১	২	৩	৩
	৮	উদ্ভিদবিদ্যা	২	৩	৩
		মোট	১৬	১৮	২২
দ্বিতীয়	১	ইংরেজি-২	২	০	২
	২	গণিত-২	২	৩	৩
	৩	রসায়ন-২	২	৩	৩
	৪	ভৌত-রাসায়নিক জলাশয়তত্ত্ব	২	৩	৩
	৫	মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা	২	৩	৩
	৬	পরিবেশবিদ্যা	২	৩	৩
	৭	কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন্স-১	১	৬	৩
	৮	শরীরচর্চা	১	৩	২
		মোট	১৪	২৪	২২
তৃতীয়	১	বাংলাদেশের কৃষি পরিচিতি ও উৎপাদনের উপাদান	২	৩	৩
	২	স্বাদু পানির বাস্তুবিদ্যা	২	৩	৩
	৩	ইখথায়োলজি	২	৩	৩
	৪	গৃহপালিত পশু ও পাখি পালন	২	৩	৩
	৫	কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন্স-২	১	৬	৩
	৬	মৎস্যচাষ প্রকৌশল-১	২	৩	৩
	৭	জীব জলাশয়তত্ত্ব	২	৩	৩
		মোট	১৩	২৪	২১
চতুর্থ	১	বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা-১	২	৩	৩
	২	মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা	২	০	৩
	৩	মৎস্য রোগতত্ত্ব ও পরজীবী বিদ্যা	২	৩	৩
	৪	নার্সারি ব্যবস্থাপনা	২	৩	৩
	৫	মৎস্য খাদ্য ও পুষ্টিবিদ্যা-১	২	৩	৩
	৬	মৎস্য শারীরতত্ত্ব	২	৩	৩
	৭	মৎস্যচাষ প্রকৌশল-২	২	৩	৩
	৮	জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	২	০	৩
		মোট	১৬	১৮	২২
পঞ্চম	১	মৎস্য খাদ্য ও পুষ্টিবিদ্যা-২	২	৩	৩
	২	চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা	২	৩	৩
	৩	ফিসারিজ মাইক্রোবায়োলজি-১	২	৩	৩
	৪	কৃষি সম্পসারণ	২	৩	৩
	৫	বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা-২	২	৩	৩
	৬	মাছের রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা	২	৩	৩
	৭	মৎস্য হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা	২	৩	৩
	৮	পরিমিতি ও পরিসংখ্যান	২	০	৩
		মোট	১৬	২১	২৩
ষষ্ঠ	১	চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা	২	৩	৩
	২	ফিসারিজ মাইক্রোবায়োলজি-২	২	৩	৩
	৩	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য	২	৩	৩
	৪	মৎস্য আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ	২	৩	৩
	৫	মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	২	৩	৩
	৬	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ	২	৩	৩
	৭	কৃষি অর্থনীতি	২	৩	৩
		মোট	১৪	২১	২১
সপ্তম	১	মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ	২	৩	৩
	২	মার্কেটিং ও সমবায়	২	৩	৩
	৩	মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা	২	৩	৩
	৪	সমন্বিত মৎস্যচাষ	২	৩	৩
	৫	বুককিপিং ও একাউন্টিং	২	০	২
	৬	কৌলিতত্ত্ব ও মৎস্য প্রজনন	২	৩	৩
	৮	আত্মকর্মসংস্থান (উদ্যোক্তা উন্নয়ন)	২	৩	৩
		মোট	১৪	১৮	২০
অষ্টম	১	খামার সংযুক্তি প্রশিক্ষণ	০	১৮	৬
		মোট	০	১৮	৬
সর্বমোট			১০৩	১৬২	১৫৭

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সম্ভাব্য পরিবর্তন/ফলাফল

- প্রকল্প মেয়াদকালে একটি ব্যাচের মোট ২৫ জন শিার্থী ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স-এর সফল সমাপনান্তে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সনদপত্র অর্জন করবে এবং চার বছরে অপর চারটি ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ অধ্যয়নরত থাকবে।
- প্রকল্প মেয়াদোত্তর উক্ত কোর্সের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে মৎস্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, চাঁদপুরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে সংস্থান করা হবে।
- ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ সনদপত্রধারীগণ মৎস্য সেক্টরের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ২য় শ্রেণীর পদে নিয়োগের সুয়োগ পাবেন।
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ ও গবেষণামূলক সংস্থা, ব্যাংক, বিভিন্ন হ্যাচারি-নার্সারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান এবং এহেন কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ত এনজিও-তে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে।

চিত্র ঃ ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ শিক্ষাক্রমের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

উপসংহার

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) ২০১৫ সালের মধ্যে অজিতব্য নির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)-এ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত এই মৎস্য উপখাত বলিষ্ঠ ও কার্যকর অবদান রাখবে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রণীত মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) -এর সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে এই প্রকল্প ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করাতে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মধ্য পর্যায়ের এই জনশক্তি বিশেষ অবদান রাখবে। এতে করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, সুফলভোগী তথা মৎস্যচাষিসহ পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অন্যান্য সুফলভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে আন্তঃসম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। আর এ সমস্ত সাফল্য নির্ভর করছে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মসম্পাদনে আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের উপর।

ফলাবো মাছ আমিষ বেশ
খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

ড. মোহাঃ সাইনার আলম

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। এ অপার সম্ভাবনাময় খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮-এর আলোকে প্রণীত বিভিন্ন কৌশল ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ধারাবহিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য উপখাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে উল্লিখিত কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য মৎস্য সাব-সেক্টর রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ ও স্থায়িত্বশীল করার নিমিত্ত মৎস্য উপখাত এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। রূপকল্প ২০২১ এর আওতায় গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিবেচনায় রেখে ইতোমধ্যেই মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং জাতীয় মধ্যমেয়াদী অগ্রাধিকারমূলক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) প্রণয়নের কাজ অগ্রসরমান রয়েছে। এসব পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

মৎস্য উৎপাদনে জলজসম্পদে গুরুত্ব

জলসম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পুকুর-দীঘি, ডোবা-নালা, হাওর-বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। দেশব্যাপী জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য খাল-বিল ও নদী-নালা। এছাড়াও রয়েছে সম্ভাবনাময় বঙ্গোপসাগরের বিশাল

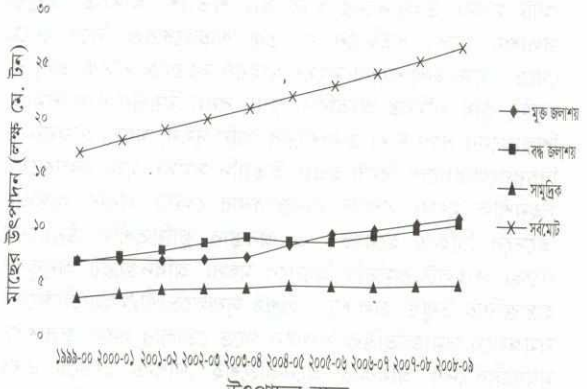

বিগত ১০ বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে মাছের উৎপাদন

জলরাশি। মৎস্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ বছরে এ সকল জলাশয় থেকে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ২৭.০১ লক্ষ মে টন। গত ১০ বছরের উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের চাহিদামাফিক ও সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে এ খাতের মৎস্য উৎপাদন ভিত্তি বছরের উৎপাদনের চেয়ে প্রায় ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরগুলোতে নদ-নদী ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণ আশানুরূপ বৃদ্ধি না পেলেও সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে একই সময়ের ব্যবধানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৮ শতাংশ। এতদসত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে মৎস্য উৎপাদনের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান মাছের চাহিদা ও উন্নয়ন সুযোগের তুলনায় নিতান্তই কম বলে প্রতীয়মান হয়।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপামর দরিদ্র জনসাধারণের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং রপ্তানির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন;
- মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনমানের উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধি;
- ঈপ্সিত সুফল প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র, ভূমিহীন, মহিলা ও সুবিধাবঞ্চিতদের দারিদ্র হ্রাসকরণ;
- অবক্ষয়িত জলজ পরিবেশের উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- মৎস্য আহরণোত্তর ক্ষতি কমানোর নিমিত্ত মৎস্য পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ এবং বিপণনের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা মানের উন্নয়ন;
- মৎস্য গবেষণা, সম্প্রসারণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদারকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতি মোকাবেলার লক্ষ্যে অভিযোজন কার্যক্রম জোরদারকরণ।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সমস্যা ও উন্নয়ন কৌশলসমূহ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত রোড-ম্যাপ অনুযায়ী বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা গেলেও মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানো, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ক্রমধারায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা এবং উন্নয়ন কৌশলসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

০১. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ঃ দেশের বদ্ধ জলাশয়গুলো মাছ

সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

উৎপাদনের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার পুকুর-দীঘি, বাঁওড় ও চিংড়ি খামার এবং চাষোপযোগী অসংখ্য মৌসুমী জলাশয়। সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহার অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালার অভাব, বেসরকারী পুকুর-দীঘির যৌথ মালিকানা, জলাশয়ের পানির প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃখাত ব্যবহার, পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব, উৎপাদন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির অভাব, দক্ষ জনবলের অপর্যাপ্ততা, চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্যাসমূহ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ সালের হিসাব মতে দেশের মোট ৫.২৮ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় থেকে ১০.৬৩ লক্ষ মে.টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে। যদিও অভ্যন্তরীণ মোট জলজ সম্পদের মাত্র ১২ শতাংশ বদ্ধ জলাশয় তথাপি এর থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন মোট উৎপাদনের প্রায় ৪৯ শতাংশ। বর্তমানে পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি ধানক্ষেত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জলাশয়ে (ক্রিক) মৎস্যচাষও ব্যাপক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অন্যদিকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজপ্রাপ্যতা। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, মাছচাষে বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমানে দেশে ১১৫টি সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৮৮০ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০০৯ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সকল সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি থেকে বার্ষিক রেণু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪৬২ মে টন এবং নার্সারি থেকে চাষোপযোগী উৎপাদিত পোনার সংখ্যা প্রায় ৯৬১ কোটি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে (পুকুর-দীঘি ও বাঁওড়) উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ৯.১৭ লক্ষ মে টন থেকে ১২.৩৭ লক্ষ মে টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মৎস্য চাষের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কৌশলসমূহ হলোঃ

ক) অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা ও মৎস্য সম্প্রসারণ সেবার বিস্তৃতকরণ;
খ) মৎস্য/চিংড়িচাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নততর চাষ পদ্ধতির প্রচলন;
গ) সরকারি বদ্ধ জলাশয়ের ব্যবহারের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন;
ঘ) ব্রুড মাছের জাত উন্নয়ন, জিনপুল প্রতিষ্ঠা ও গুণগতমানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
ঙ) মঙ্গাকবলিত এলাকায় মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ;
চ) মৎস্য খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের মান নিশ্চিতকরণসহ সহজশর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান;
ছ) মাছ ও চিংড়ির রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান;
জ) গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
ঝ) উৎপাদিত মৎস্য পণ্যের যথাযথ সংরক্ষণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
ঞ) মৎস্য সম্পদ জরিপ কার্যক্রম জোরদারকরণসহ মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
ট) ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

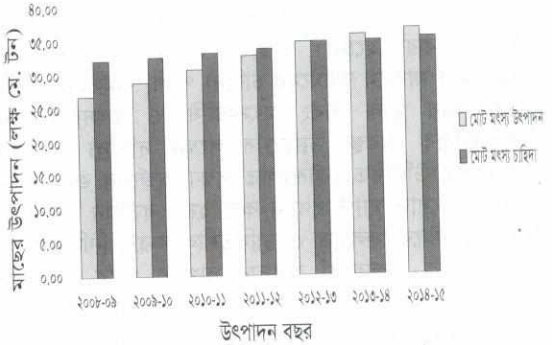

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাছের উৎপাদন ও চাহিদা

০২. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ঃ বাংলাদেশে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টরের বেশি অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় রয়েছে, যা মৎস্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। মৎস্য অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সমাজভিত্তিক জলাশয় ব্যবস্থাপনা, মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ, মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ আসতো উন্মুক্ত জলাশয় হতে, বর্তমানে যা ৩৫ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না থাকা, কৃষি জমিতে অতিরিক্ত সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ, শিল্পায়নের বর্জ্য দ্বারা জলাশয়ের পানি দূষণ, মৎস্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রগুলো বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি সমস্যা মুক্ত জলাশয়ের সহনশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ অবস্থার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরিত উন্মুক্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার ফলে জলাশয়ে মৎসজীবীদের অধিকার অনেকাংশেই নিশ্চিত হয়েছে এবং সুফলভোগীগণ মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জলমহালের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী/

সুফলভোগীগণের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বেড়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের সকল উৎস থেকে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ১১.২৪ লক্ষ মে টন থেকে ১৬.৯০ লক্ষ মে টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন এবং বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ঐসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির বংশবৃদ্ধিও ঘটেছে। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের পাশাপশি মাছের স্বাভাবিক চলাচল, বিশেষ করে প্রজনন মৌসুমে মাছের অবাধ অভিপ্রয়াণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নদীর সংযোগ খাল, মরা নদী ও বিল খনন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণসহ দেশীয় কার্প ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন এবং বর্ধন নিরাপত্তা অনেকাংশেই নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া পরিবেশ বান্ধব মৎস্য/চিংড়ি চাষের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষিদের ক্ষতি সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার সাথে সাথে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ সকল বিষয়কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

ক) মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
খ) অভ্যন্তরীণ জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রক্ষর্তনসহ সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
গ) খাস জলাশয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;
ঘ) জলজ পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;
ঙ) বিল নার্সারি কার্যক্রম ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
চ) মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন এবং বাস্তবায়ন অধিকতর জোরদারকরণ;
ছ) উপযুক্ততা নিরূপণ সাপেক্ষে ঘের, পেন ও খাঁচায় মাছচাষ সম্প্রসারণ;
জ) উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে প্রচারণা;
ঝ) বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণ;
ঞ) উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ ও মজুদ সংক্রান্ত জরিপ কাজ পরিচালনা;
ট) অভ্যন্তরীণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

০৩. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনাঃ চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে চিংড়ি খামারের আয়তন ০.৬৪ লক্ষ হেক্টর হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১.৩৫ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। এ সমস্ত চিংড়ি খামারের উৎপাদন ০.৯২ লক্ষ মে টন (১৯৯৯-০০) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ সালে ১.৪৯ লক্ষ মে টনে দাঁড়িয়েছে। তবে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ির পোনা ও উৎপাদন সামগ্রীর অপ্রতুলতা, উপযুক্ত মৌলিক অবকাঠামোর অভাব, পরিবেশগত অবক্ষয়, চিংড়ি পোনা আহরণের সময় অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির পোনার ব্যাপক মৃত্যু, চিংড়ির রোগবালাই, চিংড়ি চাষে উচ্চ বিনিয়োগ খরচ, ভূমি ব্যবহারে আন্তঃখাত প্রতিযোগিতা, নিরাপত্তার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রযুক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সমন্বিত নীতিমালার অভাব, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে চিংড়ি চাষি ও ব্যবসায়ীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের অভাব ইত্যাদি সমস্যা উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশ হতে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপনণের বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। হ্যাসাপ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এ খাতে আশাতীত সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশনও কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ সালে প্রায় ০.৭৩ লক্ষ মে টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে প্রায় ৩২৭৪ কোটি টাকা। এ পরিকল্পনাকালে উপকূলীয় এলাকায় উন্নত চিংড়ি চাষ

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বর্তমানের ১.৪৬ লক্ষ মে টন থেকে ১.৭২ লক্ষ মে টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ধিত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

ক) চিংড়িচাষ এলাকা ঘোষণা ও চিংড়িচাষ এলাকার মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন;
খ) পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও চাষ নিবিড়করণ;
গ) চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে উত্তম চাষ পদ্ধতি ও উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন;
ঘ) নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা সৃষ্টি;
ঙ) সমুদ্র থেকে মা চিংড়ি সংগ্রহ কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং উপকূলীয় এলাকায় কিশোর চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধকরণ;
চ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘন ঘন দূর্যোগের হাত থেকে সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
ছ) সুন্দরবন এলাকার মৎস্য নার্সারি এবং প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ;
জ) গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব এবং লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
ঝ) চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে প্রচারণা।

০৪. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদঃ বাংলাদেশে রয়েছে এক বিশাল সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ। কিন্তু কার্যকর উদ্যোগের অভাবে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের মাত্র ২২ শতাংশ (২০০৮-০৯) আসে এ ক্ষেত্র থেকে। এজন্য যে সমস্ত বিষয়কে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো- মাছের মজুদ সম্পর্কে সীমিত তথ্য ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব, উপকূলবর্তী এলাকায় অতিমাত্রায় মাছ ও চিংড়ি আহরণ, অবৈধ জালের ব্যবহার, অপরিকল্পিতভাবে ডিমার্সাল ও পেলাজিক মাছের আহরণ, পেলাজিক মাছ আহরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব, যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা নীতির অভাব, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পরিবহনের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব চিহ্নিত সমস্যাদি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণের বহুবিধ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এ অফুরন্ত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকার এর পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য সুষম রাখার উদ্দেশ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া, বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণে প্রায় ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানেগ্রোভ ফরেষ্ট সুন্দরবনের অধিকতর উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকার সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একই সাথে সরকার সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস-এর নিকটবর্তী ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে মাছের বর্তমানের উৎপাদন ৫.১৪ লক্ষ মে টন থেকে ৫.৬৬ লক্ষ মে টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ধিত মাছ/চিংড়ি আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কৌশলগুলো হলোঃ

ক) জরিপের মাধ্যমে পেলাজিক ও ডিমার্সাল মাছের মজুদ নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন;
খ) যান্ত্রিক নৌযানে কর্মরত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি;
গ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেল্যান্স বা এমসিএস কৌশল প্রবর্তন;
ঘ) উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
ঙ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন এবং নিরাপদ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
চ) জলযান নিবন্ধন ও মাছ ধরার অনুমতি প্রদানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ;
ছ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা নীতির প্রবর্তন।

উপসংহার

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন-এর বিষয়টি অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ পরিকল্পনাকালে বর্ধিত উৎপাদনের ফলে মৎস্য খাতে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের জীবনমান তথা আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুকুর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেন্ডার সমতাকরণের অগ্রগতি বহুলাংশে অর্জিত হবে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি শিল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আপামর কর্মীদের জীবনমান তথা আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।

সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)-এর মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান কৌশল

মোঃ আবদুল কাইয়ুম

খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত বারটি কর্মসূচির মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। প্রাণিজ আমিষের এক বিরাট অংশ আসে মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণী থেকে। মাছের প্রাকৃতিক উৎস অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে সরকারের ভূমিকা এবং মৎস্য অধিদপ্তরের নানামুখী ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সরকারিভাবে মৎস্য অধিদপ্তরের সকল স্তরের অফিসসহ সরকার ও দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও কোন কোন এনজিও এবং দেশি-বিদেশি সংস্থার উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে অঞ্চল বা প্রকল্পভিত্তিক কিছু মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি, আইনের প্রয়োগ সর্বোপরি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণ সেবা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে অধিদপ্তরের নেই। সরকারি সম্প্রসারণ সেবা উপজেলা পর্যন্ত সীমিত অথচ তৃণমূল পর্যায়ের মৎস্যচাষিদের বিরাট অংশ এই সেবা থেকে বঞ্চিত। অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান ও বেগবান করতে অতীতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এনজিও নিয়োগ করে মৎস্যচাষি দল গঠন করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা সম্পূর্ণ টেকসই হয়নি, এমনকি গঠিত চাষি সংগঠনগুলো প্রকল্পউত্তর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে টিকে থাকেনি। নিয়োজিত এনজিওগুলো মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও চাষি সংগঠনগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মত কার্যক্রমের চেয়ে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ায় উদ্যোগটির সফলতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও সেবা তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষুদ্রচাষিদের নাগালে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাষিদের একান্ত নিজস্ব টেকসই ও স্থায়ী চাষি সংগঠনের তৈরির মাধ্যমে তাদেরকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের বিষয়টি বিভিন্ন ফোরামে বহুবার আলোচিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ও প্লাবনভূমিতে মাছচাষ প্রকল্পের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে থাকায় সমাজভিত্তিক চাষি সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বলতা পেয়েছে।

আলোচ্য বিষয়গুলো সক্রিয় বিবেচনায় এনে ডানিডা সাহায্যপুষ্ট 'এগ্রিকালচার সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট-দ্বিতীয় পর্যায়' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (আরএফএলডিসি) তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক সমাজকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজভিত্তিক সংগঠন বা সিবিও গঠনের মাধ্যমে টেকসই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য হলো 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত ও টেকসই সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্পসম্পদ বিশিষ্ট দরিদ্র কৃষক পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন'। প্রকল্পের এই লক্ষ্য অর্জনে নির্ধারিত আউটপুটসমূহের অন্যতম হলো সমাজভিত্তিক কৃষক সংগঠন (সিবিও) গঠন ও তাদের সামর্থতা বৃদ্ধিকরণ। উদ্দ্যেশ হলো স্থানীয় কৃষক সমাজকে সম্পৃক্ত করে তাদের দ্বারা সমাজভিত্তিক কৃষক সংগঠন করিয়ে তাকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানরূপে গঠন করে কোন প্রকার ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ছাড়াই কৃষক পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী বিকেন্দ্রীকৃত এবং টেকসই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতকরণ। আরএফএলডিসি প্রকল্পটি বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সকল উপজেলাসহ চট্টগ্রাম জেলার ৩টি উপজেলায় এবং বরিশাল বিভাগের জেলাসমূহের নির্বাচিত উপজেলায় ২০০৭ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত এই সকল সমাজভিত্তিক চাষি সংগঠনগুলো স্থায়ী ও টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হয়।

সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)

সাধারণভাবে সমাজভিত্তিক সংগঠন বা সিবিও হলো একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে কোন ভৌগোলিক এলাকার নির্দিষ্ট সামাজিক পরিম-লে ঐ সমাজেরই সচেতন এবং সমমনা নাগরিকগণের নিজস্ব চাহিদা, উদ্যোগ ও পরিচালনাধীন একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সেবামূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত এবং

উপ-প্রকল্প পরিচালক, আরএফএলডিসি, নোয়াখালী কম্পোনেন্ট, মৎস্য অধিদপ্তর

পরিচালিত সিবিও এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ হলো স্বল্পসম্পদ বিশিষ্ট দরিদ্র কৃষক পরিবারের নিকট প্রাপ্ত সকল সম্পদ ও সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন। প্রকল্পাধীন এই সকল সিবিও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- (ক) সর্বসম্মতভাবে গৃহীত গঠনতন্ত্র; (খ) সদস্যপদ সকলের জন্য উন্মুক্ত; (গ) সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আচরণ (ঘ) অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান (চ) চাহিদা ভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা এবং (ছ) স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য অর্থ ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন সিবিও এর সদস্য সংখ্যা ৫০ বা ততোধিক হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি সিবিও এর ৭-১৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি রয়েছে, যারা সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত এবং তাদের নিকট দায়বদ্ধ। প্রত্যেকটি সিবিও এর নিজস্ব ব্যাংক হিসাব আছে এবং সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে তা পরিচালিত হয়।

চিত্রঃ মাসিক মিটিং-এ অংশগ্রহণরত সিবিও সদস্যের একাংশ

আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের নোয়াখালী কম্পোনেন্ট এলাকায় এ পর্যন্ত ২৩টি উপজেলার ১৭০টি ইউনিয়নে গঠিত ১৪৫টি সিবিও গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে, প্রকল্প মেয়াদে এ সংখ্যা ২১২ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসসহ সিবিও নিয়োজিত ৬০০ স্থানীয় সহায়ক বা প্রশিক্ষক (এলএফ) এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০০ কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, যা ৫৮০০ পর্যন্ত করা হবে। এছাড়াও সিবিও নিয়োজিত ১২১ জন কমিউনিটি এগ্রিকালচার ও এ্যাকুয়াকালচার রিসোর্স পারসন (কার্প), ১৬৭ জন কমিউনিটি পোল্ট্রি ওয়ার্কার ও ৯৭ জন লাইভস্টক ওয়ার্কার যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবেভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণে অবদান রাখছে। প্রকল্পের বরিশাল কম্পোনেন্টেও অনুরূপ সংখ্যক রিসোর্স পারসন সিবিও এবং উপজেলা অফিসসমূহের তত্ত্বাবধানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। এই সকল রিসোর্স পারসন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প থেকে দেওয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত।

সিবিও এর সাধারণ কার্যাবলী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে টেকসই করতে হলে (ক) চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও কারিগরি জ্ঞানদান অর্থাৎ প্রশিক্ষণ প্রদান; (খ) প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় চাষিকে সম্পৃক্তকরণ এবং (গ) হস্তান্তরিত প্রযুক্তি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী তাদের নিকট সহজলভ্য করতে হবে। এই সকল কার্যক্রমকে একত্রে সম্প্রসারণ সেবা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের সাধারণ কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বর্ণিত প্রায় সকল প্রকার সম্প্রসারণ সেবাই সিবিও কর্তৃক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সিবিও পরিচালিত কার্যাবলীর অন্যতম কয়েকটি প্রধান কাজ হলোঃ

(১) কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যেমন- কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনা;

(২) স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ন্যায্যমূল্যে তা বিতরণ, যেমন- বিভিন্ন মাছের পোনা, হাঁস মুরগির বাচ্চা, বীজ, সার, চুন, খাদ্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি;

(৩) সিবিও এর নিজস্ব সম্পদ থেকে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সরঞ্জাম যথাসময়ে ভাড়ায় প্রদান, যেমন- সেচ পাম্প, রিক্সাভ্যান, স্প্রে মেশিন, বেড় জাল, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি;

(৪) চাহিদা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন- উদ্বুদ্ধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, হাঁস-মুরগির ও গবাদিপশুর টীকা প্রদান, রোগ প্রতিরোধে প্রচারণা ইত্যাদি;

(৫) বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে চাষিদের প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা আদায় এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহযোগিতা প্রদান;

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে সিবিও গৃহীত কার্যাবলী

ক. কৃষক মাঠ স্কুল বা এফএফএস এর মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী মৎস্যচাষ উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। কার্প জাতীয় মাছের নার্সারি, মনোসেক্স তেলাপিয়া নার্সারি, মাছ ও তেলাপিয়া চাষ, জলাবদ্ধ ধান ক্ষেতে বা ডগিতে সমন্বিত মাছ চাষ, মাছ ও চিংড়ির মিশ্রচাষ, গলদা চিংড়ির নার্সারি, চিংড়ির একক ও মিশ্রচাষ, সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় এই প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

চিত্র ঃ চিংড়ির মিশ্রচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

খ. উন্নত জাতের বিভিন্ন প্রজাতি মাছের পোনা এবং গলদা চিংড়ির জুভেনাইল (ছটকা) সুলভ মূল্যে এবং যথাসময়ে চাষিদের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সিবিও সদস্য কিংবা সিবিও কর্তৃক নির্বাচিত আরএফএলডিসি প্রকল্প থেকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কমিউনিটি এগ্রিকালচার ও এ্যাকুয়াকালচার রিসোর্স পারসন সংক্ষেপে কার্প দ্বারা স্থানীয়ভাবে নার্সারি খামার পরিচালনা করা এবং উৎপাদিত পোনা সুলভমূল্যে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা;

গ. সিবিও নিজস্ব বা কার্প এর মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্যচাষ সংশ্লিষ্ট উপকরণ, যেমন- মাছ ও চিংড়ির খাদ্য এবং খাদ্য উপকরণ, চুন, সার, শুটকির গুড়া, খৈল, কুঁড়া, ফিসমিল, অনুমোদিত ঔষধপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে ন্যায্য মূল্যে সেগুলো চাষিদের মাধ্যমে বিতরণ করা;

ঘ. মাছ ও চিংড়ি চাষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সরঞ্জাম, যেমন- মাছ ধরার জাল, পোনা পরিবহনের ড্রাম বা পাতিল, সেচ পাম্প মেশিন, রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের নিকট ভাড়া দেওয়া;

ঙ. সরকারি ও বেসরকারি জলাশয় বন্ধক নিয়ে কিংবা সমাজ ভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় জলাবদ্ধ ধানক্ষেত বা ডগিতে সমন্বিত মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

চ. সিবিও বা কার্পের মাধ্যমে পরিচালিত নার্সারির জন্য বিশ্বস্ত সরকারি-বেসরকারি উৎস থেকে উন্নতজাতের মাছের রেণু পোনা এবং চিংড়ির পোস্ট লার্ভি (পিএল) সংগ্রহ ও পরিবহনে সহায়তা প্রদান;

ছ. মাছের রোগ প্রতিরোধ, নিরাময়, চাষ, মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য আইন-কানুন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ;

জ. চাষিদের উৎপাদিত মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য পণের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে এবং বাজারজাতকরণের জন্য ন্যূনতম ভাড়ায় পরিবহন সহযোগিতা প্রদান;

ঝ. মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে যোগাযোগ করে মৎস্যচাষ বিষয়ক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা আদায় এবং জাতীয় স্থানীয়ভাবে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহযোগিতা করা;

চিত্র ঃ মৎস্য আহরণ

উপসংহার

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সিবিওগুলো অবশ্যই প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতা কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। প্রকল্প থেকে সিবিও এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণে এমন সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে তারা প্রকল্প পরবর্তী সময়ে অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। যার জন্য সিবিওসমূহকে প্রকল্প প্রদত্ত থোক বরাদ্দের অর্থের মালিক করা হয়েছে যাতে তারা ভবিষ্যতে আবর্তক তহবিল হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমানে চালু কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। সিবিওগুলো ইতোমধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচনায় প্রায় সকল সিবিও এর নিজস্ব অফিস, ব্যাংক একাউন্ট, স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকা- সম্পৃক্ততা ও কাজের নিয়মিত মনিটরিং ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কোন কোন সিবিও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নিবন্ধনের জন্য অগ্রসর হচ্ছে অথবা ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হয়েছে। সিবিওগুলোর অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে গঠিত সিবিও এসোসিয়েশন সক্রিয় আছে। এমতাবস্থায় এই প্রকল্পসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোকে মৎস্য অধিদপ্তরের নেতৃত্বে প্রণীত একটি নীতিমালার আওতা এনে তাদের দ্বারা দেশের সর্বত্র টেকসই মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। যদিও প্রকল্পের এ পর্যায়ে চূড়ান্ত সুপারিশ করা সম্ভব না, তবুও আমি মনে করি প্রকল্পউত্তর এ সকল সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোর দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তর অনায়াসে তৃণমূল পর্যায়ে টেকসই মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সুযোগ নিতে পারে।

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম

মোঃ ইউসুফ খান[১]
বিশ্বজিৎ কুমার দেব[২]

ই-গভর্নেন্স হচ্ছে একটি পদ্ধতি বা মাধ্যম যার দ্বারা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, উন্নয়ন কর্মকান্ড, মানুষের সাথে মানুষের সহজ যোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। মৎস্যচাষ, ব্যস্থাপনা, তথ্য সংরক্ষণ ও এর অধিকতর সম্পসারণে ই-গভর্নেন্স এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- একজন মৎস্যচাষি মাছ চাষের আধুনিক কলাকৌশল জানতে ইচ্ছুক। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে মোবাইলের মাধ্যমে অথবা ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক খুব অল্প সময়ে সঠিক তথ্য পেতে পারেন যদি উপজেলা/জেলা পর্যায়ের মাছ চাষ ও মৎস্য সম্পদের সঠিক তথ্য কম্পিউটারের ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করা যায়। ই-গভর্নেন্স এর বাস্তবায়নে বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে e-Extension কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নিজস্ব ওয়েবসাইট স্থাপন, মৎস্য ডেটাবেইজ ও পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-গভর্নেন্স এর বাস্তবায়নে বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যক্রমের হচ্ছে e-Extension Service| e-Extension services for Need based Aquaculture Extension কর্মসূচি মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য একটি পাইলট কর্মসূচি। ইউএনডিপি'র কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন Acesses to Information Programme এর আওতায় এই পাইলট কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে একটি প্রতিজ্ঞা ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাজে নিয়োজিত সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে সরকার এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য e-Extension services for Need based Aquaculture Extension এর সফল ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য সাব সেক্টরে তথ্যপ্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য সেক্টরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

e-Extension এর উদ্দেশ্য

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌছানো এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে মৎস্য তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র (Fisheries Information and Communication Centre -FICC) স্থাপন। FICC-তে যে কোন মৎস্যচাষি এসে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তাঁর সমস্যার কথা তুলে ধরবেন এবং প্রয়োজনীয় সমাধান পাবেন। কার্যক্রমটি একটি পাইলটভিত্তিক হওয়ায় প্রাথমিকভাবে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন নির্ধারিত ১০টি জেলাধীন ১০টি উপজেলায় ১টি করে মোট ১০টি গ্রামে ই-এক্সটেনশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমে ১০টি গ্রাম হতে ১০ জন ই-সম্প্রসারণ কর্মী নির্বাচনপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেবার ধরন ও পদ্ধতি

e-Extension Service for Need based Aquaculture Extension শীর্ষক পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশের মৎস্য সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের দেশের মৎস্য চাষিরা নিম্নলিখিতভাবে উপকৃত হবেন ঃ-

- গ্রামের কোন মাছ চাষি মৎস্যচাষ বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন সমস্যায় উপনিত হলে তিনি তার নিকটবর্তী ই-লিফের নিকট যাবেন। ই-লিফ তাঁর সমস্যাগুলো শুনবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর সমস্যার সমাধান করবেন। যদি কোন ই-লিফ সমস্যার সমাধান না দিতে পারেন তখন তিনি তাকে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে মোবাইলে বা টেলিকনফারেন্স বা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণপূর্বক সমাধান প্রদান করবেন।
- FICC কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের মৎস্য চাষিরা তাৎক্ষণিভাবে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার প্রাথমিক সমাধান পেতে সক্ষম হবেন।
- সম্প্রসারণমূলক ভিডিও প্রদর্শন ও অন্যান্য উপকরণাদি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের নিকট মৎস্যচাষ বিষয়ক তথ্য পৌঁছতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- সময়ে সময়ে মৎস্যচাষিদের চাহিদার ভিত্তিতে ই-লিফ চাষির পুকুর/ঘের পরিদর্শন করে মৎস্যচাষিকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করতে সহায়তা করবেন।
- মৎস্যচাষি ও মাছ চাষে আগ্রহী সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মাছ চাষে উৎসাহিতকরণ এবং মাছ চাষ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১ প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর
২ মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর

- মৎস্যচাষিদের হাতে-কলমে মাছ চাষ বিষয়ক কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হবে।
- ই-লিফ কে সরবরাহকৃত কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ব্যবহার করে মৎস্য চাষভিত্তিক মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ এবং ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে সেবার সহজিকরণ ও গ্রামের মানুষের দ্বারে সেবা পৌঁছে যাবে।
- নির্বাচিত ই-লিফ কর্মী সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে কাজ করবেন। তবে ই-লিফ কর্মী সরবরাহকৃত মাছ চাষ সম্প্রসারণ সামগ্রী ও আইটি বিষয়ক উপকরণ ব্যবহার করে FICC কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের বিঘ্ন না ঘটিয়ে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারবেন।
- মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রয়োজনে মৎস্য অধিদপ্তর সদর দপ্তরের সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করা হবে। এলক্ষ্যে মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রধান করে একটি বিশেষজ্ঞ টিম গঠন করা হয়েছে, যারা সার্বক্ষণিকভাবে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকবেন।

তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে মাছ ও চিংড়ি চাষিদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যে UNDP-এর আর্থিক সহায়তায় দেশের ১০টি গ্রামে e-Extension Service for Need based Aquaculture Extension শীর্ষক পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আশা করা যায় এ কর্মসূচি দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অধিকতর সামর্থ্যবান করে তুলবে। পরীক্ষামূলক কর্মসূচি সফল হলে এ কর্মসূচি দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করা হবে। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার এ সেক্টরকে সমৃদ্ধ করবে।

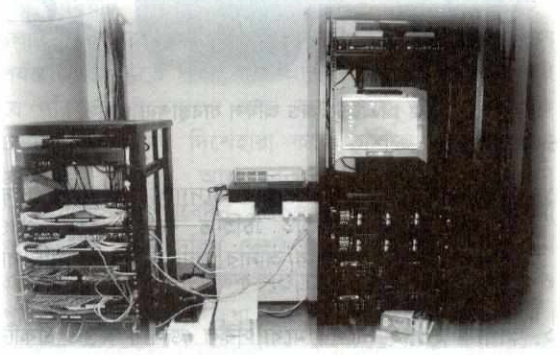

চিত্র ঃ মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে স্থাপিত সার্ভার

মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত এবং বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। তবে কয়েকটি প্রকল্পে Information and Communication Technology (ICT) বিষয়ক কার্যক্রম সম্পৃক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২০টি উপজেলায় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৪টি উপজেলায় কম্পিউটার সরবরাহ পূর্বক ডিজিটাইজড অফিস ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (Monitoring, Control and Surveillance-MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) সম্পর্কিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে।

ভবিষ্যতের গৃহীতব্য কার্যক্রম

আগামী ২০২০-২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করারও অঙ্গীকার রয়েছে। এতে করে উদ্যোক্তা, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের চাহিদাভিত্তিক ও তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান, কর্মে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত হবে।

- ই-সম্প্রসারণ (e-Extension) কৌশল প্রবর্তন
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা
- ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেশ ও মৎস্যচাষ নিবিড়তা শীর্ষক ডেটাবেইজ প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ

উন্মুক্ত জলাশয়ের প্রকৃতিভিত্তিক ডেটাবেইজ প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ

- মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় জিআইএস (GIS) প্রযুক্তির ব্যবহার
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক মনিটরিং, কন্ট্রোল এন্ড সার্ভিলেইন্স (MCS) পদ্ধতি প্রবর্তন
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) পদ্ধতি প্রবর্তন

পুকুর-জলাশয়ে চাষাবাদ পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ জলায়তন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে মাছের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শুধুমাত্র পুকুর-জলাশয়ে মাছ চাষে সীমাবদ্ধতা না থেকে উন্মুক্ত জলাশয়ে (নদী, বিল, খাল, হাওর-বাঁওড়) মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তনে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাটকা ও ইলিশ প্রজনন মৌসুমে জেলেদের মাছ ধরা থেকে বিরত রাখার জন্য জাটকা আহরণকারী জেলেদের পুনর্বাসন, ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ৪ মাস জাটকা আহরণকারী অতি

গুরুত্ব অপারসাম। অভ্যন্তরাণ মৎস্য আহরণে (Inland Fishing) বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থান দখলকারী দেশ।

উচ্চতা বেড়ে যাওয়া মাছের জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

পরিচালক, কারিতাস মৎস্য কার্যক্রম

দরিদ্র জেলেদের খাদ্য সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। খাদ্য সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ডেটাবেইজ সংরক্ষণ, খাদ্য ও উপকরণ বণ্টন সহজিকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়নে সকল সুফলভোগীর জন্য SMART CARD তৈরি

কর্মকর্তা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে মোবাইলে বা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণপূর্বক সমাধান দিবেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে মৎস্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় বিশেজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করে মাছ চাষ বিষয়ক পরামর্শ

কয়েক বছর যাবৎ বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে যে অনিয়মগুলো দেখা যাচ্ছে মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলো মোটেও ইতিবাচক নয়। যেমন যে সময় বৃষ্টি হওয়ার কথা তখন হচ্ছে না, যে সময় যে পরিমাণ হওয়ার কথা সে সময় ও পরিমাণমত হচ্ছে না, যে সময় যে এলাকায় যে পরিমাণ হওয়ার কথা সে অনুযায়ী হচ্ছেনা। এবছর মে-জুন মাসেও বৃষ্টি না হওয়ার ফলে মাছের প্রজনন ব্যাহত হয়েছে, কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পোনা উৎপাদন সম্ভব হয়নি। গোনাড পরিপক্ব হলেও প্রজননের অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া এবং তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে কৃত্রিম প্রজননে মাছ সাড়া দিচ্ছে না, ডিম শরীরে শোষিত (Absorb) হয়ে গেছে। তাপমাত্রা ২৯ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গেলে ব্রুড মাছ অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কারণ তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। এই পরিস্থিতিতে ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যায় যার একটা প্রভাব পড়ছে সমগ্র পোনা উৎপাদনে।

আমাদের দেশে এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টিতে পুকুর ডোবায় নতুন পানি জমে, এই সময়ে চাষি পোনা মজুদ করে। বৃষ্টির সময় পিছিয়ে যেতে যেতে এ বছর জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোন বৃষ্টি হয়নি। ফলে জলাশয় ছিল শুকনো, পোনা ছাড়ার উদ্যোগ নিতে পারেনি চাষি। সুতরাং মাছের বৃদ্ধির কাল সঙ্কুচিত হয়ে এ বছর শেষে আশানুরূপ ফলন প্রাপ্তি না হওয়ারই কথা। চলতি বছরে খাল বিল প্লাবনভূমিতেও জুলাই মাস পর্যন্ত পানি না হওয়ার কারণে দেশীয় মাছের প্রজনন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এপ্রিল-মে মাসে দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজনন কাল। যদিও এসব মাছ কয়েকবার ডিম ছাড়ে, কিন্তু ইতোমধ্যে এদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন সময়টা পার হয়ে গেল যার প্রভাব পড়লো সামগ্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং এদেশের লক্ষ গরিব মানুষের পুষ্টি এবং জীবিকার ক্ষেত্রে, যারা বিল, বাঁওড়, প্লাবনভূমিতে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং যাদের পুষ্টিও দেশীয় জাতের ছোট মাছের আমিষ নির্ভর।

জুলাই মাসে পোনা মজুদ করে অন্তত ৬ মাস উৎপাদনের জন্য সময় পেলে কিছুটা আশার আলো দেখা যেতো। কিন্তু এবার হঠাৎ করে মধ্য নভেম্বরে তীব্র শীত নেমে আসে সাথে ঘন কুয়াশা। এতে করে মাছের বাড় (বৃদ্ধি) থমকে গেছে। উপরন্তু ঘন কুয়াশায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায়, সূর্যালোক পানিতে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হয়, পানির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, মাছের জীবন ঝুঁকি বেড়ে যায়। আমাদের দেশে সাধারণত এমন কম তাপমাত্রা এবং কুয়াশার ঘনঘটা দেখা দেয় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে। আমাদের দেশের চারটি রুই জাতীয় মাছের স্টক রয়েছে, যার মধ্যে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা স্টক ভারতের বিভিন্ন স্থানে ডিমছাড়ে, একমাত্র নদী হালদা যেখানে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছ ডিম ছেড়ে থাকে। পৃথিবীতে হালদাই একমাত্র নদী যেখান থেকে রুইজাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ করা হয়। কিন্তু হালদার ডিম উৎপাদন চিত্রে চিরাচরিত পরিবেশের বিচ্যুতি ঘটেছে এবং এর ফলে ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ফলাফল লক্ষণীয়। হালদার অভিজ্ঞতা হলো বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড তাপের পর একাধারে ৮-১০ ঘণ্টা বজ্রসহ ভারি বৃষ্টিপাত হলে পরে নদীর দুপাশ ছাপিয়ে পানি পার্শবর্তী নিচু প্লাবনভূমিতে যায়, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকায়, নদীর বাঁকগুলোতে স্রোতসহ পানি ঘূর্ণায়মান থাকে, তাপমাত্রা ২৬-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে তখনই রুই জাতীয় মাছ হালদা নদীতে ডিম ছাড়ে। সাধারণত অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সবকিছুর শুভ সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ আবহাওয়ার বেশ কয়েকটি অনুঘটকের সম্মিলিত প্রভাবে মাছ ডিম ছেড়ে থাকে। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ব্রুডমাছের ডিমের পরিপক্বতা এগিয়ে আসে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের শুরু হওয়ার সময় দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে মাছের জৈবিক অবস্থার সাথে বৃষ্টিঘন সময়ের অমিল দেখা দিচ্ছে- ডিম পাওয়ার সম্ভাবনাও কমে আসছে। সুদূর অতীতে হালদায় ২৫০০-৩০০০ কেজি পর্যন্ত রুই জাতীয় মাছের ডিম পাওয়া যেত। ৭০ এর দশকে ডিম উৎপাদন হাজার কেজি ছিল, ডিমের পরিমাণ কমতে কমতে ২০০৪ সালে মাত্র ২০ কেজিতে নেমে এসেছিল। কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার ফলে ২০০৮ সালে ডিমের পরিমাণ ছিল ১৭০ কেজি। ধারণা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে রুই জাতীয় মাছের ডিম ছাড়ার পূর্বশর্তগুলো নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে ঘটছেনা যা ভবিষ্যতে আরো বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে, দূরে সরে যেতে পারে দেশের একমাত্র পিওর স্টক রুই জাতীয় মাছের ডিম বা রেণু পাওয়ার সুযোগটি।

অন্যান্য রুই জাতীয় স্টকগুলোর ২/৩ দিনের রেণু নির্দিষ্ট নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অতঃপর ফিডিংগ্রাউন্ড হিসেবে বিল, হাওরে ঢুকে পড়ে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃষ্টির অনিয়মিত ধারায় বিশেষ করে স্বল্পসময়ে অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের কারণে পলি/বালি/পাথর নেমে এসে হাওর বিল, নদী, খাল ভরাট হচ্ছে, বিল থেকে নদী খালের সংযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মাছের আবাসভূমি বিনষ্ট হচ্ছে। অনেক প্রজাতি বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। রুই জাতীয় মাছ প্রজননের জন্য উজানে (up stream) যেতে হয়। কিন্তু সংযোগকারী (বিল-হাওরের সাথে নদীর) অংশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে বিধায় অনেক মাছ প্রজননস্থলে যেতে পারছে না। এতে করে নদী, বিল, হাওরে রুই জাতীয় মাছের প্রাচুর্য্য দিন দিন কমে যাচ্ছে।

অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, খরার সময় দীর্ঘতর হচ্ছে, পুকুর ডোবা ত শুকিয়ে যাচ্ছে। যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে তাতে মাছ চাষের প্রয়োজন অনুযায়ী জলাশয়ে পর্যাপ্ত পানি থাকছে না, পোনা মজুদের দুই তিন মাস পরে মাছ বাজার সাইজ হওয়ার আগেই পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। ছোট মাছ আহরণ করে চাষিকে লোকসান গুনতে হচ্ছে। গত বছর দেশের গড় বৃষ্টিপাত ছিল ২৩০০ মিলিমিটার, আর বরেন্দ্র এলাকার গড় ছিল ১১৫০ মিলিমিটার যা মাছ চাষ, কৃষিসহ জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন উৎপাদনমুখী সম্ভাবনাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উত্তর মেরুর বরফ গলছে, বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। হিমালয়েরও বরফ গলে যাচ্ছে, আর এই বরফগলা পানির শেষ গন্তব্যস্থল বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, লবণাক্ততা ঢুকে পড়ছে মূল ভূখণ্ডের দিকে। শুষ্ক মৌসুমে নদীগুলোর উজানে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় সাগর স্ফীতির জন্য লোনা পানি ঢুকে পড়ে। এতে করে সে সব এলাকার জলাশয়ে স্বাদুপানির মাছ আর আগের মত ফলন দিচ্ছে না। চাষির অভিজ্ঞতা হলো- পুকুরের পানি লোনা হয়ে যাচ্ছে। মৃগেল মাছ লোনা সইতে পারে না, রুই, কাতলাও আশানুরূপ সাইজের হচ্ছে না। বলা হয় সাগরের উচ্চতা ১ মিটার বেড়ে গেলে সুন্দরবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে - সামুদ্রিক মাছের নার্সারি বলে খ্যাত সুন্দরবন হারিয়ে গেলে আমাদের দেশের সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণের স্থায়িত্ব ও মাত্রা ইতোমধ্যেই বেড়ে চলেছে। ৯০ এর দশকে অত্র অঞ্চলে লবণের মাত্রা ৮-১০ পিপিটি এর বেশি ছিল না, যা বর্তমানে স্থান বিশেষে ২০ পিপিটি ছাড়িয়ে গেছে। উপরের দিকে নদীগুলোতেও লবণের মাত্রা ৫-৭ পিপিটি পাওয়া গেছে। যশোরের কপোতাক্ষ নদীর পানিতে লবণাক্ততা ৪-৬ পিপিটি যা আগে কখনও ছিল না। বলা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়ে যাবে - এর ফলে মৎস্য অঙ্গণেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে জন দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে। ২০০৭ সালের সিডরে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪৭৮ টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত' হয়েছে, চাষি হারিয়েছে ৬ হাজার ৫১১ মেট্রিক টন মাছ যার বাজার মূল্য ছিল ৪৮৭ মিলিয়ন টাকা, জাল-নৌকা হারিয়েছে ৭২১ মিলিয়ন টাকার।

দেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো হলো- শিলাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, স্বল্পসময়ে প্রচুর বৃষ্টি। ফলে পানি দ্রুত গতিতে গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে, সঙ্গে নিয়ে আসছে নুঁড়ি, পাথর, বালি। আর এতে ভরাট হচ্ছে পাহাড়ি ছড়া, হাওর, নদী, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে জলজ সম্পদ তথা মৎস্য সম্পদের আবাসস্থল এবং প্রজনন-বিচরণ ক্ষেত্রে।

জেলে সমাজ এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠী যারা সাগরে বা উপকূলে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে, জলবায়ু পরিবর্তন তাদের জন্য বয়ে আনবে নেতিবাচক পরিস্থিতি। আমাদের দেশে ২ লাখ ৭০ হাজার মৎস্যজীবী ৪৩ হাজার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান দিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। ঘন ঘন দুর্যোগের কারণে সামুদ্রিক জেলে জীবনে অস্থিতিশীলতা, মৎস্য প্রাচুর্যের কমতি, চাহিদা রয়েছে এমন মাছ কমে যাওয়া, মাছ ধরতে যেতে পারার দিন কমে যাওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়া মোকাবেলা করা, চরম পরিস্থিতিতে মাছ না ধরা, জীবিকায় আঘাত এসব আরও তীব্রতর হবে। একই সঙ্গে প্রতিবছর ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভেসে যাওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া বসতবাড়ি আবাসযোগ্য করার পিছনে যথেষ্ট পরিশ্রম এবং সময় দিতে গিয়ে মাছ আহরণের জন্য যাওয়ার সুযোগ কমে আসবে। বসতবাড়ি নিশ্চিহ্ন হলে পরে মাছ ধরার সরঞ্জাম - জাল, নৌকা, বানা ইত্যাদি হারিয়ে একমাত্র পেশাটিতে নেমে পড়ার উপায় থাকে না। বংশ পরম্পরায় সাগরের সাথে বোঝা পড়া করে মাছ ধরা, সাগরের ভাষা বুঝে তীরে ফিরে আসা এগুলো এদের জানা। কিন্তু ২০০৭ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর এই পাঁচ মাসে সাগরের পানি উত্তপ্ত হয়ে ১২/১৩ বার আবহাওয়া বিভাগের সিগন্যাল ঘোষণা এবং সামুদ্রিক জেলেদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে/তীরের কাছাকাছি থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়। একেকবার গড়ে তারা তিনদিন মাছ ধরতে যায়নি, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করা পরিবারগুলোর জীবন-জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। জেলে সমাজ সাধারণত নদীর গা ঘেঁসে বসতি গড়ে তোলে। আইলা, সিডর আঘাত হানার পর এসব জেলে গ্রামে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাদের জীবনের নিরাপত্তা, বসতবাড়ির নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য জিএইচজি-এর আধিক্যের কারণে বাতাসের এবং সমুদ্র উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে, বাতাসের গতিপ্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, এতে করে সাগরে মাছের বিচরণ, উৎপাদনশীলতা, প্রভাবিত হচ্ছে, ফলে সাগরের কিছু অংশে মাছের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে, কিছু মাছের অভয়ারণ্য বলে খ্যাত এলাকা মাছ শুন্য হয়ে যেতে পারে। পানির অম্লতা বৃদ্ধির ফলে জৈব প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, মাছের খাদ্য শিকল পরিবর্তিত হতে পারে। দিন যতই যাচ্ছে জলজ প্রতিবেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভার স্পষ্টতর হচ্ছে। কোরাল রীফ বা প্রবাল সামুদ্রিক মাছের এক উৎকৃষ্ট আবাসস্থল। অনেক মাছ প্রবাল কুঞ্জের আজীবন বাসিন্দা, কেউবা প্রজননক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। কারো আবার শিশু বেলার খাদ্য জন্মায় এই প্রবালের অলিতে গলিতে, কেউবা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রবাল পাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী

প্রবাল অবলুপ্তি ঘটছে - পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গুণগত পরিবর্তন ঢেউয়ের তারতম্য, দূষণ, পানি স্রোতের বিভিন্নতাসহ নানাবিধ কারণে প্রবাল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যা সামুদ্রিক মাছের জন্য খুবই নেতিবাচক দিক। সুতরাং প্রবালভিত্তিক যে মাছগুলোর জীবনচক্র তাদের উপস্থিতি কমে আসবে।
পরিবর্তিত সামুদ্রিক তাপমাত্রা এবং পানির গুণগতমান পরিবর্তনের কারণে প্রবাল ফিসারি সঙ্কুচিত হচ্ছে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যে তথা মৎস্য বৈচিত্র্যে। গবেষণায় জানা গেছে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৬০% প্রবাল হারিয়ে যাবে।

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন বেশ কিছু মাছ দ্রুত উত্তরে সরে যাচ্ছে, যেখানে পানির গভীরতা বেশি। মাছ উষ্ণমণ্ডলীয় সাগর থেকে মেরু অঞ্চলের সাগরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, অনেক মাছ তার Migration route পরিবর্তন করে ফেলছে, প্রজননক্ষেত্র (spawning ground) ও বিচরণক্ষেত্র (feeding ground) পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং জেলেদের যুগ যুগান্তরের মাছ ধরার ব্যাপারে যে জ্ঞান/অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মাছ আহরণ করতো সেগুলোতে পরিবর্তন দেখা দিলে জেলেরা বিপাকে পড়বে।

বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ গ্রীন হাউস গ্যাস ইতোমধ্যে জমা হয়েছে তাতে করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি চলতেই থাকবে, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারাও অব্যাহত থাকবে। সুতরাং আমাদের দেশের মত প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবন ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য দু'টি উপায় সামনে রয়েছে যা আমাদের মাছ চাষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য:

- লবণাক্ততা সহনশীল চাষযোগ্য মাছের পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে, যেমন- ভেটকি, বাটা, পারশে, কাইন। লবণাক্ততা বেড়ে চলেছে এমন জলাশয়ে চিংড়ি, কাঁকড়া চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। মনোসেক্স তেলাপিয়াও এক্ষেত্রে ভালো ফলন দেবে।
- ক্ষরা এলাকায় স্বল্প সময়ের পানিতে বড় পোনা ছাড়ার উদ্যোগ নেয়া যায়, এলাকায় বড় পোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। তেলাপিয়া মাছ বেশ ক্ষরা সহনশীল।
- খরা বা লবণাক্ত অঞ্চলে কই, দেশি মাগুরের চাষ করা যেতে পারে
- নেতিবাচক প্রভাব কাজে লাগানোর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধভেঙ্গে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও জনদুভোর্গের এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে সে পানিকে কাজে লাগানো যায়। সঙ্গে ধান চাষ ব্যবস্থা নিলে সমন্বিত চাষাবাদের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় একই পুকুরে একটা দীর্ঘ ও একটা স্বল্পমেয়াদী মাছ চাষ পদ্ধতি নেয়া যেতে পারে।
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় মাছ চাষের চাহিদা অনুযায়ী পুকুরের পাড় উঁচু করে সমাজভিত্তিক মৎস্য পোনা ব্যাংক করা যায়, যে সময় বন্যার সম্ভাবনা নেই সে সময় ঐ পোনা পুকুরে মজুদ করা যায় এবং যে সব জেলা বন্যাপ্রবণ নয় সেসব বন্যা কবলিত জেলার জন্য পোনা মজুদ রাখা যেতে পারে।
- এমন কোন সিদ্ধান্ত যেন নেয়া না হয় যার ফলে জলজ সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। বরং জলজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা মৎসজীবী সমাজের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে।
- আমাদের মাছচাষি, সমুদ্রগামী জেলে, উপকূলীয় জেলে এবং তাদের পরিবারগুলোর দীনহীন অবস্থা, খাদ্য অনিশ্চয়তা, পুষ্টিহীনতার কথা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন নেগোসিয়েশন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদেরকে এদের কথা ভুললে চলবে না।
- সর্বোপরি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবকে কাজে লাগাতে হবে।

চিত্র ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব

কম দামে মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য তৈরি কৌশল ঃ উৎপাদন খরচ কমানোর প্রধানক্ষেত্র

ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক

বাণিজ্যিকভিত্তিতে মাছ চাষের প্রধান উপকরণ মাছের সম্পূরক খাদ্য। আর এ উৎপাদন খরচের ৬০-৮০% খরচ হয় খাদ্যের জন্য। তাই মাছ চাষে উৎপাদন খরচ কমানোর প্রধানক্ষেত্র হলো মৎস্য খাদ্য বাবদ খরচ। সুতরাং মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য কম দামে তৈরির বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মাছ ও চিংড়ি চাষে খামারে তৈরি খাদ্য ও বাণিজ্যিক খাদ্য উভয় ধরনের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক খাদ্যের বেলায় মাছের পুষ্টি চাহিদা মোতাবেক মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরি এবং দাম কমানোর ক্ষেত্রে চাষির তেমন কিছু করার সুযোগ নেই। কিন্তু খামারে তৈরি মৎস্য খাদ্যের ক্ষেত্রে চাষির কম দামে মাছের পুষ্টি চাহিদা মোতাবেক মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। তাই কম দামে মানসম্পন্ন খামারে মৎস্য খাদ্য তৈরি করার কৌশল জানা প্রয়োজন।

সম্পূরক খাদ্য

উন্নত চাষ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিবর্তে সম্পূরক খাদ্যের উপর নির্ভর করেই মাছ বা চিংড়ি চাষ করা হয়। মাছ ও চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য উদ্ভিদজাত খাদ্য উপকরণ যেমন- চালের পলিস কুড়া, গমের ভুষি, চালের খুদ, আটা, চিটাগুড়, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, সোয়াবিন, সোয়াবিন খৈল ইত্যাদি ও প্রাণিজাত খাদ্য উপকরণ যেমন- ফিসমিল, মিট এন্ড বোন মিল, চিংড়ির মাথার গুড়া, কাঁকড়ার গুড়া, রেশম কীট, শামুকের মাংস, গবাদি পশুর রক্ত, হাঁস-মুরগির নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। সম্পূরক খাদ্য ফরমুলেশনের সময় মাছের জন্য ৩৪-৩৬% এবং চিংড়ির জন্য ৩৫-৪০% আমিষের পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে খামারে তৈরি খাদ্য প্রয়োগ করা হলে কম দামে ভাল মানের খাদ্য প্রয়োগ করে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হয়। লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো উপাদানসমূহের সহজলভ্যতা, উপকরণসমূহের মূল্য, মাছ ও চিংড়ির পছন্দনীয়তা, উচ্চ খাদ্য পরিবর্তনের হার।

মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা

মাছ ও চিংড়ির খাদ্য তৈরিতে যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা থেকে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে সাধারণত অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। কয়েকটি প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির খাদ্যে আমিষের চাহিদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রজাতি	আমিষের চাহিদার পরিধি (%)	প্রজাতি	আমিষের চাহিদার পরিধি(%)
রুই জাতীয় মাছ (রুই)	৩৪-৩৬	পাঙ্গাস	২৫
কমনকার্প	৩১-৪০	মাগুর	৩০
তেলাপিয়া	৩০	শিং	২৮-৩৫
গ্রাসকার্প	২৩-২৮	গলদা	৩৫-৪০

খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান

স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন কিছু খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

উপাদানের নাম	পুষ্টিমান (%)		
	আমিষ	শর্করা	স্নেহ
চালের কুঁড়া	১৫.১	৪৮.৮	১৮.৯
গমের ভুষি	১৫.৯	৫২.০	৫.৪
সরিষার খৈল	৩২-৩৫	৩২.৩৮	১৩.৪৪
তিলের খৈল	২৭.২	৩৪.৯৭	১৩.১৮
ফিসমিল (চেওয়া)	৫০-৫৫	৩.৭	১২.২২
ফিসমিল (ভাতি)	৪৫-৬০	১৬.৮২	৭.৮৭
মিট এন্ড বোন মিল	৫০-৫৫	-	১২.৩৬
আটা	১২.৮	৭৬.৬	৩.০
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	২.৮০
ভুট্টা	৭.৭	৮২.৭০	২.৮
সয়াবিন খৈল	৫২.৫	৩২.১	৩.২

কম দামে মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরীর ফরমুলেশন

মাছ ও চিংড়ি খাদ্য তৈরির জন্য কম মূল্যের খাদ্য উপকরণ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে এদের পুষ্টি চাহিদা পুরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং খাদ্যের দাম কম হয়। নিম্নে সহজপ্রাপ্য কয়েকটি আমিষের উপকরণের দামের তুলনা করা হলো ঃ

খাদ্য উপকরণ	দাম (টাকা/কেজি)	% আমিষ	টাকা/ কেজি আমিষ
ফিসমিল (চেওয়া)	৫৫	৫৫	১০০.০০
ফিসমিল (ভাতি)	৪৫	৫০	৯০.০০
মিট এন্ড বোন মিল	৩৫	৫০	৭০.০০
সয়াবিন খৈল	৩২	৫০	৬৪.০০
সরিষার খৈল	২৫	৩৫	৭১.৪৩

মাছ ও চিংড়ি খাদ্য ফরমুলেশনের সময় সাধারণত খাদ্যে আমিষের মাত্রা হিসাব করা হয়। কম দামে আমিষের পরিমাণ বিবেচনায় একটি খাদ্য তৈরির একটি ফরমুলা নিম্নে দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	খাদ্যে %	দাম (টাকা/কেজি)		আমিষ %	
		উপাদানে	খাদ্যে	উপাদানে	খাদ্যে
ফিসমিল (ভাতি)	৫	৪৫	২.২৫	৫০	২.৫০
মিট এন্ড বোন মিল	১৫	৩৫	৫.২৫	৫০	৭.৫০
সয়াবিন খৈল	১৫	৩২	৪.৮০	৫০	৭.৫০
সরিষার খৈল	১৫	২৫	৩.৭৫	৩৫	৫.২৫
রাইস পালিশ	৩৫	১২	৪.২	১৫.৪	৫.৩৯
গমের আটা	১৫	১৪	২.১	১২.৪	১.৮৬
মোট	১০০		২২.৩৫		৩০.০০

অতএব, উল্লিখিত খাদ্যে আমিষের মাত্রা হচ্ছে ৩০.০% যার মূল্য ২২.৩৫ টাকা। পিলেট তৈরি করলে প্রতিকেজি খাদ্যে অতিরিক্ত ১-২.০০ টাকা খরচ যোগ করতে হবে। এভাবে খাদ্য তৈরি করলে বাণিজ্যিক খাদ্যের চেয়ে প্রতি কেজিতে ৪-৭.০০ টাকা খরচ বাঁচানো সম্ভব। মৎস্য খাদ্য তৈরির এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মৎস্য খাদ্যের উপর কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী যে লাভ করে চাষি তা নিজের ঘরে তুলতে পারবে।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন

আনোয়ার হোসেন সিকদার

মুজিবুর রহমান জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নীতিমালা ঘোষণা করেন। কিন্তু তা বাস্তবায়নে বিগত সরকারগুলো সক্রিয় কোন আবহমান কাল থেকে এ দেশের জেলেরা নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। দেশ স্বাধীনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নীতিমালা ঘোষণা করেন। কিন্তু তা বাস্তবায়নে বিগত সরকারগুলো সক্রিয় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিগত ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে জেলেদের উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের কর্মসূচি ঘোষণা করলে সেটাও মাঝপথে থেমে যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই মৎস্যজীবী ও জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে ইতোমধ্যে অনেকগুলো কর্মসূচি ঘোষণা করে। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান, চার মাস খাদ্য সহায়তা, জলমহাল নীতিমালা, আইলা ও সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের পুনর্বাসন, জেলেদের আইডি কার্ড প্রদান, নিহত জেলেকে ৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ কাজ সরকার হাতে নিয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এর সুফল দ্রুত জনগণের মাঝে সাড়া জাগাবে।

বর্তমান সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। যেমন মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে জাটকা ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা সংরক্ষণের জন্য সাধারণ জেলে সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৫টি জেলাধীন ৬৫টি উপজেলার ১২৬টি ইউনিয়নে আলোচনা সভা উপজেলা ও জেলায় নৌর‍্যালী, পদযাত্রা ইত্যাদি পালন করা হয়। এই সকল কর্মসূচিতে মাননীয় মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানসহ সমাজের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা/উপজেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এই কারণে যে বর্তমান দরিদ্রবান্ধব সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে বছরের মাঝখানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জেলেদের খাদ্য সহায়তা ১০ কেজির পরিবর্তে ৩০ কেজি এবং ৩ মাসের পরিবর্তে ৪ মাস অর্থ সহায়তা দ্বিগুণ করেছে। সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের পুনর্বাসনে সরকার গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কিছু দুর্বলতা রয়েছে বলে এ সমিতি মনে করে। সেগুলো কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কিছু বিদ্যমান সমস্যা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলোঃ

সমস্যাসমূহ

জলমহাল জেলেদের হাতে না থাকা; কারেন্ট জাল উৎপাদনকারী মালিকগণ কর্তৃক হাইকোর্টে মামলা; জলমহাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উপযুক্ত নীতিমালার অভাব; মৎস্যজীবী জেলেদের কোন ঋণের সুযোগ না থাকা; স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের অসহযোগিতা; অসাধু মৎস্য আড়তদার ও জেলেদের মৎস্য আইন না মানা; জলমহালে পলি পড়ে ভরাট ও সঙ্কুচিত হওয়া; আন্তর্জাতিক নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ; বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশিদের অনুপ্রবেশ; বাংলাদেশের জেলেদের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবনাসমূহ

১. জলমহাল, মৎস্য সম্পদ, মৎস্য আইন, মৎস্যজীবীদের সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও বিভিন্ন মৎস্যজীবী জেলে সংগঠন সমন্বয়ে সর্বজনস্বীকৃত একটি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন।

২. মৎস্য বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ড যেমন- প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও জলমহাল সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরে থাকা উচিত।

৩. সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রণীত মৎস্যজীবী জেলেদের উন্নয় প্রকল্পে মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৪. কৃষকের ন্যায় সকল ধরনের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন সংরক্ষণ, মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের কর্মসূচী মৎস্য দপ্তর ও মৎস্যজীবী জেলে প্রতিনিধি সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।

৫. মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদাযকে মধ্যস্বত্বভোগী আড়তদার ও দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে জরুরি ভিত্তিতে ঋণের ব্যবস্থা করা।

৬. মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মৎস্য পল্লীগঠন ও ভূমিহীন জেলেদের নামে বরাদ্দ দেওয়া এবং তালিকাভুক্ত জেলেদের একশত ভাগ ভিজিএফ'র আওতায় আনয়ন।

৭. আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানির হিস্যা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা, নদী খনন করা ও বাংলাদেশের জলসীমা থেকে বিদেশিদের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা।

৮. কারেন্ট জাল উৎপাদন বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে মামলার নিষ্পত্তি করে বেহুন্দী, মশারি, পাই, পোনাজাল উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং বিভিন্ন জেলা/উপজেলার নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা অবৈধ মাছের আড়ত বন্ধ করতে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ সংগঠন মনে করে উপরে বর্ণিত প্রস্তাবনাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলে, জলমহাল, মৎস্য সম্পদ, মৎস্য আইন, মৎস্যজীবী জেলেরা বহুলাংশে পুনর্বাসিত হবে এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১০

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	পুরস্কারের বিবরণী
১	গুণগত মানসম্পন্ন রেণু উৎপাদন (রুই জাতীয়/অন্যান্য প্রজাতি)	রাজ মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি প্রো: মোঃ ফেরদৌস হাসান গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	একটি স্বর্ণ পদক, ২৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
২	গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন	রূপালী মৎস্য খামার প্রো: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ	একটি স্বর্ণ পদক, ২৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
৩	মাছ উৎপাদন	আল বাইস এগ্রো কমপ্লেক্স প্রো: আলহাজ্ব ফেরদৌস আহম্মেদ মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	একটি স্বর্ণ পদক, ২৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
৪	বাগদা চিংড়ি উৎপাদন	মোঃ মাহমুদুল হক (লাভলু) দেবহাটা, সাতক্ষীরা	একটি স্বর্ণ পদক, ২৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
৫	মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকরণ (হিমায়িত চিংড়ি/শুটকি ইত্যাদি)	সীমার্ক (বিডি) লিঃ প্রো: ইকবাল আহমেদ ওবিই পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	একটি স্বর্ণ পদক, ২৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
৬	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ	একটি স্বর্ণ পদক, ২৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
৭	গুণগত মানসম্পন্ন রেণু উৎপাদন (রুই জাতীয়/অন্যান্য প্রজাতি)	সততা মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি প্রো: মোঃ আফাজ উদ্দিন মুন্সি, বি এ ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
৮	গুণগত মানসম্পন্ন রেণু উৎপাদন (রুই জাতীয়/অন্যান্য প্রজাতি)	মা ফাতিমা ফিস হ্যাচারি প্রো: মোঃ ফিরোজ খাঁন যশোর সদর, যশোর	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
৯	গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন	হাবিব মৎস্য খামার প্রো: মোঃ হাবিবুর রহমান ঈশ্বরদী, পাবনা	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
১০	গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন	রাইয়াত ফিস ফার্ম প্রো: মোঃ এহতে শাহমুল হক (টুটুল) যশোর সদর, যশোর	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
১১	গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন	মোঃ শাহীন কবির প্রধান সম্রাট বোদা, পঞ্চগড়	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
১২	মাছ উৎপাদন	এলিট একোয়াকালচার লিঃ প্রো: মোঃ এইচ কে আনোয়ার টেকনাফ, কক্সবাজার	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
১৩	মাছ উৎপাদন	মেঘশিমুল এগ্রো ফিসারিজ মোহাম্মদ আব্দুল গাফ্ফার খান পূর্বধলা, নেত্রকোনা	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
১৪	বাগদা চিংড়ির গুণগত মানসম্পন্ন পিএল উৎপাদন	মোস্তফা শ্রীম্প প্রোডাক্টস লিঃ প্রো: আলহাজ কফিল উদ্দীন উখিয়া, কক্সবাজার	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
১৫	মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকরণ (হিমায়িত চিংড়ি/শুটকি ইত্যাদি)	বাগেরহাট সী ফুড ইন্ড্রাস্টিজ লিঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস. এম. আমজাদ হোসেন ফকিরহাট, বাগেরহাট	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র
১৬	মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকরণ (হিমায়িত চিংড়ি/শুটকি ইত্যাদি)	সেন্টমার্টিন সী ফুড লিঃ রূপসা, খুলনা	একটি রৌপ্য পদক, ১৫,০০০/- টাকা এবং একটি সনদপত্র

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০০৮-২০০৯ সালের তথ্যানুযায়ী)

১.	অভ্যন্তরীণ মৎস্যের জলায়তন		
	(ক) বদ্ধ জলাশয়	ঃ	৫,২৮,৩৯০ হে.
	▪ পুকুর ও ডোবা	ঃ	৩,০৫,০২৫ হে.
	▪ অক্সবো লেক (বাঁওড়)	ঃ	৫,৪৮৮ হে.
	▪ চিংড়ি খামার	ঃ	২,১৭,৮৭৭ হে.
	(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	ঃ	৪০,৪৭,৩১৬ হে.
	▪ নদী ও মোহনা	ঃ	১০,৩১,৫৬৩ হে.
	▪ বিল	ঃ	১,১৪,১৬১ হে.
	▪ কাপ্তাই লেক	ঃ	৬৮,৮০০ হে.
	▪ প্লাবনভূমি	ঃ	২৮,৩২,৭৯২ হে.
২.	সামুদ্রিক মৎস্যের জলায়তন		
	▪ সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	▪ একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	ঃ	৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	▪ মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	ঃ	২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	▪ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	ঃ	৭১০ কিলোমিটার
৩.	▪ জেলের সংখ্যা	ঃ	১২.৮০ লক্ষ
	▪ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	ঃ	৭.৭০ লক্ষ
	▪ সামুদ্রিক জেলে	ঃ	৫.১০ লক্ষ
৪.	মৎস্য চাষি		
	▪ মৎস্য চাষি	ঃ	৩০.৮০ লক্ষ
	▪ চিংড়ি চাষি	ঃ	১১.৫০ লক্ষ
৫.	মৎস্য উৎপাদন		২৭,০১,৩৭০ মে.টন
	▪ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	ঃ	২১,৮৬,৭২৬ মে.টন
	▪ উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	ঃ	১১,২৩,৯২৫ মে.টন
	▪ বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	ঃ	১০,৬২,৮০১ মে.টন
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য	ঃ	৫,১৪,৬৪৪ মে.টন
	▪ ট্রলার দ্বারা আহরণ	ঃ	৩৫,৪২৯ মে.টন
	▪ ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	ঃ	৪,৭৯,২১৫ মে.টন
৬.	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি		
	▪ পরিমাণ	ঃ	৭২,৮৮৮ মে.টন
	▪ মূল্য	ঃ	৩,২৪৩.৪১ কোটি টাকা
	▪ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	ঃ	১৩৩ টি (লাইসেন্সকৃত ৭৫, ই ইউ অনুমোদিত-৬৫)
	▪ বৈদেশিক মুদ্রায় অবদান	ঃ	৩.০০%
৭.	জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান		
	▪ GNP-তে মাছের মূল্য (বর্তমান বাজার মূল্য)	ঃ	১৯,৫৬৭.৯০ কোটি টাকা
	▪ GDP-তে অবদান	ঃ	৩.৭৪%
	▪ কৃষিখাতে অবদান	ঃ	২২.২৩%

৮. মাছ গ্রহণ (Fish Intake) ও চাহিদা

- জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ ঃ ১৭.৫২ কেজি
- মাছের বাৎসরিক চাহিদা ঃ ২৯.৭৪ মে.টন
- জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা ঃ ২০.৪৪ কেজি
- প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান ঃ ৫৮%

৯. বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি

- মৎস্য হ্যাচারি ঃ ৮৫৪
- মৎস্য নার্সারি ঃ ৮,৮৮১ টি
- হ্যাচারির রেণু উৎপাদন ঃ ৪,৫৯,৮০৪ কেজি
- প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ ঃ ১,৮৭৬ কেজি
- নার্সারিতে পোনা মাছ উৎপাদন ঃ ৯৬,০০১ লক্ষ

১০. বেসরকারি চিংড়ি হ্যাচারি

- বাগদা হ্যাচারি ঃ ৫৮টি
- বাগদার রেণু উৎপাদন (পিএল) ঃ ৫১.০০০ লক্ষ
- গলদা হ্যাচারি ঃ ৫৩টি
- গলদার রেণু উৎপাদন (পিএল) ঃ ১০,৮০০ লক্ষ
- প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ির রেণু সংগ্রহ ঃ ১০,০০০ লক্ষ

১১. সরকারি অবকাঠামো (সংখ্যা)

- মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ খামার ঃ ০৬টি
- মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী ঃ ০১টি
- মৎস্য হ্যাচারি/মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ঃ ১১২টি (হ্যাচারি -৭৭ টি)
- হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন ঃ ৫,৫৫০ কেজি
- বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি ঃ ০২টি
- গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ঃ ১৭টি
- চিংড়ির প্রদর্শনী খামার ঃ ০২টি
- চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র ঃ ২০টি
- মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (বিএফডিসি) ঃ ০৯টি
- মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র (উপকেন্দ্র) ঃ ০৯টি

১২. সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)

- ট্রলার ঃ ১৪১টি
- ইঞ্জিন চালিত নৌকা ঃ ২১,৪৩৩টি
- ইঞ্জিন বিহীন নৌকা ঃ ২২,৫২৭টি
- সনাতনী নৌকা ঃ ৪৩,৯৬০টি
- জাল ও বড়শী ঃ ২,১৮,৫৮১টি

১৩. মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)

- মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি ঃ ২৬৫টি
- বিদেশী মৎস্য প্রজাতি ঃ ১২টি
- মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি ঃ ২৪টি
- সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি ঃ ৪৭৫টি
- সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি ঃ ৩৬টি

১৪. মৎস্য সেক্টরের জনবল

- মৎস্য অধিদপ্তর ঃ ৪,৭৮০ (১ম শ্রেনী - ৯২৬ জন)
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঃ ২৪৬ (১ম শ্রেনী - ৭৭)
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ঃ ৭৯১ (১ম শ্রেনী - ৯৪ জন)

সংকলিত ঃ মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ।

বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন
২০০৮-২০০৯

মৎস্য সেক্টর	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা অংশ	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়				
(১) মুক্ত জলাশয়				
১. নদী ও মোহনা	৮৫৩,৮৬৩	১৩৮,১৬০		১৬২
২. সুন্দরবন	১৭৭,৭০০	১৮,৪৬২		১০৪
৩. বিল	১১৪,১৬১	৭৯,২০০		৬৯৪
৪. কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	৮,৫৯০		১২৫
৫. প্লাবনভুমি	২,৮৩২,৭৯২	৮৭৯,৫১৩		৩১০
মোট	৪,০৪৭,৩১৬	১,১২৩,৯২৫	৪১.৬১%	
(২) বদ্ধ জলাশয়				
১.পুকুর	৩০৫,০২৫	৯১২,১৭৮		২৯৯১
২.বাঁওড়	৫,৪৮৮	৫,০৩৮		৯১৮
৩. চিংড়ি খামার	২১৭,৮৭৭	১৪৫,৫৮৫		৬৬৮
মোট	৫২৮,৩৯০	১,০৬২,৮০১	৩৯.৩৪%	
অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট)	৪,৫৭৫,৭০৬	২,১৮৬,৭২৬	৮০.৯৫%	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়				
১. ট্রলার		৩৫,৪২৯		
২. আর্টিসেনাল		৪৭৯,২১৫		
সামুদ্রিক জলাশয় (মোট)		৫১৪,৬৪৪	১৯.০৫%	
সর্বমোট		২,৭০১,৩৭০	১০০%	

বছরভিত্তিক চিংড়ির উৎপাদন

বছর	চিংড়ির উৎপাদন (মে. টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসেনাল	মোট		
১৯৮৬-৮৭	৪২৮৮২	১৪৭৭৩	৫৭৬৫৫	৪৪৮৮	১০৬৬৬	১৫১৫৪	৭২৮০৯	২০.২৯
১৯৯৭-৮৮	৩৬৩৮৬	১৭৮৮৯	৫৪২৭৫	৩৫৪৫	১১৫৩৫	১৫০৮০	৬৯৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪২৮২৪	১৮২৩৫	৬১০৫৯	৪৮৯৩	১২২১১	১৭১০৪	৭৮১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-৯০	৩৬২৮৪	১৮৬২৪	৫৪৯০৮	৩১১৭	১২৭৫১	১৫৮৬৮	৭০৭৭৬	২৬.৩১
১৯৯০-৯১	৪৩২৬২	১৯৪৮৯	৬২৭৫১	৩৬৯৬	১৩৯৩৭	১৭৬৩৩	৮০৩৮৪	২৪.২৪
১৯৯১-৯২	৬১০৪২	২০৩৩৫	৮১৩৭৭	২৯০২	১৭১৪০	২০০৪২	১০১৪১৯	২০.০৫
১৯৯২-৯৩	৭৮২২৬	২৩৫৩০	১০১৭৫৬	৪১৮৮	১৯৭৮৭	২৩৯৭৫	১২৫৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-৯৪	৫০৭২১	২৮৩০২	৭৯০২৩	৩৪৭৯	১৮০৪০	২১৫১৯	১০০৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-৯৫	৫৮৯৭৩	৩৪০৩০	৯৩০০৩	২৪১৬	১৭৯৪৭	২০৩৬৩	১১৩৩৬৬	৩০.০২
১৯৯৫-৯৬	৪৪০৭৯	৪৬২২৩	৯০৩০২	৩৫৮৮	২২৭৬৫	২৬৩৫৩	১১৬৬৫৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-৯৭	৪১৮৬৮	৫২২৭২	৯৪১৪০	৩৫৩৭	২১২৮১	২৪৮১৮	১১৮৯৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৪৬৬৩৫	৬২১৬৭	১০৮৮০২	২৪৪৪	২২৩৪৬	২৪৭৯০	১৩৩৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৪	১১২৪৬০	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০২	৪৩.৮০
১৯৯৯-০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২২১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০

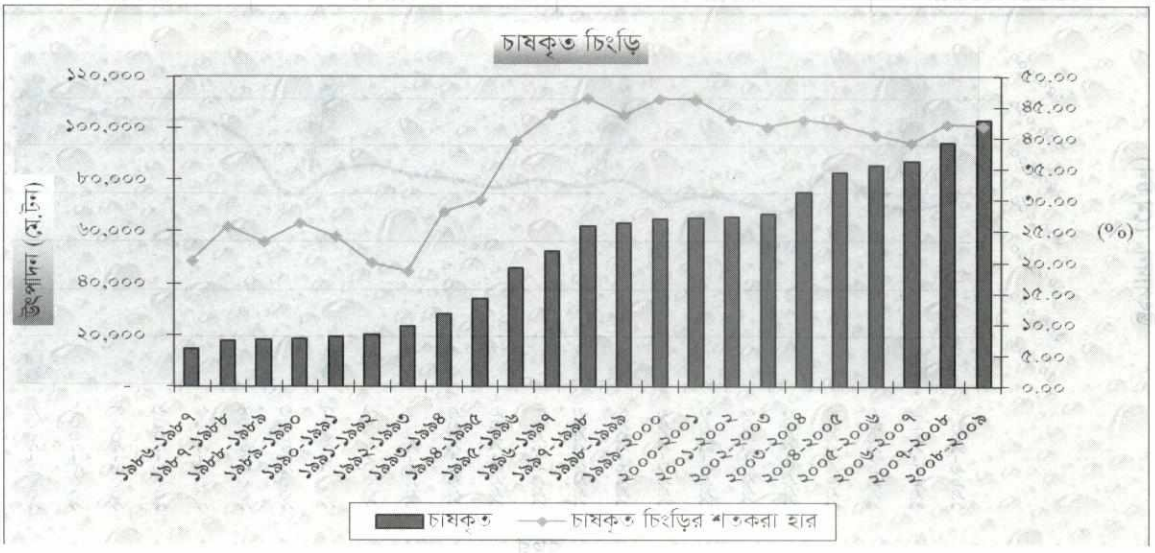

বছরভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন

বৎসর	ইলিশের উৎপাদন (মে.টন)		
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৮৫৫১	১০৪৯৫০	১৮৩৫০১
১৯৮৮-১৯৮৯	৮১৬৪১	১১০৩১১	১৯১৯৫২
১৯৮৯-১৯৯০	১১২৪০৮	১১৩৯৪৩	২২৬৩৫১
১৯৯০-১৯৯১	৬৬৮০৯	১১৫৩৫৮	১৮২১৬৭
১৯৯১-১৯৯২	৬৮৩৫৬	১২০১০৬	১৮৮৪৬২
১৯৯২-১৯৯৩	৭৪৭১৫	১২৩১১৫	১৯৭৮৩০
১৯৯৩-১৯৯৪	৭১৩৭০	১২১১৬১	১৯২৫৩১
১৯৯৪-১৯৯৫	৮৪৪২০	১২৯১১৫	২১৩৫৩৫
১৯৯৫-১৯৯৬	৮০৬২৫	১২৬৬৬০	২০৭২৮৫
১৯৯৬-১৯৯৭	৮৩২৩০	১৩১২০৪	২১৪৪৩৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৮১৬৩৪	১২৪১০৫	২০৫৭৩৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৭৩৮০৯	১৪০৭১০	২১৪৫১৯
১৯৯৯-২০০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২
২০০০-২০০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪
২০০১-২০০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩
২০০২-২০০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২
২০০৩-২০০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯
২০০৪-২০০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২
২০০৫-২০০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩
২০০৬-২০০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯
২০০৭-২০০৮	৮৯,৯০০	২০০১০০	২৯০০০০
২০০৮-২০০৯	৯৫,৯৭০	২০২,৯৫১	২৯৮,৯২১

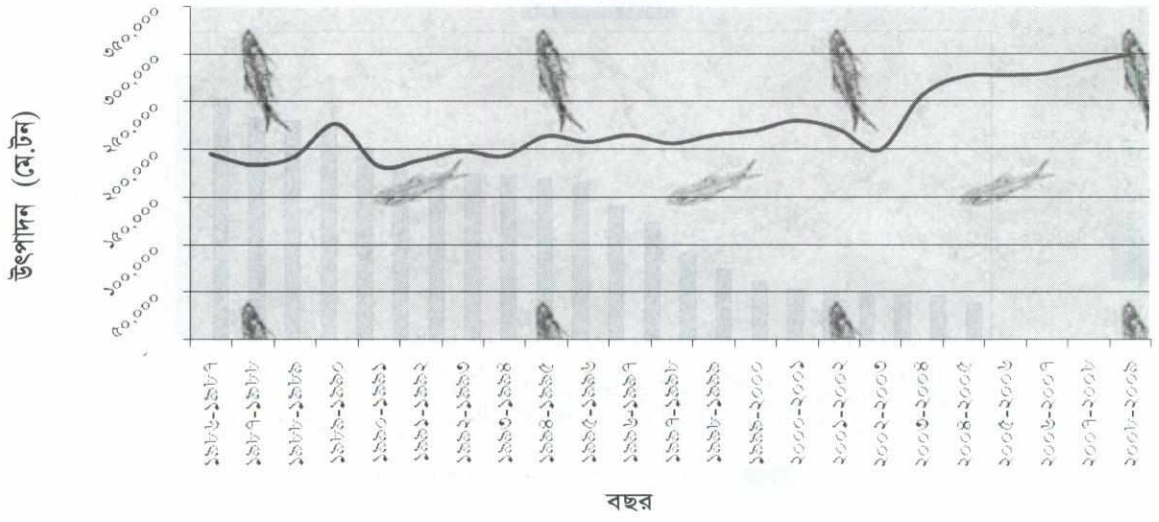

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণঃ টন
মূল্যঃ কোটি টাকা

বৎসর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবনাক্তও পানিশুন্য মাছ		কচ্ছপ/কাকঁড়া/ ইল		হাঙ্গরেরপাখনা এবং মাছে রফোটকা		অন্যান্য		মোট		মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ
	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	পরিমাণ	মুল্য	%
৯২-৯৩	১৯২২৪	৬০৪.০৩			২৭০৪	৩৮.৩১	১০৪২	১২.২৬	৫৯৯	৯.৮৪	২৮০০	২১.৬০	২৩৮.৩৯	১৪.২৫			২৬৬০৭	৭০০.২৯	৭.৫৭
৯৩-৯৪	২২০৫৪	৭৮৭.৭৩			৩১২৫	৫১.১৮	২৪৭৩	৪১.৮৩	৫০	১.০৬	৪০৮৮	৩৬.৩৭	৪৫	২.৭৯			৩১৮৩৫	৯২০.৯৬	৯.১২
৯৪-৯৫	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭			৯২৬৭	১৮০.২৬	৫২১	৮.৩৯	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৭৬০	৪০.৬৭	২১২	১৬.৬০			৪১৬৮৬	১৩০৬.৯৪	৯.৩৮
৯৫-৯৬	২৫২২৫	১১০৬.৩৯			৮৮২৭	১৭৬.৬২	১৮২	৩.০৫	৪৩৬	১১.৪৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৬	৪.২১			৩৮৯২৯	১৩৪০.৯৪	৯.৩৮
৯৬-৯৭	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১			৮৭৫৪	১৭৬.৭৪	৪২৭	৭.৯২	৫৬১	১৩.৮১	৫৯৫২	৬১.৪৮	১১৩	৮.৫৫			৪১৫৪৯	১৪৫৭.৪১	৭.৭৫
৯৭-৯৮	১৮৬৩০	১১৮১.৪৮			৮৮৩৬	১৫১.৬৬	২৩৩	৩.১১	১১০৬	২৬.৪৩	১১৯৮	১৪.৩৪	১৫৫	১০.৭৯			৩০১৫৮	১৩৮৭.৮১	৫.৮৩
৯৮-৯৯	২০১২৭	১১৬২.২১			৬৩৯৫	১৫৩.৯৬	১৩৭	২.২৩	১২৩২	৩৭.১৮	৪৮৬	৬.৩৯	১৫৪	১৭.৪০			২৮৫৩১	১৩৭৯.৩৭	৫.৪১
৯৯-০০	২৮৫১৪	১৬১২.১৫			৯৪৮৪	১৩৭.১৯	২১৫	৩.৬৫	৮০৯	২৫.৯৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩১.১৭			৩৯৩৯১	১৮১১.৫৬	৬.২৮
০০-০১	২৯৭১৩	১৮৮৫.১৫			৭৯৬৫	৯৪.৮৯	১৩৭	২.০২	৮৩৮	২৭.৭৩	১৫৪	২.৩৩	১৮১	২০.৬৩			৩৮৯৮৮	২০৩২.৭৫	৫.৭৭
০১-০২	৩০২০৯	১৪৪৭.৭৬			৯৮৬৪	১৩৭.৩৯	৫১৭	৮.৩২	২৯৩	৯.৫৩	৩৩৬	৭.০৭	২৬৩	২৭.০৭			৪১৪৮২	১৬৩৭.১৪	৪.৭৬
০২-০৩	৩৬৮৬৪	১৭১৯.৮৮			৮৮৪৬	১৫৮.৬৪	৩৩৩	৭.০২	৫২৬	১৯.১২	৬৩০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩৫			৪৭৩৭১	১৯৪১.৫৯	৫.১০
০৩-০৪	৪২৯৪৩	২১৫২.৭৭			১০২২৯	২০২.২৪	৪৭২	৪.১৬	৩৭৭	১.৩৮	১১৬	১.৩৯	৪	১.৫৩			৫৪১৪১	২৩৬৩.৪৭	৫.৭১
০৪-০৫	৪৬৫৩৩	২২৮১.৫৯			১৫৭৬৩	২৫৬.২০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.৯৭	৩৮	০.৮৬	১	০.৩৯			৬৩৩৭৭	২৫৭১.৭২	৫.৯০
০৫-০৬	৪৯৩১৭	২৬৯৮.৩৫	৫৭	০.৪৮	১৭৪২৯	২৯৪.১৪	১৫০	২.১৯	৫৯১	১৯.৮৪	১১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৮০	১০০	১.০৯	৬৮৮২৯	৩০২৯.৮৪	৪.৫৬
০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮০	১১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৮	০.৮৬	৭৩৭০৪	৩৩৫২.৮৯	৪.৯০
০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৬৩.৯২	১০	০.১৫	২৩৫১৫	৪৯৫.৪৬	২১০	২.৬৭	৬৫৮	২৬.৯৭	৪৩৯	৪.৮৮	২৬৬	১.৮২	২৯৪	০.৪১	৭৫২৯৯	৩৩৯৬.২৮	৪.০৪
০৮-০৯	৫০৩৬৮	২৭৪৪.১২	০.৩	০.০০০৬	১৯২৯৪	৪৫০.৯০	৩৪১	১১.৯৯	৮৪	৩.৯২	১২১৭	১১.৯৮	২৭৬	১.৭৭	১৩০৮	১৮.৭৩	৭২৮৮৮	৩২৪৩.৪১	৩.০০

চিল্ড ফিস সংযুক্ত

- রপ্তানিকৃত ইলিশ (চিল্ড) ৩৬৮০মে.টন এবং আয়কৃত মূল্য ১৪৯.০৬ কোটি টাকা প্রায় (২০০৮-২০০৯)

বছরভিত্তিক বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন

১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৮-২০০৯

(এককঃ মে.টন)

মৎস্য সেক্টর	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১২৪২৬২০	**১৩২৭৫৮৫**	**১৪০১৫৬০**	**১৪৭৫০৩৯**	**১৫৬৬২৮৯**	**১৬৪৬৮১৯**	**১৭৪১৩৬০**	**১৮৪৮৭৩৫**	১৯৫২৫৭৩	২০৬৫৭২৩	২১৮৬৭২৬
(১) মুক্ত জলাশয়	৬৪৯৪১৮	৬৭০৪৬৫	৬৮৮৯২০	৬৮৮৪৩৫	৭০৯৩৩৩	৭৩২০৬৭	৮৫৯২৬৯	৯৫৬৬৮৬	১০০৬৭৬১	১০৬০১৮১	১১২৩৯২৫
১.নদী ও মোহনা	১৫১৩০৯	১৫৪৩৩৫	১৫০১২৯	১৪৩৫৯২	১৩৭৮৪৮	১৩৭৩৩৭	১৩৯৭৯৮	১৩৭৮৫৯	১৩৬৯৫৮	১৩৬৮১২	১৩৮১৬০
২. সুন্দরবন	১১১৩৪	১১৬৪৮	১২০৩৫	১২৩৪৫	১৩৮৮৪	১৫২৪২	১৫৭২৪	১৬৪২৩	১৭৭৫১	১৮১৫১	১৮৪৬২
৩. বিল	৬৯৮৫৭	৭২৮২৫	৭৪৫২৭	৭৬১০১	৭৫৪৬০	৭৪৩২৮	৭৪৯২৫	৭৬৩৬৫	৭৫১৩৭	৭৭৫২৪	৭৯২০০
৪. কাপ্তাই লেক	৬৬৮৯	৬৮৫২	৭০৫১	৭২৪৭	৭০২৫	৭২৩৮	৭৩৭৯	৭৫৪৮	৮০৮৫	৮২৪৮	৮৫৯০
৫. প্লাবনভুমি	৪১০৪৩৬	৪২৪৮০৫	৪৪৫১৭৮	৪৪৯১৫০	৪৭৫১১৬	৪৯৭৯২২	৬২১৪৪৩	৭১৮৪৯১	৭৬৮৮৩০	৮১৯৪৪৬	৮৭৯৫১৩
(২) বদ্ধ জলাশয়	৫৯৩২০২	৬৫৭১২০	৭১২৬৪০	৭৮৬৬০৪	৮৫৬৯৫৬	৯১৪৭৫২	৮৮২০৯১	৮৯২০৪৯	৯৪৫৮১২	১০০৫৫৪২	১০৬২৮০১
১. পুকুর	৪৯৯৫৯০	৫৬১০৫০	৬১৫৮২৫	৬৮৫১০৭	৭৫২০৫৪	৭৯৫৮১০	৭৫৬৯৯৩	৭৫৯৬২৮	৮১১৯৫৪	৮৬৬০৪৯	৯১২১৭৮
২. বাঁওড়	৩৫৩৬	৩৬২২	৩৮০১	৩৮৯২	৪০৯৮	৪২৮২	৪৩৮৮	৪৪৯৮	৪৬৯৮	৪৭৭৮	৫০৩৮
৩. চিংড়ি খামার	৯০০৭৬	৯২৪৪৮	৯৩০১৪	৯৭৬০৫	১০০৮০৪	১১৪৬৬০	১২০৭১০	১২৭৯২৩	১২৯১৬০	১৩৪৭১৫	১৪৫৫৮৫
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	৩০৯৭৯৭	৩৩৩৭৯৯	৩৭৯৪৯৭	৪১৫৪২০	৪৩১৯০৮	৪৫৫২০৭	৪৭৪৫৯৭	৪৭৯৮১০	৪৮৭৪৩৮	৪৯৭৫৭৩	৫১৪৬৪৪
১.ট্রলার	১৫৮১৮	১৬৩০৪	২৩৯০১	২৫১৬৫	২৭৯৫৪	৩২৬০৬	৩৪১১৪	৩৪১৮৪	৩৫৩৯১	৩৪১৫৯	৩৫৪২৯
২.আর্টিসেনাল	২৯৩৯৭৯	৩১৭৪৫৯	৩৫৫৫৯৬	৩৯০২৫৫	৪০৩৯৫৪	৪২২৬০১	৪৪০৪৮৩	৪৪৫৭২৬	৪৫২০৪৭	৪৬৩৪১৪	৪৭৯২১৫
সর্বমোট	**১৫৫২৪১৭**	১৬৬১৩৮৪	**১৭৮১০৫৭**	**১৮৯০৪৫৯**	**১৯৯৮১৯৭**	**২১০২০২৬**	**২২১৫৯৫৭**	**২৩২৮৫৪৫**	২৪৪০০১১	**২৫৬৩২৯৬**	**২৭০১৩৭০**
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার	৬.০৭	৭.০২	৭.২০	৬.১৪	৫.৭০	৫.২০	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নং
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	৭১৬২৪৩০ (অ) ৭১৬১৫৫৫ (অ) ৯৩৫৩৯৪৫ (বা)
জনাব পিয়ার মোহাম্মদ মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৭১৬৩৯৩০ (অ) ০১৭১১৯০৩৬০৩ (বা)
জনাব হিলটন কুমার সাহা মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৭১৬৪৭০২ (অ)
জনাব মোঃ আলী হোসেন মাননীয় মন্ত্রীর সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা	৭১৬২৫১৬ (অ) ৯৬৬০০০৭ (বা)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬২৪৩০ (অ) ৭১৬১৫৫৫ (অ)
জনাব মোঃ শরফুল আলম সচিব	৭১৬৪৭০০ (অ) ৮৬৫১৫১৭ (বা) ৭১৬১১১৭ (ফ্যা)
জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন সচিবের একান্ত সচিব	৭১৬১২৫৮ (অ) ৮৩৩২৮১৪ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬৪৭০০ (অ)
জনাব মোশাররেফ হোসেন যুগ্ম-সচিব (প্রঃ/ প্রাণিসম্পদ)	৭১৬৬২৬৩ (অ) ৯৩৩১৬২৫ (বা)
জনাব মুহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৭১৬১৯৭৭ (অ) ৮৬১৩০৭৯ (বা)
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন যুগ্ম-প্রধান	৭১৬৭৯৬৯ (অ) ৯৮৭০০৫০ (বা)
জনাব মোঃ আশরাফ আলী উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ)	৭১৬৯৫৬২ (অ) ৮০৫৬১৪৬(বা)
বেগম আফিয়া খাতুন উপ-সচিব (প্রশাসন)	৭১৬৯৫৬৫ (অ) ৮১৪৪৪৯৭ (বা)
ড. মোঃ মফিজুর রহমান উপ-সচিব (মৎস্য-১)	৭১৬৯৫৬৩ (অ) ০১৫৫২৩৮৩৬২১ (বা)
জনাব মোঃ আঃ মালেক উপ-সচিব (মৎস্য-২)	৭১৬২৭৮৩ (অ) ০১৮২৩১৫৮৭৭৪ (বা)
জনাব মোঃ জাকির হোসেন উপ-প্রধান	৭১৬৯৫৬৪ (অ) ৮৩১৫০০৩ (বা)
বেগম রুম্মান আখতার খান উপ-সচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা)	৯৫৫১০০৭ (অ) ৯০০২৬৭৩ (বা)
জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা উপ-সচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)	৭১৬৪৬৯১ (অ)
বেগম জেবুন্নেছা করিম সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রঃ-৩ অধিশাখা)	৭১৬১৪০৭ (অ) ৯৩৫৯৮৪০ বা)
জনাব মোঃ আজিজুল হক সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)	৯৫৫৩৮৪০ (অ) ৯৬৭০৭৪২ (বা)
জনাব মজিবুল হক মজুমদার প্রটোকল অফিসার	০১৭২৬২১৩০০২ (বা)
বেগম রোকসানা তারান্নুম সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-১)	৭১৭২৫৪৫ (অ)
জনাব শাব্বীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-২ ও আইন)	৭১৬৭৩০৬(অ)
জনাব আবদুর রশিদ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৩)	৭১৭০০৫২ (অ)
জনাব আবু ফজল মোঃ রফি উদ্দিন উপ-সচিব (মৎস্য-৪ সা.ম. অধিশাখা)	৭১৭২০৩৮ (অ) ০১৭১৫০০৩৯৩০ (বা)
ড. মোয়াজ্জেম হোসেন উপ-সচিব (মৎস্য-৫ সা.ম. অধিশাখা)	৭১৭২১৪১ (অ)
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম উপ-সচিব (প্রাঃ অধি -২)	৯৫৬১১১৭ (অ)
ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন উপ-সচিব (প্রাণিঃ-৩ অধিশাখা)	৭১৬২২২১ (অ) ৯১৩১৪০৭ (বা)
বেগম স্মৃতি কর্মকার সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাঃ-১ অধি)	৯৫৬৬৯৪৭ (অ)
জনাব মোঃ উবায়দুল হক সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য-২)	৭১৬২১৬৫ (অ) ৯৩৩৫২৫৬ (বা)
বেগম জোবায়েদা বেগম সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রাণিঃ- ২)	৯৫৬৫৭৭৫ (অ) ০১৯১১৩০৬৭২৮ (বা)
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সহকারী প্রধান (মৎস্য-৩)	৭১৬২০৭৬ (অ) ০১৭১৫৪২৪৫৪৫ (বা)
 সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রাণিঃ-১)	৭১৬২০৭৬ (অ)
জনাব সুব্রত শিকদার সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য-১)	৭১৭০১০৮ (অ) ০১৭১১১৫৬২৩৬ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুলাহ আল মুস্তাসিম বিল্লাহ সহকারী প্রধান (মনিটরিং-২)	৯৫৫০৩৭১ (অ)
 সহকারী প্রধান (মৎস্য- ২)	৭১৭০১০৮ (অ)
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৭০৬৬০ (অ) ৮৬৫২৯০৯ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মজুমদার স্টোর অফিসার	০১৭১৬৫০৫৮৭১ (বা)
পিপিএসইউ	৯৫৬২১৫১ ৯৫৬২৪৭৪ (ফ্যা)
বেগম কাজী ফহমিদা হক সিএও, মপম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	৮৩৫৬২৭৪ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
www.fisheries.gov.bd

জনাব মোঃ মজিবুর রহমান মহাপরিচালক dg@fisheries.gov.bd	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯১৪২৯১৯ (বা) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আবদুল খালেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিচালক)	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ৯১১১৭৩৬ (বা) ৯৫৬১৩৫৫ (ফ্যা) khalequedofbd@yahoo.com
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান **প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা** (চলতি দায়িত্ব)	৯১৪৩০৪৪ (বা) mmrahman54@yahoo.com
পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৭১৮১২ (অ)
জনাব এ এস এম জাহাঙ্গীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) ৮০৫৬৫১৫ (বা)
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন উপপরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৭২১৭ (অ) nasir_hyun@fisheries.gov.bd
জনাব এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ)
জনাব সুকমল চন্দ্র সূত্রধর উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৬১৭১৫ (অ)

জনাব সৈয়দ আরিফ আজাদ উপপরিচালক (মৎস্য চাষ)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ddaqua@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল উপপরিচালক (রিজার্ভ)	৮২৫১৬৪৫ (বা)
জনাব মোঃ নূরতাজুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৫০৭৫০ (অ)
জনাব মোঃ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯৫৬০৪৫৭ (অ) ৮৯১৫২৬১ (বা)
জনাব রমেশ চন্দ্র মণ্ডল উপ-প্রধান	mandalrc@gmail.com
বেগম আখতার জাহান চৌধুরী উপ-প্রধান (বাস্তবায়ন)	৯৫৬৫০২১ (অ) ৯৬৬২৭৯০ (বা) aghan.dc.fisheries.bd
জনাব মোঃ আবদুর রউফ উপ-প্রধান	৯৫৬৯২৯৫ (অ) ৭৬৪৭৩৭৭ (বা)
জনাব আ.ক.ম. আজিজুল হক মোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ৮২৫০৪৩২ (বা)
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৯৫৫২১৭৯ (অ) ৯০১৬৩০৬ (বা)
বেগম রওশন আরা বেগম সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ)
জনাব মোঃ আবুল খায়ের সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	৯৫৬০৪৭২ (অ) ০৮১/৬৬৫৮২ (বা) khair@fisheries.gov.bd ,
ড. এস. এ. শামীম আহমাদ সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	sashameem02@yahoo.com
জনাব মোঃ ইউসুফ খান প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) yousuf@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মহসিন-উজ-জামান সহকারী পরিচালক (মৎস্য চাষ)	৯৫৬০৫১৭ (অ) mohsinzaman1@gmain.com
ড. মোহাঃ সাইনার আলম সহকারী পরিচালক	sainardof@yahoo.com sainarnatp@gmail.com
জনাব মোঃ ফজলুল হক সহকারী পরিচালক (কল্যাণ)	fazlul hoque2004@yahoo.com
বেগম সৈয়দা শিরিন কুলসুমা খাতুন সহকারী পরিচালক (অডিট)	৯৫৫৫৩৪৯ (অ) syedashirin@yahoo.com
জনাব সৈয়দ আলী আজাহার সহকারী পরিচালক	৯৫৬০৬৫৩ (অ)
জনাব মোঃ ফজলুর রহমান সহকারী পরিচালক	fazludof2005@yahoo.com
জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	৯৫৬০৬৫৩ (অ) makhlesrhman@yahoo.com
জনাব মোঃ হামিদুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬৭২১৮ (অ)
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ)
জনাব তপন কুমার পাল সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) tapanaddof@yahoo.com
জনাব মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া সহকারী পরিচালক, লিগাল শাখা	৯৫৫০২৮০ (অ)
জনাব মোঃ আবুল হাশেম সহকারী পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)	৯৫৬৭২১৯ (অ)
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ-২)	৯৫৬৬১০৩ (অ) touhiddof@gmail.com

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৭১৬৯৬ (অ)
ড. মোঃ মোতাহার হোসেন সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৭১৬৯৬ (অ) motaher@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আলিমুজ্জামান নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬০৫৪৩ (অ) ৯১২৭৩৪৭ (বা)
জনাব মোঃ মানিক মিয়া মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	৯৫৬২৩৩৪ (অ) miamanik443@yahoo.com
বেগম কাজী হেলেনা আরজু মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	৯৫৬৩৬৭৪ (অ) arju1960@yahoo.com
জনাব মোঃ সৈয়দ হোসেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ)	৯৫৬৯২৯৫ (অ) ৮৩৫৫৩৪৫ (বা)
ড. মোঃ আবদুস সবুর উপজেলা মৎস্য অফিসার (রিজার্ভ)	a.sabur030856@yahoo.com
বেগম নাজমা বেগম উপজেলা মৎস্য অফিসার	nazma@fisheries.gov.bd
বেগম উম্মে কুলসুম ফেরদৌসী গবেষণা কর্মকর্তা	fera@fisheries.gov.bd
বেগম আয়েশা সিদ্দিকা তথ্য অফিসার	ayesha@fisheries.gov.bd
বেগম খালেদা খানম চৌধুরী গবেষণা কর্মকর্তা	৯৫৭০৩৫২ (বা)
বেগম সালমা সাইদ উপজেলা মৎস্য অফিসার	৯৫৬৭২১৬ salmasayeed.40@yahoo.com
জনাব মোঃ কামরুল হাসান গবেষণা কর্মকর্তা	khmanju_70@yahoo.com
জনাব মোঃ আবু সাঈদ উপজেলা মৎস্য অফিসার	sayeeddof@yahoo.com
জনাব এম. এম. মাহবুব আলম উপজেলা মৎস্য অফিসার	mhbb_alam@yahoo.com
জনাব মোহাঃ তরিকুল আলম উপজেলা মৎস্য অফিসার	৭১৬২৮০৪ talam_06@yahoo.com
জনাব মোঃ বছিরুজ্জামান সহকারী প্রধান	৯৫৭১৬৯৮ (অ) ৮৭১২৭২৬ (বা)
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ ভান্ডার কর্মকর্তা	৯৫৫৫৩৫১ (অ)
বেগম তানমী শাহরীন উপজেলা মৎস্য অফিসার (ডোসিয়ার শাখা)	৯৫৬৯৩২০ (অ) tanmi_s1998@yahoo.com
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম উপজেলা মৎস্য অফিসার (একান্ত শাখা)	৯৬৫৯৯৩৪ (অ) rafiq_sarker1971@yahoo.com
জনাব বিশ্বজিৎ কুমার দেব মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৭১৬২৮০৪ (অ) bishwajit@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ইউনুস মিয়া প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৮৮ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

বেগম প্রভাতি দেব পিডি, হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্প	০৩১/২৫৮০৯৮২ (অ)
জনাব ওয়াহিদুজ্জামান পিডি, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	৯৫৫৮০৭০ (অ)
জনাব জোয়ারদার মোঃ আনোয়ারুল হক পিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা (ইউপমস) সম্প্রসারণ প্রকল্প	৯৫১৩৫০৭ (অ) ৮১০১৭৮৬ (বা) ৯৫১৩৫০৬ (ফ্যা) anwarulhaque35@yahoo.com

ড. এস.এম. শামছুর রহমান সহকারী পরিচালক, ইউপমস প্রকল্প	৯৫১৩৫০৬ smsrahman_bau@yahoo.com
জনাব এস. এম. রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক, ইউপমস প্রকল্প	৯৫১৩৫০৬ (অ) rezaul6950@hahoo.com
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম এডি, ঢাকা বিভাগ, ইউপমস প্রকল্প	asalam_id61@yahoo.com
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	০৪৩১/২১৭৬২৯৩-৫, ০৪৩১/৬৪০১৮ (অ) ০৪৩১/৬১৮৫২ (বা) monwar.hossain@gmail.com
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন প্রকল্প পরিচালক, এসআইসিডি প্রকল্প	৯৫৬৯০২৬ (অ) ৯৫৫৪৮৬৭ (ফ্যা) nasir_hyun@fisheries.gov.bd
জনাব এ.কে.এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক সহকারী পরিচালক, এসআইসিডি প্রকল্প	৯৫৬৯০৪১ (অ) lutfur.dhaka@yahoo.com
জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৪৫৭৭ (অ) ৮৭১৩৬১৯ (বা) ৭১১১৫৪৪ (ফ্যা) abm.anwarul@yahoo.com
জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান এডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৬৮০৯ (অ) atiar_dof@yahoo.com
জনাব মনমথ সরকার এডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প, খুলনা	০৪১/৭৬২০১০
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিডি, যশোর জেলার ভবগহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, খুলনা	০৪২১/৬১৪৩৬ (অ) ০৪২১/৬১৪৮৬ (ফ্যা)
জনাব মোহাম্মদ হাসান পিডি, বৃহত্তর ফরিদপুর মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	৬৬৮৫৪৫৪ (অ)
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন পরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প	৯৫৬১৬৮৫ (অ)
জনাব খঃ মাহবুবুল হক সহকারী পরিচালক, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) kmahbubh252@yahoo.com
বেগম মোছাঃ নাসিমা সুলতানা বাজেট ও হিসাব রক্ষণ অফিসার, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) nasima_dof63@yahoo.com
জনাব মোঃ জর্জিসুর রহমান সহকারী পরিচালক, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ)
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ মুকুল সহকারী পরিচালক, এনএটিপি	৯৫৫৫৩৫১ (অ) sarkerferoz@yahoo.com
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার পিসিডি, ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় মৎস্য চাষি ও মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন প্রকল্প	৯৫৫২১৭৯ (অ)
জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম ডিপিডি, আরএফএলডিসি, নোয়াখালী	০৩২১/৬১৯৭৪ (অ) ০৩২১/৬২৮০৮ (ফ্যা)
জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান পিডি, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	৯৫৫৮০৭০ (অ) ৯৬৭৬৭৩৮ (বা)
বেগম ফরিদা বেগম পিসিডি, প-াবনভূমিতে মৎস্যচাষ প্রকল্প (দাউদকান্দি মডেল)	৯৫৬৮১১৯ (অ) ৯৬৬৫৪৫২ (বা) bfarida30@yahoo.com
জনাব আবু মাসুম সিদ্দিকী এডি, পাবনভূমিতে মৎস্য চাষ প্রকল্প	৭১১৮৩৮৩ (অ)
জনাব মোঃ আবুল হাশেম পিডি, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প	৯৫৬৭২১৯ (অ) hashemsumon@yahoo.com
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান এডি, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প	৯৫৬৬১০৩ (অ) touhiddof@gmail.com
জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদির পিডি, মৎস্য ডিপোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৭১১১৯০৪২ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্য) kadirmanjur@yahoo.com
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান এডি, মৎস্য ডিপোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৯৫৭১৮২০ (অ) monitang64@yahoo.com
জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান ডিএডি, মৎস্য ডিপোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৯৫৭১৮২০ (অ) mmukhlesdof@gmail.com
জনাব ছালেহ আহমদ এনপিডি, মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ প্রকল্প	৭১৬৮৩৮০ (অ) saleh_ahmednpd@yahoo.com
জনাব এ বি এম জাহিদ হাবিব প্রকল্প পরিচালক, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫৫৪৯৯২ (অ)
ড. নির্মল চন্দ্র রায় এডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৮ (অ) nirmalfirst@gmail.com
বেগম মাসুদ আরা মমি ডিএডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৮ (অ) nasudara_momi@yahoo.co.uk
জনাব জোয়ারদার শিবেন্দ্র নাথ প্রকল্প পরিচালক, বাঁওড় প্রকল্প	০৪২১/৬৩১০৮ (অ)
ড. নিত্যানন্দ দাস পিডি, বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, খুলনা	০৪১/৮৬১০৬৭ (অ)
জনাব আ ক ম শফিকুজ্জামান এডি, বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, খুলনা	০৪১/২৮৫০৩৮৪ (অ)
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান পিডি, বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৭৩১/৬৬০৬৮ (অ)
বেগম প্রভাতী দেব পিডি, হালদা নদী মৎস্য প্রকল্প	০৩১/২৫৮০৯৮২ (অ)
জনাব মোঃ আবদুল হান্নান মিয়া পিডি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	০৩৫১/৬২৩২৭ (অ)
ড. আনম আজিজুল ইসলাম খান ফোকাল পয়েন্ট, ইমার্জেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভরি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৯৫৬০৬৫৩ (অ) azizuldof@yahoo.com
জনাব তপন কুমার পাল পিসিডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	৯৫৬১৪৩৭ (অ) tapanaddof@yahoo.com

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

জনাব মুরাদ হোসেন পরিচালক	০৩১/৭২১৭৩১ (অ)
উপপরিচালক	০৩১/৮১৬৭৮৪ (অ)
জনাব আব্দুল করিম পিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা	০৩১/৭২৪২০৬ (অ)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ

জনাব হাবিবুর রহমান খোন্দকার উপপরিচালক, ঢাকা	৯৫৬৯৯৪৫ (অ) habibur54@yahoo.com
জনাব ম. কবীর আহমেদ উপপরিচালক, চট্টগ্রাম	০৩১/৬৮২৬০৩ (অ)
ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ উপপরিচালক, খুলনা	০৪১/৭৬০৪৯৫ (অ)
জনাব মোঃ রমজান আলী মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, খুলনা	০৪১/৭৬২০৭৩ (অ)
জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, খুলনা	০৪১/৫৮৫০১৭৯ (অ)

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচালক, এফটিএ, সাভার, ঢাকা	৭৭১২৫১৮ (অ)
জনাব কাজী ইকবাল আজম অধ্যক্ষ, এফটিআই, চাঁদপুর	০৮৪১/৬৩৪০২ (অ)
জনাব কাজী মাহবুবুল হক অধ্যক্ষ, এফটিইসি, ফরিদপুর	০৬৩১/৬২৪৫৭ (অ)
জনাব এস.এম. মহিব উল্যাহ এসএসও, এফবিটিসি, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	০৩৮২২/৫৬০৩৭ (অ) ০৩৮২২/৫৬০৩৯ (ফ্যা)
জনাব তপন কুমার দাস প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪/৭৪৩২৪ (অ)
জনাব মোঃ ইসহাক আলী খামর ব্যবস্থাপক, এফটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪/৭৪৪০২ (অ)

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারমাড়ি, ঢাকা

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচালক	**৯১১২২৬০ (অ)** **৯৬৭২৭৫৫ (বা)**
জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ালী খান প্রধান তথ্য অফিসার	**৮১৩০৪৭২ (অ)**
ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার	**৯১১৪২৬৪ (অ)**

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

জনাব মোঃ সাঈদ আলী মহাপরিচালক	৯১৪০৮৫০ (অ) ৯১৪০৮৫৭ (অ) ৯৫৬১৪৮৮ (বা)
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান পরিচালক (সরেজমিন উইং)	৮১২৩১৪৭ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	৯১৩১২৯৫ (অ) ৯১২১৩১৩ (বা)
জনাব একেএম শফিকুল আলম পরিচালক (খাদ্য শস্য উইং)	৯১১৭০৩০ (অ)
জনাব মোঃ ফজলুল করিম পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং)	৮১২৩৬৩৯ (অ) ৮১৪২২২৩ (বা)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

ডা. সুনীল চন্দ্র গাইন মহাপরিচালক	৮১১২৯৮৩ (অ) ৯১০১৯৩২ (অ)
ডা. মোঃ আব্দুল বাকী পরিচালক (প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন)	৯১১৭৭৩৬ (অ)
জনাব এ কে এম নাজমুন হাসান পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব মোঃ আশ্রাফ আলী পরিচালক (উৎপাদন)	৯১১৭৪৬৮ (অ)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা

ড. খান শহীদুল হক মহাপরিচালক	৭৭৯১৬৭৬ (অ) ৭৭৯১৬৮৮ (বা)

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

ড. মোঃ ইদ্রিস আলী দেওয়ান সদস্য (কৃষি)	৯১৪২৪৫৫(অ) ৯১১৭৪৯৫ (অ) ৮০৫৮৫৮৪ (বা)
জনাব মুঃ আনোয়ারুল আলম একান্ত সচিব	৯১০০৬৪৮ (অ) ৮০৩২৪২২ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল মালেক বিভাগ প্রধান	৯১১১৭২৫ (অ) ৮০১৮৬০২ (বা)
বেগম ছালেহা খাতুন যুগ্ম-প্রধান (বমপও সমন্বয়)	৮১১৪৭৩১ (অ) ৮১২০৭১১ (বা)
বেগম ইস্‌রাত জাহান তস্‌লিম উপ-প্রধান (মওপ)	৯১১৭৫৪৬ (অ) ৯১৩০১৯৯ (বা)
জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান সহকারী প্রধান (মওপ)	৯১১৭০৩৯ (অ)
জনাব এস,এম, ইমরুল হাসান সহকারী প্রধান (সমন্বয়)	৯১১৭৫৫০ (অ)

আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব মোঃ আব্দুল মালেক সচিব	৮১১৫০২৬ (অ) ৮৩৩২৮৬৩ (বা)
বেগম খোদেজা বেগম প্রধান	৮১১২৭১৩ (অ) ৮০৫৮২৩৮ (বা)
জনাব অমুল্য কুমার দেবনাথ মহাপরিচালক (CPTU)	৯১৪৪২৫২ (অ) ৮১২৬১৮৭ (বা)
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পরিচালক	৯১৩২৭৫৬ (অ) ৯১২৮৯১৩ (বা)
জনাব মোহাম্মদ আরিফুল হক সহকারী পরিচালক	৮১১৮১৫৩ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা

ড. ওয়ায়েস কবির নির্বাহী চেয়ারম্যান	৯১৩৫৫৮৭ (অ) ৯০১৪৯৭৫ (বা)
ড. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৮১১১৪৬৩ (অ)
জনাব কবির ইকরামুল হক সিএসও	৮১১০৬১৮ (অ)

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষিবিদ মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ সভাপতি	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ এ.এফ.এম. বাহাউদ্দিন *নাছিম* মহাসচিব	৯১১৪১৩৯ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা

বেগম খুরশিদা খাতুন চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১ (অ) ৮৩৬০১৬৬ (বা)
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন খান পরিচালক (অর্থ)	৭১৬২৮০০ (অ) ৯৩৩১৩৫৭ (বা)
জনাব মোঃ মমতাজ হোসেন মিয়া পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৬৪০০৭ (অ) ৮১২০২৮৬ (বা)
জনাব এম এ এইচ মলিক সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ) ৮২৫১০৪২ (বা)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা

জনাব ফজলুল হক উপপরিচালক (উপ-সচিব)	৭১৬৯৪৫৪ (অ) f.hoque_dd@yahoo.com
ড. মোঃ আব্দুল আলীম তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৭১৬৯৪৫৩ (অ) mdalim_2003@yahoo.com

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা	
কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচালক	৯১১২২৬০ (অ) ৯৬৭২৭৫৫ (বা)
কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়ালী খান প্রধান তথ্য অফিসার	৮১৩০৪৭২ (অ)
কৃষিবিদ ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ফার্ম ব্রডকাষ্টিং অফিসার	৯১১৪২৬৪ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ফ্যাক্সঃ ০৯১/৬৬৫৫৯	
ড. এম জি হোসেন মহাপরিচালক	০৯১/৬৫৮৭৪ (অ) ০৯১/৬১১১০ (বা)
ড. সালেহ উদ্দিন আহাম্মদ পরিচালক (গবেষণা ও অর্থ)	০৯১/৬৫০১০ (অ)
ড. মোঃ নুরুল্লাহ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৯১/৬১২৩১ (অ)
ড. মোঃ ইনামুল হক প্রকল্প পরিচালক	০৯১/৬২৬২৮ (অ)
জনাব মোঃ আলমগীর প্রকল্প পরিচালক	০৯১/৬২৬২৭
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সিএসও, স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	০৯১/৬২৭১০ (অ)
জনাব মোহাম্মদ জাহের সিএসও, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১/৬৩৪০৭ (অ) ০৮৪১/৬৩১৩২
ড. এস বি সাহা সিএসও, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা	০৪০২৭/৫৬০০৭(অ) ০৪০২৭/৫৬০৬০(বা)
ড. মোঃ শাহাব উদ্দিন সিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১/৬৩৮৫৫ (অ) ০৩৪১/৬৩২২৭ (বা)
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ পিডি, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট	০৪৬৮/৬২২৯১ (অ)

মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১/৬৭৪০১-০৬ ফ্যাক্সঃ ৬১৫১০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১/৭২০১৭১-৩ ফ্যাক্সঃ ৭৩১২৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯৬৬১৯০০-১৯ ফ্যাক্সঃ ৮৬১৫৫৮৩
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭২১/৭৫০০৪১-৯
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	০৩১/৭১৬৫৫২
মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১/৬৩৪৩৭৫
হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১/৬৫৪২৯
ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১/৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৭০৮৪৭৮-৫
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০৮২১/৭৬০৯৩০
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিসারিজ কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার, ঢাকা	৭৭১০০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (সি. স্কেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)
কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা	৮১১০০৬৮
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিলা	০৮১/৬৩৬০০
কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা	৯১১২২৬০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	৮৩১৬৮৮২ ৮৩১৭৫৩১

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা

বিশ্ব ব্যাংক	৯৬৬৯৩০১-৮
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৯৩৩৪০১৭-২২
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফ এ ও	৮১১৮০১৫-৮
ইউ এন ডি পি	৮১১৮৬০০-০৬
ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টার	৮৮১৩২৫০
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আই ইউ সি এন	৯৬৬৪৯৩০
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আই এম এফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৯৩৩৬৭০১-২০
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮

ঢাকা বিভাগ	
জনাব মোঃ ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী উপপরিচালক	৯৫৫০৮২২ (অ) ৮১০৫৩৪৭ (বা) ৯৫৬৫০২২ (ফ্যা)
জনাব ফেরদৌস আহমেদ সহকারী পরিচালক	৯৫৬৫০২২ (অ)
ঢাকা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৫৮৮৮৩ (অ) dfo.dhaka@fisheries.gov.bd
প্রকল্প কর্মকর্তা	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাভার	৭৭১২৫৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামরাই	০৬২২২/৭১১৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ	৭৭৬৬৪৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোহার	০৩৮৯৪/৬৮০০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৩৮৯৪/৩৮৮০৫১ (অ)
মানিকগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৫১/৬১৩৯১ (অ) dfo.manikganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৫১/৬১৭৯৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবালয়	০৬৫১/৭৫২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিঙ্গাইর	০৬৫২৭/৮৮০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাটুরিয়া	০৬৫২৫/৬২০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৬৫১/৭৪১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘিওর	০৬৫২৩/৫৬৩৪১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,হরিরামপুর	০৬৫২৪/৫৬০৪৬(অ)
মুন্সিগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৯১/৬২৫৯১ (অ) dfo.munshiganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৯১/৬৩৩৭৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীনগর	০৬৯২৫/৮৮০১৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজদিখান	০৬৯২৪/৮৮০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টংগীবাড়ী	০৬৯২৬/৭৪২৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মুন্সিগঞ্জ সদর	০৬৯১/৬২৫৮৩ (অ)

গাজীপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯২৫২৫২০ (অ) ৯২৬২৯৯৩ (বা) dfo.gazipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	৯২০৫২৪৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৬৮২৫/৫১০৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া	০৬৮২৪/৫১৩৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর	০৬৮২২/৫১১৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ	০৬৮২৩/৫১১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, টংগী	০২/৯২৯১৩১৭ (অ)
নরসিংদী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৪৬২৪১০ (অ) ৯৪৫১৩০০ (বা) dfo.narsingdi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৯৪৬২৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুরা	০৬২৫৫/৫৬১৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবপুর	০৬২৮/৭৫০৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশ	০৬২৮/৭৪৪১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলাবো	০৬২৫২/৬৩১০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরদী	০৬২৫৩/৫৬১৪৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নরসিংদী সদর	৯৪৬৩০০৬ (অ)
নারায়ণগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬৩০৬২৫ (অ) dfo.narayangan@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৭৬৫০১০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনারগাঁ	০৬৭২৩/৫৬৩০১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার	০৬৭২২/৫৬০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বন্দর	৭৬৬১২৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ	০৬৭২৫/৫৬০২৭ (অ)
ফরিদপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৩১/৬৩২২৩ (অ) dfo.faridpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৩১/৬৬৬১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালমারী	০৬৩২৪/৫৬২৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলফাডাংগা	০৬৩২২/৫৬১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নগরকান্দা	০৬৩২৭/৫৬৩২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুখালী	০৬৩২৬/৫৬১৫২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরভদ্রাসন	০৬৩২৫/৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাংগা	০৬৩২৩/৫৬৫৪৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফরিদপুর সদর	০৬৩১/৬৩৯৯০ (অ)
রাজবাড়ী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৪১/৬৫৫৮৩ (অ) dfo.rajbari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৪১/৬৫০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাংশা	০৬৪২৪/৭৫০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ	০৬৪২৩/৫৬৩৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজবাড়ী সদর	০৬৪১/৬৫৩৬৪ (অ)
মাদারীপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৬১/৫৫৪৪২ (অ) dfo.madaripur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৬১/৫৫৪১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালকিনি	০৬৬২২/৫৬১৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজৈর	০৬৬২৩/৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবচর	০৬৬২৪/৫৬১২৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাদারীপুর সদর	০৬৬১/৬২১৬১ (অ)

গোপালগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৬৬৮৫৪৫৪ (অ) dfo.gopalganj@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৬৬৮৫৬১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টুংগীপাড়া	৬৬৫৬৩৫৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুকসেদপুর	০৬৬৫৪/৫৬২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাশিয়ানী	০৬৬৫২/৫৬২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটালীপাড়া	৬৬৫১৩১৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোপালগঞ্জ সদর	৬৬৮৫৯৪২ (অ)
শরীয়তপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬০১/৬১৬৫৬ (অ) dfo.shariatpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬০১/৬১৪৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জাজিরা	০৬০২৭/৫৬০৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ	০৬০২২/৫৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোসাইরহাট	০৬০২৪/৭৫৭৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডামুড্যা	০৬০২৩/৫৬৩৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়িয়া	০৬০১/৫৯১৪৫ (অ)
ময়মনসিংহ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯১/৬৬৭৪৮ (অ) dfo.mymensingh@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯১/৬৬১৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪/৫৬০৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নান্দাইল	০৯০২৯/৬৪৩২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ত্রিশাল	০৯০৩২/৫৬০৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ	০৯০২৯/৫৬০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা	০৯০২৮/৭৫৩৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া	০৯০২৩/৭৩০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভালুকা	০৯০২২/৫৬০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও	০৮০২৫/৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট	০৯০২৬/৫৬১৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধোবাউড়া	০৯০৩৪/৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪/৫৬০১৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, শম্ভুগঞ্জ	০৯১/৬৬৩৩৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	০৯১/৬৬১৫৮ (অ)
কিশোরগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৪১/৬১৯২৭ (অ) dfo.kishoreganj@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৪১/৬১৭১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ	০৯৪২৭/৫৬০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভৈরব	০৯৪২৪/৭১৭১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাজিতপুর	০৯৪২৩/৬৪২৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কটিয়াদী	০৯৪২৮/৫৬১৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মিঠামইন	০৯৪৩৫/৫৬০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাকুন্দিয়া	০৯৪৩৩/৫৬০৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইটনা	০৯৪২৬/৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম	০৯৪২২/৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোসেনপুর	০৯৪২৫/৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কিশোরগঞ্জ সদর	০৯৪১/৬১৮৬৯ (অ)
নেত্রকোনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৫১/৬১৪০৪ (অ) dfo.netrokona@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৫১/৬১৩৫৫ (অ)

সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ	০৯৫২৪/৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বারহাট্টা	০৯৫২৩/৫৬০৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেন্দুয়া	০৯৫২৮/৫৬০০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২/৭৪০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পূর্বধলা	০৯৫৩২/৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন	০৯৫২৯/৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা	০৯৫২৭/৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খালিয়াজুরী	০৯৫২৬/৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৯৫২৫/৫৬৩৪৪ (অ)
জামালপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৮১/৬৩৬২০ (অ) dfo.jamalpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৮১/৬৩২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইসলামপুর	০৯৮২৪/৭৪১৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ	০৯৮২৩/৭৫১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারগঞ্জ	০৯৮২৫/৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী	০৯৮২৭/৫৬২৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বকসীগঞ্জ	০৯৮২২/৫৬১৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেলান্দহ	০৯৮২৬/৫৬১৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জামালপুর সদর	০৯৮১/৬৩৩৫২ (অ)
শেরপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১/৬১৪৪৭ (অ) dfo.sherpur@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৯৩১/৬২৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নকলা	০৯৩২৩/৭৫০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নালিতাবাড়ী	০৯৩২৪/৭৩৩০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইগাতী	০৯৩২২/৭৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীবর্দী	০৯৩২৫/৫৬০৭৯ (অ)
টাঙ্গাইল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯২১/৫৩৬৭৮ (অ) dfo.tangail@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯২১/৫৪০৭১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মির্জাপুর	০৯২২৯/৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগরপুর	০৯২৩৩/৭৩০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর	০৯২২৬/৭৫১৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভূঞাপুর	০৯২২৩/৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিহাতী	০৯২২৭/৭৪০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাসাইল	০৯২২২/৫৬১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সফিপুর	০৯২৩২/৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেলদুয়ার	০৯২২৪/৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাটাইল	০৯২২৫/৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুপুর	০৯২২৮/৫৬০৮৫
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধনবাড়ী	০৯২২৮/৫৬২৯৯-৪৯(অ)

খুলনা বিভাগ	
জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী উপপরিচালক	০৪১/৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১/৮৬১২৮৯ (অ) ০৪১/৮৬০০১৫ (ফ্যা)
জনাব মোহাঃ গোলাম রাব্বানী সহকারী পরিচালক	০৪১/৮৬০৫৮৩ (অ) rabbanig@yahoo.com
জনাব মোঃ নাজমুল হুদা প্রকল্প কর্মকর্তা	০৪১/৮৬১২৮৭ (অ)

খুলনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১/৭৬৩০১৬ (অ) ০৪১/২৮৫০১২৭ (ফ্য) dfo.khulna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলতলা	০৪১/৭০১৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেরখাদা	০৪০২৯/৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াখাটা	০৪০২২/৫৬০২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫/৫৬০২৬
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাকোপ	০৪০২৩/৫৬০৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫/৫৬০২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকগাছা	০৪০২৭/৫৬২৬২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কয়রা	০৪০২৬/৫৬০৩৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া	০৪১/৮৯০০১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপসা	০৪১/৮০০১২২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খুলনা সদর	০৪১/৮১৩২৫৮ (অ)
সাতক্ষীরা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১/৬৩৩১৮ (অ) dfo.satkhira@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৭১/৬৩৮৪০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলারোয়া	০৪৭২৪/৭৫৩২৪ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তালা	০৪৭২৩/৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশাশুনী	০৪৭২২/৫৬০২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৭২৫/৫৬০৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্যামনগর	০৪৭২৬/৭৪০২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবহাটা	০৪৭৩২/৭২০৫৫ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭২৫/৫৬১০১ (অ)
বাগেরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৮/৬২৪৪৫ (অ) dfo.bagerhat@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬৮/৬২৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামপাল	০৪৬৫৭/৫৬০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ	০৪৬৫৬/৫৬২০৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোংলা	০৪৬৫৮/৭৩২১৯ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৪৬৫৪/৫৬০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিতলমারী	০৪৬৫২/৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোলাহাট	০৪৬৫৫/৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফকিরহাট	০৪৬৫৩/৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরণখোলা	০৪৬৫৯/৫৬০৪৭ (অ)
যশোর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১/৬৫৭৫২ (অ) dfo.jessore@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪২১/৬৮৯৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অভয়নগর	০৪২২২/৭১১২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা	০৪২২৫/৭১৫২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনিরামপুর	০৪২২৭/৭৮৪২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর	০৪২২৬/৫৬৩৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া	০৪২২৩/৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা	০৪২২৮/৭৫৪০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌগাছা	০৪২২৪/৫৬৩৬৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, যশোর সদর	০৪২১/৬৪০৪৬ (অ)
ঝিনাইদহ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১/৬২৮৫৭ (অ) dfo.jhinaidah@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৫১/৬১৩৮১ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিণাকুন্ডু	০৪৫২২/৭৪০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৫২৩/৫৬১০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর	০৪৫২৪/৬৫০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশপুর	০৪৫২৫/৫৬২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শৈলকুপা	০৪৫২৬/৫৬০৬০ (অ)
নড়াইল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১/৬২০৩৩ (অ) dfo.norail@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮১/৬২০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগড়া	০৪৮২৩/৫৬৩৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া	০৪৮২২/৫৬০৫৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৮১/৬২০৬৬ (অ)
মাগুরা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮/৬২৩৪১ (অ) dfo.magura@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮৮/৬২৩১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালিখা	০৪৮৫৩/৫৬১০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুহম্মদপুর	০৪৮৫২/৭৫১৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৪৮৫৪/৫৬১৫২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাগুরা সদর	০৪৮৮/৬২৮৫১ (অ)
কুষ্টিয়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১/৬২১৮৯ (অ) dfo.kushtia@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭১/৭১১৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমারখালী	০৭০২৫/৭৬৪৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খোকসা	০৭০২৪/৫৬৩৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরপুর	০৭০২৬/৫৬৪৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা	০৭০২২/৭১৫৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৭০২৩/৭৫২৬২ (অ)
মেহেরপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১/৬২৫৪৩ (অ) dfo.meherpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৯১/৬২৬৪৩ (অ)
চুয়াডাঙ্গা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১/৬২৩৮৮ (অ) dfo.chuadanga@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৬১/৬৩১২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৭৬২৪/৭৫০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা	০৭৬২২/৫৬২৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দামুড়হুদা	০৭৬২৩/৫৬০৬৭ (অ)

রাজশাহী বিভাগ	
জনাব এম আই গোলদার উপপরিচালক	০৭২১/৭৬০১৮৪ (অ) ০৭২১/৭৬০১৮৪ (ফ্যা)
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৭২১/৮৬০০০২ (অ)
জনাব সুভাস চন্দ্র সাহা এডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	০৭২১/৮৬০৫৯০ (অ)
বেগম ইয়াসমিন রহমান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৭২১/৮৬১৫০১ (অ)
রাজশাহী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১/৭৬০২৪৫ (অ) dfo.rajshahi@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পবা	০৭২১/৭৬০৮২৯ (অ)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পুঠিয়া	০৭২২৮/৫৬৩২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দূর্গাপুর	০৭২২৪/৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট	০৭২২৩/৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘা	০৭২৩৩/৫৬১০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগমারা	০৭২২২/৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনপুর	০৭২২৬/৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর	০৭২২৯/৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী	০৭২২৫/৫৬১৮১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজশাহী সদর	০৭২১/৮৬১৪৪০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পুঠিয়া, রাজশাহী	০৭২২৮/৫৬৩১৩ (অ)
নাটোর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১/৬২৫৯০ (অ) dfo.natore@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৭১/৬২৬৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়াইগ্রাম	০৭৭২৩/৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গুরুদাসপুর	০৭৭২৪/৭৪৪০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া	০৭৭২৬/৬৩১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া	০৭৭২২/৭২০৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর	০৭৭২৫/৭৫০৬০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাটোর সদর	০৭৭১/৬২৯১৮ (অ)
নওগাঁ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১/৬২৫৮৫ (অ) dfo.naogaon@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৪১/৬২৮২৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা	০৭৪২৫/৬২০৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাপাহার	০৭৪৩২/৭৪০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহাদেবপুর	০৭৪২৬/৫৭১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	০৭৪২৭/৫৬০৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীনগর	০৭৪৩৩/৫৬০৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আত্রাই	০৭৪২২/৭১০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছী	০৭৪২৩/৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামুইরহাট	০৭৪২৪/৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পত্নীতলা	০৭৪২৮/৬৩০৯৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোরশা	০৭৪২৯/৫৬০১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নওগাঁ সদর	০৭৪১/৬১৭৬১ (অ)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১/৫৫৪৮২ (অ) dfo.nawabgonj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৮১/৫৫৮৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাচোল	০৭৮২৪/৫৬০৩২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোমস্তাপুর	০৭৮২৩/৭৪১১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৭৮২৫/৭৫২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলাহাট	০৭৮২২/৫৬০৪৯ (অ)
পাবনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১/৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১/৬৪৫১৫ (ফ্যা) dfo.pabna@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৩১/৬৪৯৩১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬/৬৩৯১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৭৩২৫/৬৪০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটঘড়িয়া	০৭৩২২/৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটমোহর	০৭৩২৪/৬৫৩২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গুড়া	০৭৩২৮/৫৬১০২ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেড়া	০৭৩২৩/৭৫১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাথিয়া	০৭৩২৭/৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর	০৭৩২৯/৫৬১৬৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬/৬৩৪২৭ (অ)
সিরাজগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১/৬২১৩৭ (অ) dfo.sirajgonj@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৫১/৬২৯৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলাপাড়া	০৭৫২৯/৫৬১৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজীপুর	০৭৫২৫/৫৬২০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাদপুর	০৭৫২৭/৬৪৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কামারখন্দ	০৭৫২৪/৫৬০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াশ	০৭৫২৮/৪৬১০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়গঞ্জ	০৭৫২৬/৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলকুচি	০৭৫২২/৫৬৫০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌহালি	০৭৫১/৬৩৮২৩ (অ)
প্রকল্প মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উলাপাড়া	০৭৫২৯/৫৬২১৫ (অ)
লালমনিরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১/৬১৩৪৬ (অ) ০৫৯১/৬১১৩৭ (বা) dfo.lalmonirhat@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৯১/৬১০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদিতমারী	০২৯২২৫৬১৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৫৯২৪/৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতীবন্ধা	০৫৯২৩/৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাটগ্রাম	০৫৯২৫/৫৬০৮৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট সদর	০৫৯১/৬১০৭১ (অ)
গাইবান্ধা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১/৬১৬৪৩ (অ) dfo.gaibandha@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৪১/৬১৯২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী	০৫৪২৪/৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঘাটা	০৫৪২৬/৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ	০৫৪২৩/৭৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাদুলাপুর	০৫৪১/৬১৩৪৯৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলছড়ি	০৫৪২২/৬২০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ	০৫৪২৭/৬৪০৭২ (অ)
রংপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১/৬২৯২৯ (অ) dfo.rangpur@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫২১/৬২২৩০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫২২৭/৫৬০৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর	০৫২২৫/৮৭০৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ	০৫২২২/৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউনিয়া	০৫২২৪/৫৬০৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গংগাচড়া	০৫২২৩/৫৬০০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগাছা	০৫২২৬/৫৬০৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ	০৫২২৮/৫৬০৩৪ (অ)
কুড়িগ্রাম জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৮১/৬১৫০১ (অ) ০৫৮১/৬১০২৪ (ফ্যা) dfo.kurigram@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৮১/৬১৮৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৮২/৫৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজবপুর	০৫৮২৩/৫৬২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী	০৫৮২৬/৫৬৩২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলিপুর	০৫৮২৯/৫৬২৭৫ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিলমারী	০৫৮২৪/৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রৌমারী	০৫৮২৫/৫৬০৫১ (অ)
নীলফামারী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১/৬১৫৭০ (অ) dfo.nilphamari@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৫১/৬১৭৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডিমলা	০৫৫২২/৫৬২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সৈয়দপুর	০৫৫২৬/৭২৯৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৫৫২৫/৫৬০১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডোমার	০৫৫২৩/৭৫১৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জলঢাকা	০৫৫২৪/৬৪০৮৩ (অ)
জয়পুরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১/৬২২২৪ (অ) dfo.jaipurhat@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৭১/৬২২৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাঁচবিবি	০৫৭১/৭৫২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালাই	০৫৭২৬/৫৬০৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আক্কেলপুর	০৫৭২২/৬৪০১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩/৫৬০৪৫ (অ)
বগুড়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১/৬০৫৭০ (অ) dfo.bogra@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫১/৬৪৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৫০২৯/৭৭৪১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদমদীঘি	০৭৪১/৬৯২২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহালু	০৫০২৬/৫৬০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম	০৫০২৭/৭৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৫০৩৩/৬৯০৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দী	০৫১/৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া	০৫০২৪/৮৮০৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধুনট	০৫০২৩/৫৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাবতলী	০৫০২৫/৭৫০৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাতলা	০৫০৩২/৭৯১১৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাজাহানপুর	০৫১৮২২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মালতিনগর	০৫১/৬৫৩৩৮ (অ)
পঞ্চগড় জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬৮/৬১৩৬৯ (অ) dfo.panchagarh@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬৮/৬১৯৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটোয়ারী	০৫৬৫২/৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোদা	০৫৬৫৩/৫৬১৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ	০৫৬৫৪/৫৬০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া	০৫৬৫৫/৭৫০৬৩ (অ)
ঠাকুরগাঁও জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১/৫৩৪৬৩ (অ) dfo.thakurgaon@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬১/৫২৫২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণী সংকৈল	০৫৬২৫/৫৬১১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াডাঙ্গী	০৫৬২২/৫৬০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিপুর	০৫৬২৩/৫৬০১৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫৬২৪/৫৬৩৮৯ (অ)
দিনাজপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১/৬৪৪৮৬ (অ) dfo.dinajpur@fisheries.gov.bd

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৩১/৬৩৩১৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ	০৫৩২৩/৭২৫১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহারোল	০৫৩৩৫/৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরল	০৫৩২৪/৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিরিরবন্দর	০৫৩২৬/৫৬১৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৩২৭/৫৬৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরামপুর	০৫৩২২/৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাকিমপুর	০৫৩২৯/৭৫১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খানসামা	০৫৩৩২/৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘোরাঘাট	০৫৩২৮/৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪/৭৪২২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৫৩৩৩/৫৬০২৮ (অ)

চট্টগ্রাম বিভাগ	
জনাব মোঃ ছেরাজ উদ্দিন উপপরিচালক	০৮১/৭৬১২৭ (অ)
সহকারী পরিচালক	০৮১/৭৬৫১১ (অ)
চট্টগ্রাম জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১/২৫৮০৯৮২ (অ) ০৩১/৬১০৩৯৩ (বা) dfo.chittagong@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	০৩০৩৫/৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা	০৩০২৯/৫৬০৪৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরসরাই	০৩০২৪/৫৬২৪৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড	০৩০২৮/৫৬০৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালি	০৩০৩৫/৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাউজান	০৩০২৬/৫৬২৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চন্দনাইশ	০৩০৩৩/৫৬২৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগাড়া	০৩০৩৪/৫৬৫১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি	০৩০২২/৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতকানিয়া	০৩০৩৬/৫৬৪৭৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটিয়া	০৩০৩৫/৫৬৩৪৮ (অ)
কক্সবাজার জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১/৬৩২৬৮ (অ) dfo.coxsbazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৪১/৬৪২৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী	০৩৪২৪/৭৪২৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ	০৩৪২৬/৭৫০০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু	০৩৪২৫/৫৬২৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া	০৩৪২৭/৫৬১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পেকুয়া	০৩৪২৮/৫৬১৭৫ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১/৫১১২৬ (অ)
ফেনী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১/৭৪০৪৬ (অ) ০৩৩১/৬১২৮৭ (বা) dfo.feni@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৩১/৭৪০৭৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া	০৩৩২২/৭৮৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরশুরাম	০৩৩২৪/৫৬০০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী	০৩৩২৬/৭৭১৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাগনভূঞা	০৩৩২৩/৭৯১৫৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফেনী সদর	০৩৩১/৭৪২৩২ (অ)
চাঁদপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১/৬৩১৬৫ (অ) dfo.chandpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৪১/৬৫৯৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৮৪২৫/৫৬১৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহরাস্তি	০৮৪২৭/৫৬২০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (দঃ)	০৮৪২৬/৫৬৩৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (উঃ)	০৮৪২৮/৫১০২৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কচুয়া	০৮৪২৫/৫৬১৮০ (অ)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৫১/৫৮৫০১ (অ) ০৮৫১/৫৯৭৮৫ (বা) dfo.barnmanbaria@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৫১/৫৯০১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীনগর	০৮৫২৫/৭৫২৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঞ্ছারামপুর	০৮৫২৩/৫৬১০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাসিরনগর	০৮৫২৬/৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরাইল	০৮৫২৭/৫৬১৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কসবা	০৮৫২৪/৭৩২০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ	০৮৫২৮/৭৪১০১ (অ)
কুমিলা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮১/৭৬১৫১ (অ) dfo.comilla@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮১/৭৬৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বুড়িচং	০৮০২৯/৫৬১৬৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম	০৮০৩২/৫১৩৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম	০৮০২০/৫৬২১১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চান্দিনা	০৮০২২/৫৬৪১৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুরাদনগর	০৮০২৬/৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাউদকান্দি	০৮০২৩/৫৫৩৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট	০৮০৩৩/৬৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরুড়া	০৮০২৭/৫২০৫৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জাংগালীয়া	০৮১/৭৬৫৪২ (অ)
রাঙ্গামাটি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৫১/৬২৩২৭ (অ) dfo.rangamati@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৫১/৬৩৬০৪ (অ)
বান্দরবান জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৬১/৬২৩৩৮ (অ) dfo.bandarban@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৬১/৬৩০০৫ (অ)
খাগড়াছড়ি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১/৬১৭২৬ (অ) dfo.khagrachari@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৭১/৬২০৯৫ (অ)
লক্ষ্মীপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৮১/৫৫৪৬৫ (অ) dfo.lakshmipur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৮১/৬২২৬৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি	০৩৮২৩/৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুর	০৩৮২২/৫৬৪৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগঞ্জ	০৩৮২৪/৭৫৪৯৫ (অ)
নোয়াখালী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩২১/৬১৬৮১ (অ) dfo.noakhali@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৩২১/৬১৬৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ	০৩২১/৫২৩২৫ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৩২২৩/৫৬৩৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেনবাগ	০৩২২৫/৫৬১৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতিয়া	০৩২২৪/৫৬০৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটখিল	০৩২২২/৭৫০৫৩ (অ)

সিলেট বিভাগ	
জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম আকন্দ উপপরিচালক	০৮২১/৮১০৫৩৩ (অ) ০৮২১/৭২৩০২৭ (বা)
জনাব শঙ্কর রঞ্জন দাশ সহকারী পরিচালক	০৮২১/৭২৩২৫৭ (অ)
সিলেট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১/৭১৬২৪১ (অ) ০৮২১/৮১০৫৪৪ (বা) dfo.sylhet@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮২১/২৮৭০০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ	০৮২২২/৫৬১২২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭/৫৬৪২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বনাথ	০৮২২৪/৫৬০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর	০৮২২৯/৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট	০৮২২৮/৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জকিগঞ্জ	০৮২৩২/৫৬০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দক্ষিণ সুরমা	০৮২১/২৮৭৮২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেঞ্চুগঞ্জ	০৮২২৬/৫৬২৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কানাইঘাট	০৮২৩৩/৫৬১১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার	০৮২২৩/৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৮২২৫/৫৬০৯৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	০৮২১/২৮৭০২২৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭/৫৬৪২৪ (অ)
সুনামগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১/৫৫৪৯০ (অ) dfo.sunamganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৭১/৬১৬৬২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই	০৮৭২৪/৫৬৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০৮৭৩২/৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোয়ারাবাজার	০৮৭২৬/৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালা	০৮৭২৯/৫৬০৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০৮৭২২/৫৬১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালগঞ্জ	০৮৭২৮/৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা	০৮৭২৫/৭৫০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দঃ সুনামগঞ্জ	০৮৭১/৬২৪৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাতক	০৮৭২৩/৫৬০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর	০৮৭২৭/৫৬০৪২ (অ)
হবিগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১/৫২৫৪০ (অ) dfo.habiganj@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৩১/৬২৩১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীগঞ্জ	০৮৩২৮/৫৬৩০২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানিয়াচং	০৮৩২৪/৫৬২১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আজমিরীগঞ্জ	০৮৩২২/৫৬১১৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাহুবল	০৮৩২৩/৫৬০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুনারুঘাট	০৮৩২৮/৫৬১৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাধবপুর	০৮৩২৭/৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাখাই	০৮৩২৬/৫৬০৩৪ (অ)

মৌলভীবাজার জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১/৫২৮১৩ (অ) dfo.moulavibazar@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৬১/৬২৯০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল	০৮৬২৬/৭১৪৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজনগর	০৮৬২৫/৭৫৪৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলাউড়া	০৮৬২৪/৫৬৬৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ	০৮৬২৩/৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জুড়ী	০৮৬২৭/৫৭১৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়লেখা	০৮৬২২/৫৬৬১৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মৌলভীবাজার সদর	০৯৬১/৫২২৯২ (অ)

বরিশাল বিভাগ	
জনাব মোঃ আবদুল খালেক উপপরিচালক	০৪৩১/৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১/২১৭৫২৭৭(ফ্যা)
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী পরিচালক	০৪৩১/৬৩৪৫২ (অ)
বরিশাল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১/৬৪০১৮ (অ) ০৪৩১/৬১৮৫২ (বা) dfo.barisal@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৩১/৬২৬০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আগৈলঝড়া	০৪৩২৩/৫৬২৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ	০৪৩২৮/৭৪২৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উজিরপুর	০৪৩২৯/৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাবুগঞ্জ	০৪৩২৭/৭৩০০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানারীপাড়া	০৪৩৩২/৫৬৩৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেদিগঞ্জ	০৪৩২৫/৫৬১৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুলাদী	০৪৩২৬/৭৫২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা	০৪৩২৪/৫৬০৪১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেহেদিগঞ্জ	০৪৩২৫/৫৬১৬৫ (অ)
ভোলা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১/৬২৪০৭ (অ) dfo.bhola@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯১/৬২৮৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশান	০৪৯২৩/৭৪০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তজুমদ্দীন	০৪৯২৭/৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতখান	০৪৯২৪/৫৬১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোরহানউদ্দিন	০৪৯২২/৫৬১৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমোহন	০৪৯২৫/৭৫৬১৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনপুরা	০৪৯২৬/৫৬০২১ (অ)
ঝালকাঠি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮/৬৩২৫৮ (অ) dfo.jhalakathi@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯৮/৬৩২৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাঠালিয়া	০৪৯৫২/৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজাপুর	০৪৯৫৪/৬৫৩৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নলছিটি	০৪৯৫৩/৭৪০৩৪ (অ)
বরগুনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪৮/৬২৩৯৬ (অ) dfo.barguna@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪৮/৬২৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আমতলী	০৪৪৫২/৫৬১৩৩ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা	০৪৪৫৫/৭৫২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বামনা	০৪৪৫৩/৫৬০৭৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী	০৪৪৫৪/৫৬১৪৬ (অ)
পটুয়াখালী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১/৬২৫০১ (অ) dfo.patuakhali@fisheries.gov.bd
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৪১/৬২০৯৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলাপাড়া	০৪৪২৫/৫৬৩৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাউফল	০৪৪২২/৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দশমিনা	০৪৪২৩/৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গলাচিপা	০৪৪২৪/৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ	০৪৪২৬/৭৫২৮৫ (অ)
পিরোজপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১/৬২৫৯৭ (অ) dfo.pirojpur@fisheries.gov.bd
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬১/৬২৬৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া	০৪৬২৫/৭৫১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাজিরপুর	০৪৬২৬/৭৪০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৪৬২৪/৫৬২৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেছারাবাদ	০৪৬২৭/৫৬০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জিয়ানগর	০৪৬২২/৫৬১৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভান্ডারিয়া	০৪৬২৩/৩৯৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর সদর	০৪৬১/৬২০৬৩ (অ)

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
ড. মোঃ মোহসীন আলী প্রফেসর, অ্যাকুয়াকালচার বিভাগ	০৯১/৬৭৪৬৮ (বা) aliprof_2003@yahoo.com
ড. কীর্তুনিয়া জুড়ান চন্দ্র প্রফেসর, অ্যাকুয়াকালচার বিভাগ	০৯১/৬১৯২০ (বা) kirtuniajchandra@yahoo.com
ড. মোঃবজলুর রশীদ চৌধুরী প্রফেসর, অ্যাকুয়াকালচার বিভাগ	০৯১/৬৭৯৯০ (বা) mbrchowdhury@yahoo.com
ড. মোঃ ফজলুল আউয়াল মোল্লাহ প্রফেসর, ফিসারিজবায়োলেজি এন্ডলিমনোলেজি বিভাগ	০৯১/৬৭৫৬৬ (বা) mollahfa@yahoo.com
ড. মোঃ শহীদুল হক প্রফেসর, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১/৫১৯৪৭ (বা) mshaq52@yahoo.com
ড. মোঃশহীদুর রহমান প্রফেসর, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১/৬১৭০২ (বা) shdripfm@bttb.net.bd
ড. মোঃ আবদুল ওহাব প্রফেসর, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১/৫১৯২৭ (বা) wahabma_bau@yahoo.com
ড. মোঃ ইদ্রিস মিয়া প্রফেসর, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১/৬৭৬৬২ (বা) bdridrism41@yahoo.com
ড. মোঃ মাহফুজুল হক প্রফেসর, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১/৬৩৩৮৫ (বা) mahfuz75bau@yahoo.com
ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রফেসর, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১/৬১৭০৪ (বা) subhash55chakraborty@yahoo.com
ড. মোঃ কামাল প্রফেসর, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১/৬৬৮৫০ (বা) klab07@hotmailcom
ড. মোঃ নজরুল ইসলাম প্রফেসর, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১/৬৭৫৮৭ (বা) kewatkhali2201@yahoo.com
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	
ড. মোঃ সাইফুদ্দীন শাহ্ প্রফেসর ও ভাইসচ্যান্সেলর	০৪১/৭২১৩৯৩ (অ) ০৪১/২৮৩০১১১ (বা) prof.m.s.shah@gmail.com

ড. মোঃ নাজমুল আহসান প্রফেসর ও প্রধান এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১/৭৩২১৫৭ (অ) nazmul_ku@yahoo.com
ড. খন্দকার আনিসুল হক প্রফেসর, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১/৭৩২১৫৭ (অ) haqka@yahoo.com
ড.গাওসিয়াতুর রেজা বানু প্রফেসর, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১/৭৩২১৫৭ (অ) kugrb@yahoo.com
ড. মুহম্মদ মোস্তফা প্রফেসর, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১/৭৩২১৫৭ (অ) mostafa ku@yahoo.com
ড. মোঃ আইয়াজ হাসান চিশতি প্রফেসর, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১/৭৩২১৫৭ (অ) ahc-md@yahoo.com
ড. মোঃ গোলাম সারোয়ার প্রফেসর, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১/৭৩২১৫৭ (অ) sarower@yahoo.com
ড. এস. এম. বজলুর রহমান প্রফেসর, এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১/৭৩২১৫৭ (অ) riti_rahman@yahoo.com
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	
ড. সুলতান মাহমুদ সহযোগী অধ্যাপক, মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ	*০৪৪২৭/৫৬০১৪* Ex২৬৭ sultanmahmud 77@yahoo.com
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	
ড. মোঃ আখতার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১/৭৬০৫৪১ (বা) mahfaa@yahoo.com
ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১/৭৫০৬৪০ (বা) delwerhk@yahoo.com
ড. সালেহা জেসমিন সহযোগী অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১/৭৫১১২৪ (বা) sja_ru@yahoo.com
ড. মুহম্মদ আফজাল হুসাইন সহযোগী অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১/৮১০৬৫১ (বা) afzalh_ru@yahoo.com
ড. এম. মনজুরুল আলম সহযোগী অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১/৭৫১৩৫৫ (বা) mamillat@yahoo.com
ড. এবিএম মোহসিন সহযোগী অধ্যাপক, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১/৭৫১২২৬ (বা) abmmohsin@yahoo.com
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
ড. মো. কাউসার আহাম্মদ মৎসবিজ্ঞান বিভাগ	৯৬৬১৯২০- ৫০ (অ) kawser_du@yahoo.com
ড. দেওয়ান আলী আহসান মৎসবিজ্ঞান বিভাগ	৯৬৬১৯২০- ৫০ (অ) daahsan@yahoo.com

সংকলন

মোহাঃ তরিকুল আলম
উপজেলা মৎস্য অফিসার